ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট

বিদগ্ধ শর্মা

চিনকো
১৬৭এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৯

বক্তব্য

আমি লেখক নই—কখনও বই লিখি নি। সাহিত্য সৃষ্টি করবার মত স্পর্দ্ধা নেই। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে ক্লাইভ স্ট্রীট পরিক্রমা করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তারই খানিকটা পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। কাজেই সাহিত্যরসিকদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—যেন তাঁরা তাঁদের সমালোচনার সম্মার্জনী দিয়ে আমাকে স্পর্শ না করেন।

'ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট'-এর আলোচনাকাল মোটামুটি ১৯৪৪-৪৫ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল। এই দশটা বছর ভারতবর্ষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন এনেছিল। সেদিক থেকে এই সময়কার ক্লাইভ স্ট্রীটের ইতিহাস বাঙালী জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা-জগৎ থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের হটে আসবার দু'চারটে পট-ভূমিকা এ-বইয়ে পাওয়া যেতে পারে।

একটা দেশের সামাজিক অবস্থার প্রকৃত রূপ জানতে চাইলে, সেই দেশের বাণিজ্যের প্রাণ-কেন্দ্রে যেতে হয়। সারা দেশটা ঘুরে বেড়াবার কোনও প্রয়োজন নেই—অবশ্য দেখবার মত চোখ এবং শোনবার মত কান থাকা চাই। যাদের দুটোর একটাও নেই, তারা সমস্ত দেশটাকে হাজারবার পরিক্রমা করলেও ভেতরকার অবস্থা জানতে পারবে না। তাই ক্লাইভ স্ট্রীট শুধু মাত্র একটা রাস্তা নয়,—এটা কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিম বাঙলার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের 'ব্যারোমিটার'।

'ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট'-এ কতকগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য দিয়ে স্বাধীনোত্তর বাংলার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে না দেখলে সময় এবং কালের গতিপথ নির্দ্ধারণ করা যায় না। মানুষের আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, পোশাক-আসাক সবই মোটামুটি-ভাবে তৎকালীন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজটাও আবার গঠিত হয় অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে। এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে জীবনসংগ্রামের ক্ষুদ্রতম অকৃতকার্যতাও হতাশায় পরিণত হয়, এবং ঘটনার প্রকৃত রূপ চোখে কখনও ধরা পড়ে না।

সবার শেষে বইয়ের প্রকাশক শ্রীমণি বসু মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই—যাঁর উৎসাহ না পেলে এই বই ছাপা হত না। আর কৃতজ্ঞতা জানাই আর একজনকে যাঁর অনুপ্রেরণা না পেলে এ-বইয়ের একটা লাইনও কখনও লেখা হত না। —লেখক

ক্লাইভ স্ট্রীটের স্কোরবোর্ড থেকে নিঃশব্দে মুছে যাওয়া হতভাগ্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে—

এই বই-এর চরিত্রগুলি কাউকে কটাক্ষ করে সৃষ্ট হয় নি।
কোথাও কোনো সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত॥

সত্যিই উমাশঙ্কর আমার উপর ভয়ানক চটে গিয়েছিল—আর চটে যাওয়ার চেয়েও দুঃখিত হয়েছিল অনেক বেশী। আবাল্য বন্ধুর এই দুঃখজনক পরিণতি ও হয়তো কল্পনা করতে পারে নি। তাই বার বার বলছিল—১৯৪৪-৪৫ সালে পঁচাত্তর টাকা মাইনের প্রফেসরি—oh ! what a shame !

সত্যিই তাই। এমন দিন ছিল যখন তিরিশ টাকা মাইনের স্কুল মাষ্টার কিংবা পঁচাত্তর টাকা মাইনের প্রফেসরের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কলকাতায় বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

একবার ভাবলাম, উমাকে প্রফেসরির কথাটা না বলাই ভাল ছিল। ব্যবসা আমার ধাতে সয় না। Parkinson সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে পারলে, তাঁকে দিয়ে হয়তো একটা কথা বলিয়ে নিতে পারতাম—যে ভদ্রলোকের ছেলে কখনও ব্যবসায়ী হতে পারে না। ব্যবসা করা আর ব্যবসায়ী হওয়া এক কথা নয়। ব্যবসায়ী না হতে পারলে ব্যবসা করা মূল্যহীন।

উমাকে তাই সেদিন বলেছিলাম—যদি ব্যবসায়ী না হতে পার তবে ব্রীজ বা দাবার আসরের মত ক্লাইভ স্ট্রীটে ব্যবসার নাম করে একটা আড্ডার স্থান জুটিয়ে কোনও লাভ নেই।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও উমাকে বোঝাতে পারলাম না।

সেটা বোধ হয় ১৯৪৫ সালের শীতকাল।

বছর চারেক আগে এম. এ পাস করেছি। পরীক্ষা দেবার পরই কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে চলে গিয়েছিলাম। খানিকটা

রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত-যুবকদের মনে চাকুরি সম্বন্ধে যে সমস্ত হুকারজনক-মনোভাব থাকে তা আমারও ছিল। বয়সও কম। ভাব-বিলাস পুরোমাত্রায় রয়েছে—আবার তার উপর পরাধীন দেশে বেঁচে থাকার অর্থহীনতার আত্মদর্শন মনটাকে চব্বিশ ঘণ্টা নাড়া দিচ্ছে। কি করবো, কি করা উচিত, তাই নিয়ে মন বিক্ষিপ্ত।

গুরুজনরা যে সব উপদেশ দিলেন, তা অত্যন্ত পেটী-বুর্জোয়াসুলভ বলে মনে হতে লাগল। দুই একজন বন্ধু-বান্ধব বিলিতী ফার্মে ভাল মাইনেতে ঢুকে পড়েছিল। আমি এবং আমার সমগোত্রীয়রা তাদের অত্যন্ত নিচুস্তরের মনে করে আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করছিলাম। তার কারণ, যারা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে থাকত তাদের আমরা যে শুধু করুণার চোখে দেখতাম তা নয়, তাদের সভ্য-মানুষ পদবাচ্য বলেই মনে করতাম না। ভাবতাম, চাকুরির মোহ ত্যাগ করে যদি আদর্শবাদের জন্য কিছুটা আত্মত্যাগ না করা যায়, তা হলে শিক্ষা-দীক্ষারই বা মূল্য কোথায়? তার ওপরে যারা বিলিতী কোম্পানীতে ঢুকেছিল তাদের প্রতি করুণার চেয়েও ঘৃণার মাত্রাটা ছিল বেশী। কিন্তু অন্নসংস্থানের চিন্তা করতেই হবে—তাই আবার কলকাতায় এলাম।

পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কি করব ভাবছি। হঠাৎ একদিন অর্থনীতির অধ্যাপকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তিনি আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। কলেজ এবং য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার সময় তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তবুও ভাল ছাত্র বলে নাম ছিল এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলে তিনি এবং আর সব অধ্যাপকরাই আমাদের সবাইকে ভালবাসতেন। আমরা অন্যান্য ভাল ছেলেদের মত শুধুমাত্র রেফারেন্স বই-এর নাম মুখস্ত না করে, পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম—আমাদের স্থান ছিল সাধারণ ছেলেদের চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে। শুধু

অধ্যাপকরাই কেন, সতীর্থদের মধ্যেও অনেকে ভাবতেন আমরা সাধারণ ছেলে নই, পরীক্ষার ফল খুব ভাল না হলেও তারা সবাই আমাদের খুব মেধাবী ও চৌকস বলেই মনে করতেন।

অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন—কি করছ?

—কিছু না স্যার—উত্তর দিলাম।

—কি করবে ঠিক করেছ?—অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন।

—এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি স্যার।

—প্রফেসারি করবে?

চুপ করে থাকলাম।

—কাল আমার বাড়ি এস।

পরদিন সকালে চায়ের আসর অধ্যাপকের বাড়িতে জমল ভালই। অনেক কথাবার্তার পর তিনি বললেন—তুমি পূজোর ছুটির পর আমাদের কলেজে জয়েন কর—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নমস্কার করে বেরিয়ে এসে মিনিট দুই পথ চলার পরই বন্ধুবর উমাশঙ্করের সঙ্গে দেখা। প্রায় চার বছর পর দেখা—দেখেই উমা চেঁচিয়ে উঠল—এই যে বাছাধন—এদিকে কোথায়? বাধ্য হয়ে উমাকে সব কথাই খুলে বললাম। প্রফেসরি করব শুনে উমা অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠল—পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে প্রফেসরি করবি, তোর লজ্জা করে না?

উমার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে অশ্বিনী দত্ত রোডের কয়েকখানা বাড়ির জানালা খুলে গেছে। ছুটীর দিনের সকালের রাস্তা তখনও খুবই লোকবিরল এবং নির্জন। তবুও দু'চারজন যারা এখানে ওখানে ছিল সবাই হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত অবস্থায় উমাকে বললাম—দোহাই উমা, একটু আস্তে। রাস্তায় লোক জমে গেল যে। কিন্তু তার উষ্মা কমবার নাম নেই—আমার মত চৌকস ছেলে পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে প্রফেসরি করবে—এটা তার কাছে রীতিমত outrageous! যাই হোক, অনেক করে টেনে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে উমাকে বসালাম।

দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে উমা বলল—তোমার কি গলায় দড়ি জোটে না? ছিঃ! ছি! এই যুদ্ধের বাজারে সবাই লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিল—আর তুমি কিনা শেষকালে কলেজের মাস্টারী!

—একটা তো কিছু করতে হবে, আমি অতি করুণ স্বরে বললাম।

কিন্তু সত্যি বলতে কি, ততক্ষণে আমারও যেন মনে হলো পঁচাত্তর টাকার মাইনের চাকরি ১৯৪৫ সালে অত্যন্ত বেমানান। টাকার মূল্য পড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বছর দুই আগেও তিন পয়সায় একটা মামলেট পাওয়া যাচ্ছিল। দশ টাকায় কলকাতার হোটেলে ভাল খাওয়া। দু'পয়সায় এক কাপ চা। আর আজ? চল্লিশ টাকার কমে কোন হোটেলে চার্জ নেই—চায়ের কাপ দু' পয়সা থেকে ছ' পয়সা, আর মামলেট! যদি ডিম মেলে, তো তিন আনা।

ভোজবাজীর মত আমেরিকা আর ইংলণ্ডের বাজারদরগুলো যেন এদেশে রপ্তানী হয়ে এসেছে। আর শুধু কি বিদেশের বাজার দামগুলিই আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে? বিদেশী পোশাক, হাবভাব, আর বিদেশী চিন্তাধারা সমস্ত জনজীবনকে আলোড়িত করে তুলেছে। কলকাতার রাস্তায় এখন স্যুটের বাহার। মোটামুটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে আমরা মানুষ হয়েছি। সেই যে কবে হাফপ্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি ধরেছিলাম, আজ আর মনেও পড়ে না। স্যুট পরা আমাদের কল্পনাতীত! কিন্তু ১৯৪৫ সালের কলকাতায় স্যুট সবাই পরে, সবার পকেটে camel কিংবা wild wood bine সিগারেট। ঠাকুর্দার আমলের কাঁচি সিগারেট কোনও রকমে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে আছে। Passing show আর তার নিচু-ওয়ালারা সব বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা আর ফিরে আসবে কি?

উমা চা খেয়ে আবার বলল—দোহাই তোর, প্রফেসার হতে যাস্ নি—সেরেফ না খেয়ে মরে যাবি। চল্ আমরা ব্যবসা করি।

—কিসের ব্যবসা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উমা বলল—ব্যবসার কি আর অভাব আছে রে? মণিকে মনে আছে তো? শুধু ডিম সাপ্লাই করে পাঁচ লাখ টাকার মালিক হয়েছে। সুরজিৎ সিং-এর কথা তোর নিশ্চয় মনে আছে? সেই যে অণিমাকে প্রেমপত্র লিখে নাজেহাল হয়েছিল! ও কি করেছে জানিস? পানাগড়ে একটা পুরোনো গাড়ির dump কিনে দশ লাখ টাকা কামিয়েছে।

আমি বললাম—দশ লা—খ টাকা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—দশ লাখ,—dumpএর ভেতরে শ'তিনেক নতুন jeep গাড়ি ছিল। তাই বেচে রাতারাতি বড়লোক।

শান্তনু সেনের পরিচয় তোকে আর নতুন করে দেবার কিছু নেই। একই হস্টেলে তো থাকতিস্। ১৯৪০ সালে আমেরিকান আর্মিতে কেরানী হয়ে ঢুকেছিল। Lt. Col সাহেবের খুব নেক নজরে পড়ে গেল। ময়মনসিংহের একটা base-এ চলে যাবার পরই একদিন সাহেব শান্তনুকে ডেকে বলল—could you arrange to supply fish to my boys?

শান্তনু বলল—সাহেব, মাছ পাব কোথা? আর পাওয়াও যদি যায় supply করবার টাকা কোথায়?

Lt. Col বললেন—কুচ পরোয়া নেই—টাকা দেবে army. কত টাকা advance চাই তোমার?

সেক্সপীয়র আর মিলটন পড়া ইংরেজী অনার্সের ছেলে শান্তনু। মাছ supply তার চৌদ্দপুরুষ চেষ্টা করলেও পারত কিনা সন্দেহ। দু'দিনের সময় নিয়ে ও ময়মনসিংহ শহরের আফতাব আলী কন্‌ট্রাক্টরকে সব কথা গিয়ে বলতেই মিঞা সাহেব লাফিয়ে উঠলেন—কেত্‌না রূপয়া কা কণ্ট্রাক্ট?

শান্তনু বল্ল—তা হবে সাত আট লাখ টাকার।

—পরোয়া নেহি, কণ্ট্রাক্ট সহি হোনেকা বাদ আপকো কেস পচাশ হাজার মিল্ যায়গী।

শান্তনুর নামে কণ্টাক্ট বেরুল। আফতাব আলী মাল

দেওয়া আরম্ভ করল। প্রথম দিন থেকেই খুব জোর মুনাফা— পাঁচ হাজার টাকার মাছ supply করে পনেরো হাজার টাকার বিল পাস হচ্ছে। সাত দিনের মধ্যে শান্তনুর পকেটে পঞ্চাশ হাজার টাকার একখানা চেক্ চলে এল।

নীরব বিস্ময়ে আমি উমাকে জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপর? শান্তনু সেন এখন সেক্সপীয়র আর মিলটন ছেড়ে দিয়ে Indian Banking Act পড়ছে।

—ও তো সাহিত্যের ছাত্র—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তা তো বটেই—ছিল তাই; কিন্তু এখন মিঃ শান্তনু সেন Atlantic Bank-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

অশোক মিত্র কি করছে রে উমা? ওরা তো এমনিতেই বেশ বড়লোক ছিল।

—অশোক বিশেষ কিছুই করছে না; তবে ওর দাদারা কোটিপতি হয়ে গেছে। ছিল লক্ষপতি কাপড়ের দোকানদার। Armyতে মশারী আর জুতো supply করে কোটিপতি হয়েছে। এখন মিত্র এণ্ড কোম্পানী কম করে এগার খানা মাইকা মাইনের মালিক।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। তুমি বলছ কি উমা! তা হলে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে গরীব বলতে শুধু আমি।

—শুধু তুমি নও—উমা বলল—আমিও আছি।

শতপতি থেকে হাজারপতি, হাজারপতি থেকে লক্ষপতি, লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হবার গল্প শুনতে শুনতে উমার নিজের হালচালের কথা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গিয়েছিলাম।

—তা হলে এইবার তোমার কথা কিছু বল—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উমা বলল—এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই ভারত-সরকারের আধা মিলিটারী একটা ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে পড়েছিলাম। দু'বছর চাকরি করতে না করতেই বাবা বলেলন,—দরকার নেই তোমার ও চাকরির। তোমাকে একটা কেরোসিন তেলের control

shop যোগাড় করে দিচ্ছি। মাসে কম করে হলেও দেড়-হাজার টাকা রোজগার হবে। আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি দিয়ে কি হবে?

দেড়হাজার টাকার প্রলোভন বড় একটা কম কথা নয়। তুমি তো জান, আমার দাদু বড় উকিল ছিলেন। বাবাও মফঃস্বল শহরে বেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেজকাকা ভাল ডাক্তার, আর ছোটকাকা বড় সরকারী চাকুরে। আমি যতই চুপ্ চাপ্ এককোণে পড়ে থাকতে চাইনা কেন—ওঁরা তা দেবেন না। আমাকে বহু পয়সা রোজগার করে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্মান বজায় রাখতে হবে। নিশ্চিন্তে চাকরি করছিলাম। দশটা পাঁচটা অফিস। কাজকর্ম নেই বল্লেই চলে। বেশীর ভাগ সময় বই পড়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। সেই চাকরি ছেড়ে আমাকে কেরোসিন তেলের দোকান দিয়ে বসতে হল। দক্ষিণ কলকাতার বনেদী পাড়ার এক বাজারের মধ্যে তেলের দোকান। একজন কর্মচারী রেখেছিলাম।

বছর খানেক যেতে না যেতেই দেড়হাজার টাকার নেশা আমাকে পেয়ে বসল। পড়াশুনা ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম আর সব কিছু—যেগুলিকে কেন্দ্র করে আমাদের যৌবন গড়ে উঠেছিল। দোকান এখনও আছে তবে আয়টা দেড়হাজার থেকে ছ'সাতশো টাকায় এসে নেমেছে। কারণ খুব পরিষ্কার। যুদ্ধের সময়ে তেল পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধু যাদের permit ছিল, তারাই ব্যবসা করতে পারছিল। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন তেল আমদানী হচ্ছে—আর তা ছাড়াও যে বিরাট পরিমাণ তেল সৈন্যবিভাগ কিনে নিচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দোকানের আয় এক দেড়শো টাকায় এসে দাঁড়াবে। তাইতো তোকে বলছি, চল্ ব্যবসা করি। এখনও লোকের হাতে প্রচুর পয়সা। যে কোনও ব্যবসাই লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বললাম—কিন্তু, আমি যে ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই জানিনে। আর তাছাড়া টাকা পয়সাও কিছু নেই আমার। বাবা বেঁচে নেই। আমি দাদাদের কাছ থেকে টাকা চাইতে পারব না। তাই বলছিলাম ব্যবসা করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না।

তুই কিছু ভাবিস নে—আজকাল ব্যবসা করতে টাকা লাগে না। এতগুলি ব্যাঙ্ক রয়েছে কি করতে? পাঁচশো টাকা দিয়ে account খুলে পাঁচহাজার টাকা overdraft পাওয়া যাবে। আর পাঁচহাজার টাকার account এর সাথে পঞ্চাশ হাজার টাকা এমনিতেই এসে যাবে।

সেদিন উমার সঙ্গে এই পর্যন্তই কথাবার্তা হল। ঠিক হল দুদিন পরে ওর সঙ্গে আবার দেখা করব। কয়েকটা দিন ভাববার জন্যে সময় নিলাম। উমাকেও বললাম—আরও একটু ভাল করে ভেবে দেখ।

আমি দিদির বাড়িতে ফিরে এলাম। সেদিন সারারাত্রি ঘুমুতে পারলাম না। শান্তনু সেন লক্ষ টাকা রোজগার করেছে!—সেই শান্তনু, যে ভাল করে কাপড় পরতে জানত না! আর আমি বিশ্ববিদ্যালযের চৌকস ছাত্র—পুরো ছটা বছর খেলাধুলা, গান-বাজনা আর debating society-র আসর জমিয়েছি। লক্ষ টাকা না হোক, নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা অদূর ভবিষ্যতে রোজগার করা এমন কি অসম্ভব হবে?

মনে মনে কিন্তু উমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারলাম না! রক্ষা ওর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল—না হলে হয়তো অধ্যাপনা শুরু করে ফেলতাম। পঁচাত্তর টাকার অধ্যাপকের চাকরি! কখনও লাখটাকার স্বপ্ন দেখা জীবনে আর হোত কি?

পরের দিন ভোরবেলা উঠেই দিদিকে প্রস্তাবটা না জানিয়ে পারলাম না। অদ্ভুত! দিদি কিন্তু মোটেই আশা দিলেন না। অবিশ্যি দোষ কিছুই নেই—দিদি সেই বাবার মেয়ে যিনি মেয়েদের

পঞ্চাশ টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টারদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, লক্ষপতি কনট্রাক্টরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে।

দিদি বল্লেন—আমি বাপু বুঝি সুঝি কম; ভাল বংশের ছেলে; লেখাপড়া শিখেছ, ব্যবসা ট্যাবসা আমি ভাল বুঝি নে। তুমি বরং প্রফেসরিটাই নাও।

কিন্তু ভগ্নীপতি উমার মতে সায় দিলেন। কারণ আছে—তাঁর ম্যাট্রিক ফেল ছোটভাই যুদ্ধের মধ্যে লাখ দুই টাকা কামিয়ে এখন এক কাপড়ের কলের ডিরেক্টর হয়েছেন। তিনি বল্লেন—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—প্রফেসরি করে কিইবা আয় করবে? ভাগ্যে থাকলে ব্যবসা করে এক বছরের মধ্যে ফেঁপে উঠতে পার।

এমনি মজা, কি ব্যবসা, কিভাবে কি করা হবে, তার খোঁজ আর কেউ করছে না। শুধু ব্যবসা কথাটাই যথেষ্ট! এরও কারণ রয়েছে। যুদ্ধের চার পাঁচটা বছর ধরে দেশের কতকগুলি লোক নানা ভাবে এত পয়সা কামিয়েছে যে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও কেউ ব্যবসার নাম গোত্র জানতে চাইছে না। ব্যবসা মানেই পয়সা। আর পয়সা মানেই সব কিছু। কিভাবে কে কি করছে জানবার দরকার নেই! হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র আর ঈশপের গল্পগুলি যেন মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেছে! যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব আর মহম্মদ war supply এর লক্ষ কোটি টাকার বিলের তলায় পড়ে কাতরাচ্ছেন। এই পাঁচটা বছরে পৃথিবীর সমস্ত মূল্যবোধ বদলে গেছে। প্রথমদিকে ছিল—যুদ্ধের আতঙ্ক। তারপরে পয়সা কামানোর মাদকতা সমস্ত আতঙ্ক আর ভীতিকে ছাপিয়ে উঠল।—"চাঁটগায়ের বুথিডং-এ আলু সাপ্লাই করতে হবে? বেশ তো রাজি আছি! দাম দশগুণ চাই, আর পাঁচমণ সাপ্লাই করে বিশ মণের বিল পাশ করিয়ে দিতে হবে।" মোটকথা পয়সা রোজগার দিয়ে কথা!

সত্যিই, দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। উকিল, মোক্তার ডাক্তার, ইস্কুল মাস্টার, যারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হতেন, আজ পাড়ায় তাদের কোনও পাত্তা নেই। আমাদের মফঃস্বল

শহরে পাড়ার দুর্গাপূজার কমিটির সভাপতি প্রত্যেকবারই দু তিন জন ভদ্রলোকের ভেতর থেকে যে কোনও একজনকে হতে দেখেছি—একজন বার-লাইব্রেরীর সভাপতি, আর একজন প্রবীণ এম. বি ডাক্তার, আর না হয়তো আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার কেশববাবু। ছোটবেলা থেকে এর ব্যতিক্রম বড় একটা দেখি নি।

কিন্তু ১৯৪৪ সাল থেকে পূজা কমিটির সভাপতিত্ব নিয়ে আরম্ভ হল কাড়াকাড়ি। পাড়ার অরবিন্দবাবু, গোবিন্দবাবু, জীবনবাবুরা এখন সভাপতি হবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। বলতে গেলে, উকিল, মাস্টার আর ডাক্তার বাবুরা সবাই ওদের এখন সমীহ করে চলা শুরু করেছেন। আগে কিন্তু ওদের কেউ চিনত না। আর চিনলেও পাড়ার কোনও উৎসব বা সামাজিক কাজে ওরা মাতব্বরি করবে একথা কেউ কখন চিন্তাও করে নি। ওরা সবাই মিলিটারী কনট্রাকটরী করে এখন কেউবা পাঁচ লাখ, কেউবা সাত লাখ টাকার মালিক। যে-বাড়িতে কখনও রোদ ঢুকত না সে-বাড়ি ভেঙ্গে আজ চারতলা প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। যে-ঘরে কেরোসিনের প্রদীপ ছাড়া কেউ কখনও জ্বলতে দেখে নি, সে-ঘরে আজ নিওন আলোকের সমারোহ। বাড়ির সামনে দু-তিনখানা করে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে।

যে সমাজ-জীবনে অর্থই প্রধান ছাড়পত্র সেখানে স্বভাবতঃই পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিকদের উচ্চাসন দেওয়া হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিই বা আছে? একবার শুনলাম অরবিন্দবাবু বারোয়ারী পূজায় দু'হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছেন—তাই শুনে গোবিন্দবাবু তিন হাজার দিতে রাজী হলেন। সব দেখে শুনে প্রবীণ উকিল আর ডাক্তারবাবু লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। হেডমাস্টার কেশববাবু কথা বললেন না। শোনা গেল তিনি ভিন পাড়ায় বাড়ি খুঁজছেন।

সমাজ জিনিসটা বরাবরই এইরকম নিষ্ঠুরভাবে পরিবর্তনশীল। কাকে যে কখন উঁচু আসন থেকে হিড়-হিড় করে টেনে নামিয়ে আনে আবার কাকে টেনে নিচু থেকে উঁচু আসনে বসিয়ে দেয় তার কোনও স্থিরতা নেই। তবে ইতিহাসের ধারার একটা বিশিষ্ট

গতিপথ আছে। বোধহয় যারা ইতিহাসকে খুব গভীরভাবে চিনতে বা জানতে পেরেছে, তারা এই ধারার বিবর্তনগুলিকে খুব স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারে—আর যারা তা পারে না, তারা ভাগ্যদেবীর ওপর সবটাকে ছেড়ে দিয়ে কখনও বা আশায় কখনও বা নিরাশায় দিন কাটায়। ইতিহাস বা কালের সংকেতকে বুঝতে না পারলে বলতে হয় মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে, আর বুঝতে পারলে বলতে হয় ইতিহাস মানুষ সৃষ্টি করে। তাই যে-ইতিহাস একদিন উকিল, ডাক্তার, হেডমাস্টারদের সৃষ্টি করেছিল, সেই ইতিহাসই আবার অরবিন্দ, গোবিন্দ আর জীবনবাবুদেরও সৃষ্টি করেছে।

পরের দিন সকালবেলা উমাশঙ্করের বাড়ি গেলাম। চমৎকার উমার বাড়িখানা। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ায় থাকার একটা মাদকতা আছে। ওদের বাইরের ঘরে বসে সেটা বেশ উপলব্ধি করতে পারছিলাম। চা পান পর্ব শেষ হবার পরে উমা সোজা চলে এল ব্যবসার কথায়।

ও বলল—ভেবে দেখলাম, একটা বড় দাঁ মারতে হবে। দু'বছর আগে হলে কোন অসুবিধা হত না—যা করেই হোক্ একটা কন্‌ট্রাকট নিয়ে ফেললেই দু-চার লাখ টাকা কামানো যেত। এখন কন্‌ট্রাকটের কাজ সব শেষ হয়ে এসেছে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ। এখন সব কিছু গুটোবার পালা। সৈন্যরা সব এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আরাকান, মণিপুর, রেঙ্গুন আর চাঁটগায়ের ফ্রন্টগুলি গুটিয়ে ফেলা হয়েছে।

—তা হলে উপায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আছে, একটা বড় ব্যবসা আমার হাতে। এক লাখ মণ ডাল সাপ্লাই করতে হবে আসাম গভর্ণমেণ্টকে।

—তুমি যে বললে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে? ব্যবসা বাণিজ্য স্বাভাবিক হয়ে এসেছে? আসাম সরকার নিজেদের ব্যবসা নিজেরাই

তো করতে পারেন। এর মধ্যে আমাদের ব্যবসা করবার scode কোথায় ?

—এখনও অনেক দেরি গো, অনেক দেরি—যাদের source আছে, তারা এখনও বেশ কিছুদিন করে খাবে।

—ব্যাপারটা খুলেই বল না ?

—ব্যাপার আর কিছুই নয়—আসাম গভর্ণমেণ্ট ওয়াগন পাচ্ছে না। সেখানকার ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করতে পারছে না।

—তা হলে আমরাই বা ওয়াগন পাচ্ছি কোথায় ?

—আমি পারব যোগাড় করতে। টেণ্ডারটা দিয়ে আসি চল আজকেই।

সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমার অবস্থা আমি নিজে ছাড়া আর কারও কাছে বোধগম্য নয়। ডালের ব্যবসা করে পয়সা রোজগার করতে হবে, এ-চিন্তা জীবনে কখনও করি নি।

পরের দিন উমার সঙ্গে একটা বড় আপিসে গেলাম। ওর পকেটে একহাজার টাকা।

—টাকাটা আবার কেন নিলে, উমা ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তা দিয়ে তোমার প্রয়োজন নেই। টাকা না দিলে ওয়াগন পাওয়া যাবে কি করে শুনি ?

আমি উমার হাত চেপে ধরলাম। দোহাই উমা—তোমার পায়ে পড়ি ; এসব ব্যবসা আমি করতে পারব না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি কর—আমাকে রেহাই দাও।

আমি যখন উমাকে পায়ে ধরবার কথা বলছিলাম, ঠিক তখনই আমাদের সামনেই একজন লোক সেই আপিসের আর এক ভদ্রলোকের পা জড়িয়ে ধরল। "দোহাই স্যার, আমাকে পাঁচখানা ওয়াগনের priority দিন। পার্টির কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে টাকা আগাম নিয়েছি ; পনের দিনের মধ্যে মাল পৌঁছে দিতে না পারলে, আমার উপায় নেই।"

ভারিক্কিচালে ভদ্রলোক বল্লেন,—এখন আমার সময় হবে না—সন্ধ্যার পরে বাড়িতে আসবেন।

ওয়াগনপ্রার্থীর মুখে হাসি ফুটল। সন্ধ্যার পরে বাড়ি যাওয়া মানে কাজ হাসিল হওয়া। দু-আঙুলে বাড়িয়ে-দেওয়া এন্‌ভেলপটা ভদ্রলোকটির হাতে দিয়ে লোকটি হেসে বলল—আচ্ছা স্যার, তাহলে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে আমি গাড়ি নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি।

আমি ভাবলাম—হায়রে ব্যবসা! হায়রে আমার বড়লোক হবার স্বপ্ন। কিন্তু—বড়লোক কি সবাইকে এমনি করেই হতে হয়?

—তোকে দিয়ে ব্যবসা হবে না—উমা বলল। হাজার টাকা দিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা রোজগার হলে ক্ষতিটা কি হতো শুনি?

—আমি পারব না উমা। ওরকম করে টাকা রোজগার আমাকে দিয়ে হবে না।

উমা ভগ্নহৃদয়ে আমাকে নিয়ে ফিরে চলল। ও আমার আগে আগে যাচ্ছিল; ওর মুখের ভাবটা লক্ষ্য করতে চেষ্ট করছিলাম। একি সেই উমা—যে জীবনের বহু সুখস্বাচ্ছন্দ্য একদিন বিনা দ্বিধায় এবং হাসিমুখে বিসর্জন দিয়েছিল আদর্শ রক্ষার জন্য! কিন্তু ওর দোষ কতটুকু? ইতিহাসের একটা তির্যক রেখা তখন উমাকে ডিঙিয়ে আমাকে প্রায় ধরো ধরো। উমারই বা দোষ কি? রোমে গেলে রোমানদের মত ব্যবহার করতে হবে বইকি! উমার আদর্শবাদ আমার কিংবা আর দশজনের আদর্শবাদের চেয়ে কমজোর কোনও কালেই ছিল না। ফাইন্যাল 'ল' পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার হলেন। দু'শ ছেলের মধ্যে উমাই একমাত্র ছেলে যে প্রতিবাদ করে হল ছেড়ে বেরিয়ে এল। সেই উমা আজ ঘুষ দেবার জন্য হাজার টাকা পকেটে করে নিয়ে এসেছে।

আদর্শবাদ অনেক সময়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? মাত্র তো বছর চারেকের কথা। ওর ছায়াটা ওকে ছাড়িয়ে আগে আগে চলেছে; নীরব নিস্পন্দ একটা লম্বা

ছায়া। রক্তমাংস দিয়ে গড়া উমার দেহ মনটাও কি আজ তার ছায়ার মত নীরব নিস্পন্দ! আমি কিন্তু মনে মনে উমাকে ক্ষমা করতে পারলাম না। এমন কি টাকার প্রয়োজন ওর আছে যার জন্য নিজেকে অমন করে ছোট করবার প্রয়োজন হতে পারে? লেখাপড়া জানা ছেলে—নাই বা হল ডালের ব্যবসা—নাই বা পাওয়া গেল ওয়াগনের প্রাইওরিটি! তাই বলে সেই লোকটার মত উমা ভদ্রলোকের পা জড়িয়ে ধরবে না কি?

ওয়েলেসলির মোড়ে এসে ট্রাম ধরবার জন্য দাঁড়িয়েছি—অনেকক্ষণ দুজনে কথা নেই; একটা অব্যক্ত লজ্জা মিশ্রিত বেদনাবোধ দুজনকে নীরবতায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর উমা আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল—হয়তো ও আমার সামনে ঘুষ দিতে যাওয়ার লজ্জাকে তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বেচারা, ওর কি দোষ! ব্যবসা করতে গেলে ঘুষ তো সবাই দিচ্ছে। হঠাৎ উমা আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল—পৃথ্বীশ, তুই কিছু মনে করিস না—আমরা ডাল সাপ্লাইএর ব্যবসা করব না। সত্যি কথা বলতে কি, এই রকম টেণ্ডার আরও অনেকবার বেরিয়ে গেছে। অন্ততঃপক্ষে পাঁচবার টেণ্ডার ফর্ম কিনতে এসে ফিরে গেছি। শুধু আজকেই টাকা নিয়ে এসেছিলাম। আজ তোর মনের যে অবস্থা, এর আগের চারবার আমার মনের অবস্থাও ঠিক এইরকমই ছিল। অনেক যুদ্ধ করেছি মনের সাথে; আজ ভেবেছিলাম, দুজন মিলে হয়তো বা চট্ করে একটা কিছু করে ফেলা যাবে। আমি আগেই ভেবেছিলাম—টেণ্ডার দেওয়া শেষ পর্যন্ত হবে না। জানিস্ ব্যাপারটা কি? বড় বড় সাপ্লাইএর কাজ করতে গেলে এরকমটা করতে হবেই। যারা ঘুষ দিতে পারে না, তারা কাজ পায় না। কতকাল কাজ না করে মানুষ থাকতে পারে বল্ তো?

—ঠিক আছে উমা—চল অন্য একটা কিছু করবার কথা চিন্তা করা যাক্।

—সেই ভালো—তুমি দিন দুই বাদে আমার ওখানে এস, এর মধ্যে আমি ভেবে দেখি কি করা যায়!

দুদিন বাদে ঘণ্টা দুই কনফারেন্স করে স্থির হল আমরা বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করব; অর্থাৎ যারা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে নিজেদের জিনিসের বিজ্ঞাপন করে থাকেন, তাদের বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করাই আমাদের কাজ। যেমনি বলা তেমনি কাজ। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ভারতীয় অংশে, অর্থাৎ ক্যানিং ষ্ট্রীট পার হয়ে গিয়ে একটি ছোট আপিস নেওয়া হল।

উমা বলল—আমাদের তো টাকা নেই বেশী—এখন ফার্নিচার কিনে টাকা ব্লক করবার কোনও মানে হয় না—এখনকার মতো ভাড়া করে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাক্।

আমি সায় দিলাম। প্রথম কথা, আমার তখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভাববার অভিজ্ঞতা হয় নি; দ্বিতীয় কথা উমার ব্যবসা বুদ্ধির ওপর আমার একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস এসে গিয়েছিল। তাই ওর কথায় সায় দিলাম।

ব্যবসাটা ভালই। তখন কলকাতার নব জাগরণের দিন। বিদেশ থেকে মাল মশলা কিছুই আসছে না। দেশে যা তৈরি হচ্ছে তারই প্রচুর চাহিদা। কিছু তৈরি করে বাজারে এনে হাজির করতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী। কলকাতা ও শহরতলীতে প্রায় তিনশো ওষুধের কারখানা চলছে; কাগজের পাতায় পাতায় তখন টনিকের বিজ্ঞাপন। ছ'বছর ধরে যুদ্ধের আতঙ্কে নার্ভাস সীসটেমের যে ক্ষতি হয়েছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য চাই প্রচুর টনিক।

বাংলাদেশে তখন প্রায় দুশো নতুন ব্যাঙ্ক। বেশীর ভাগই মফঃস্বলের পুরোনো লোন অফিসগুলিকে নতুন নামকরণ করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এক একটা ব্যাঙ্কের কম করেও একশটা শাখা। ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার লোকের অভাব নেই। নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের টাকা দিয়েই তখন একটা

ব্যাঙ্ক চলে। যুদ্ধের বাজারে এরা কনট্রাকটরদের টাকা জুগিয়েছে। clean overdraft এর ব্যবস্থা! শুধু contract-এর অর্ডার দেখাতে পারলেই যতটাকা চাই পাওয়া গেছে। আজ যুদ্ধ শেষে সব ব্যবসায়ী তাদের টাকা পয়সা গুটিয়ে যার যার ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে। ব্যাঙ্ক এদের বিশ্বাস করে, এরাও ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে। অনেক সুখ দুঃখের মধ্যে এদের প্রীতি বিনিময় হয়েছে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব নেই!

এই তো গেল দু, পাঁচ, দশ লাখের ইতিহাস। দু'চার কোটির ইতিহাস আরও বৈচিত্র্যময়।

শ্রীবুধনদাস আগরওয়ালা বিলিতী চা বাগানের মালিক মিঃ টমাসকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন—সাহেব তোমার অমুক বাগানটা আমার কাছে বেচে দাও।

—আমার বাগানের দাম কত জান? সাহেব বল্লেন।

—জানি না—বলুন না কত?

—গুডউইল নিয়ে আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র।

বুধনদাস রাজপুতানার লোক। তার বাপ দাদা কখনও মাছ মাংস স্পর্শ করে নি। যুদ্ধের সময়ে টমাস সাহেবের বাগানে গরুর হাড়ের সার সাপ্লাই করেছে। আজ সে টমাস সাহেবের চেয়ে কোন অংশে কম? অভিজাত হোটেলের লাউঞ্জে বসে পেগ দুই whisky টানবার পর সাহেবের চা বাগানটা কেনবার একটা বেয়াড়া মনোভাব বুধনদাসকে পেয়ে বসল।

মৌতাত জমবার মুখে টমাস সাহেব বাগানের দাম হাঁকল আঠারো লাখ। নতুন আর একটা পেগের অর্ডার দিয়ে বুধনদাস বলল—তুমি কত হলে বাগান বেচবে বল!

—পঁচিশ লাখ হলে বেচি। তাও আবার বিলেতের ডিরেকটরদের Permission নিতে হবে।

Permission তুমি নাও সাহেব—আমি তিরিশ লাখ দেব—বল তো আজই লয়েডস্ ব্যাঙ্ককে advise করছি তিরিশ লাখ তোমার লণ্ডন হেড্ অফিসের নামে ট্রানস্ফার করে দিতে।

টমাস সাহেব দেখল, বারো লাখ টাকার চা বাগান এক্ষুনি যদি আড়াই গুণ দামে বেচতে পারা যায়, মন্দ কি? সাত দিনের মধ্যে Barrington company-র ম্যানেজিং এজেন্সির বাহুপাশ চ্যুতা হয়ে বিগতযৌবনা এবং হৃতসর্বস্বা তারাসুন্দরী টি গার্ডেন লিমিটেড বুধনদাস আগরওয়ালার শয্যাসঙ্গিনী হোল। বুধনদাস বাইরের ঠাট দেখে বুঝতে পারে নি যে তারাসুন্দরীর দুটো রূপ আছে, একটা চাটার্ড অ্যাকাউণ্টট্যাণ্টদের রং-এর ছোঁয়াচে লাস্যময়ী বারবনিতার রূপ, আর একটা আঠাশ বছর ধরে Barrington company-র মন জুগিয়ে চলা বৃদ্ধা গৃহিণীর রূপ। বুধনদাস গৃহিণীকে দেখে নি, দেখেছে বারবনিতাকে। সে যদি জানতে পারত যে আঠাশ বছর পরে তারাসুন্দরীর গর্ভজাত চায়ের পাতাগুলো সব রূপ, রস বর্ণ এবং গন্ধহীন হয়ে গেছে, এবং বিদেশের বাজারে তাদের আর কোনও চাহিদা নেই, তাহলে হয়তো সে বাগানটা কিনত না, আর কিনলেও তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে নয়।

একদম কিনত না, একথা বলা মুস্কিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরাধীন দেশের ধনীদের রূপ বদলানো শুরু হয়েছে। আগে যেখানে পাঁচ লাখ টাকা থাকলে একটা লোককে ধনী বলা চলত, আজ যুদ্ধের দৌলতে সংখ্যাতত্ত্বটার রকমফের হয়েছে—এখন কোটি পাঁচেক হলে তবে তাকে ধনী বলা চলে। ইংরেজ ধনীরা পয়সা কামায় নি একথা বলা যায় না—কিন্তু তবুও বিপদাপন্ন দেশ এবং জাতিকে বাঁচাবার জন্য তাদের অনেক আত্ম-ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ধনীদের আত্মত্যাগের প্রশ্ন ওঠে নি।

যুদ্ধে অন্যরা লড়ছে—তাদের টাকা, তাদের সৈন্য, তাদের গোলাবারুদ। আমরা লোক জুগিয়েছি সত্য, কিন্তু যুদ্ধ করে

দেশকে বাঁচাবার জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের একটা কিছু সুরাহা করবার জন্য। বুধনদাসরা সব মাল সাপ্লাই করেছে যুদ্ধকে জয়লাভের দিকে এগিয়ে দেবার জন্য নয়—এক লাখকে এক কোটীতে রূপান্তরিত করবার জন্য। আর তা ছাড়া এতে আত্মত্যাগের কথাই বা আসে কোত্থেকে ? ইংরেজ গিয়ে যদি অন্যদেশ আসত, তাতেই বা ওদের ক্ষতিটা কোথায় ?

Barrington কোম্পানীর অফিসে গিয়ে বুধনদাস টমাস সাহেবের ঘরে ঢুকে দেখেছে। কি সুন্দর ঠাণ্ডা ঘর ! মুচকি হেসে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের নোট নিতে দেখেছে। আর দেখেছে রকিং চেয়ারে বসে সাহেবের দুলে দুলে টেলিফোনে কথা বলা। পনর হাজার টাকা মূলধনওয়ালা petty কণ্ট্রাকটর আজ দু'কোটী টাকার মালিক। আজ সে ইচ্ছে করলে টমাস সাহেবকে কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারে। আর পারে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরীকে আপিসের পর গাড়ীতে lift দিতে। তাই তারাসুন্দরীর রূপ-যৌবনের প্রশ্ন বড় কথা নয়—একদা বিলিতী সাহেবদের ক্রোড়-শায়িনী তারাসুন্দরীকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে এই যথেষ্ট !

আমাদের বিজ্ঞাপনের ব্যবসা ভালই চলছিল। বলাবাহুল্য Barrington কোম্পানীর মত বড় বড় জায়গায় ঢোকবার ছাড়-পত্র আমাদের ছিল না—সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল বড় বড় বিলিতী এবং আধা বিলিতী বিজ্ঞাপন কোম্পানীগুলির। আমরা প্রবেশাধিকার পেলাম ছোট ছোট নতুন গজিয়ে ওঠা কোম্পানী-গুলিতে। এগুলি প্রায় সবই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপরিসীম আশা এবং দুরাশার ভেলায় চড়ে এরা সব ব্যবসা-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। কারুরই টাটা বিড়লা হবার হয়তো আশা নেই, কিন্তু তার তলাকার ঘাটে ভেলা এসে ভীড়লেও তো ভীড়তে পারে ! এসব অফিসগুলো বেশ সাজান গোছানো। ঢুকেই একটা Reception ঘরের মতো—তারপরে মাঝখানে কেরানীবাবুদের বসবার হলঘর—হলঘরের চার পাশে বড়, মেজ,

সেঞ্জ এবং ছোট বাবুদের সব বসবার chamber। কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে হলে কার্ড দিতে হয়। সারা অফিসটা কেতা-দুরস্ত—বেশ লাগে দেখতে। বাঙ্গালীদের তো বটেই, এমন কি জাত ব্যবসায়ী ভাটিয়া গুজরাটীদের ছেলে ছোকরাদের অফিসেরও একই কায়দা। ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে চার পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতার ব্যবসা জগতের বাহ্যিক রূপের কি অসাধারণ পরিবর্তন হয়েছে। যারা পুরোনো কায়দায় গদীতে বসে ব্যবসা করত তারা হয়তো আজও গদীতেই বসছে—কিন্তু তাদের সাহেব হয়ে যাওয়া ছেলেরা এপাশে ওপাশে চেম্বার করে নিয়েছে।

ব্যবসা জগতের এই যে আঙ্গিক পরিবর্তন, এটা কিন্তু হঠাৎ কোন খামখেয়ালী ব্যাপার নয়। সমাজ জীবনে কোনও পরিবর্তনই হঠাৎ এবং অকারণে আসে না। ভূমিকম্পের পূর্বমুহূর্তে মূক ধরণীর গহ্বরে যে বিরাট বেদনাময় আকুলি বিকুলির আভাষ পাওয়া যায়, সমাজ জীবনেও ঠিক তেমনি করে পরিবর্তনের পূর্বমুহূর্তে অদ্ভুত সম্ভাবনাময় লক্ষণগুলো ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়ে আসে। আপনি, আমি যত চেষ্টাই করি না কেন, ধার্মিক ব্যক্তিরা যত আদেশ আর উপদেশ বাণীই ছাড়ুন না কেন, একদিন পরিবর্তিত ভাবধারা সমাজকে এসে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরবেই। আর সবচেয়ে মজা যে কোটি কোটি লোক এই পরিবর্তনের কম্পন তাদের শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করতে থাকে, আর পরিবর্তন যখন আসে তখন তাকে প্রিয়ার মত আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরে। ইতিহাসের শিক্ষাই তাই। আমি, আপনি ইতিহাসের তল্পীবাহক মাত্র।

যুদ্ধোত্তর কলকাতায়, আর শুধু কলকাতায় কেন, সারা ভারত-বর্ষে বিজ্ঞাপনের রেওয়াজ নতুন করে শুরু হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের ধারা ছিল সেকেলে; একটা শাড়ীর বিজ্ঞাপন

দিতে হলে শাড়ীর নাম, তুলনামূলক মূল্য আর প্রস্তুতকারকের নাম দিলেই চলত, আর এখন মীনাক্ষীর মনস্তত্ত্ব দিয়ে, শাড়ীখানার বিজ্ঞাপন দিতে হয়। ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারলে, তবে ভাল বিজ্ঞাপনের কাঠামো তৈরী করা যায়। এটা আমি বলছি ভারতীয় পণ্যের কথা। শ্রেষ্ঠ পণ্যগুলো তখনও সবই বিলেত থেকে আসছিল। দেশে তৈরি হত কাঁচা মাল—যা পাঁচ টাকা মণ দরে সাহেবরা কিনে নিয়ে জিনিস তৈরী করে এদেশে পঁচিশ টাকায় বিক্রী করত। বিলেতে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল। Haxton কোম্পানী ছাতার কাপড় পাঠাবে, Lindshey কোম্পানী মোটর পাম্প পাঠাবে, আর Indo-British কোম্পানী লেদ মেসিন পাঠাবে। Haxton-এর তৈরী Lathe ভারতে না এসে সাংহাইতে যাবে আর Lindshey কোম্পানীর তৈরী ছাতার কাপড় ইজিপ্টে যাবে। সারা দুনিয়াটা তখন ওদের দখলে—এক একটা দেশ দু'দশটা কোম্পানী মিলে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে লুটপাট করে খাচ্ছে। ভারতবর্ষের অনগ্রসরতার সুযোগে ওরা তৈরী পণ্যের বাজারে Monopoly করে নিয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাল অথচ সস্তা মাল যাতে না আসতে পারে তার জন্য Imperial Preference-এর কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ভারতবর্ষটাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। "আসতে পার এখানে, ক্ষতি নেই, কিন্তু বাবা ট্যাক্সটি দিতে হবে। সব রকম ট্যাক্স দিয়ে যদি পোষায় তবে আপত্তি নেই। আমরা ডেমোক্রেটিক জাত, তোমাদের বাধা দিতে পারি না।"

যদ্দিন ভারতীয় পণ্য তৈরী হচ্ছিল না, তদ্দিন বিলিতী জিনিসগুলির সাদামাঠা বিজ্ঞাপন দিলেই চলত। একই বিলিতী জিনিসের ভারতীয় বাজারের বিজ্ঞাপন আর কন্টিনেণ্টাল বাজারের বিজ্ঞাপনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কন্টিনেণ্টাল মার্কেটে প্রতিযোগীতা রয়েছে—নিজের মাহাত্ম্য কীর্তন করা ছাড়া গতি নেই। বড় লোকের সুন্দরী মেয়ের পাণিপ্রার্থী হতে হলে যেমন করে জ্ঞানী

গুণী ছেলেরা সব নিজেদের জাহির করে বেড়ায় ঠিক তেমনি। যুদ্ধে ইংরেজদের শিল্প ব্যাহত হয়েছিল—আরও বিশেষ করে জাপানী সাবমেরিনের ভয়ে শেষের দিকের এক দেড় বছর ভারতীয় কাঁচা মাল রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিটলারের বোমা ইংরেজ জাতকে পদানত করতে পারে নি সত্য, কিন্তু তাদের অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

তাই যুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই ভারতীয় শিল্পকে গড়ে তুলতে দেওয়ার ব্যাপারে ইংরেজদের বেশ খানিকটা অনিচ্ছাকৃত প্রশ্রয় ছিল। অনেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলল। আবার যারা অত রোমান্টিক হতে পারল না, তারা দেশী জিনিসগুলোর Sole-selling agency নিতে লাগল। মন্দ কি? বেশ চলতে লাগল নতুন পৃথিবীর নতুন রূপায়ণ—নতুন অংশীদারদের মধ্যে নতুন বোঝাপড়া।

তাই যুদ্ধোত্তর কলকাতায় বহু প্রকারের ব্যবসার গোড়াপত্তন হল, নিজেদের মধ্যে বেশ খানিকটা প্রতিযোগীতাও শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞাপনের এক নতুন যুগ শুরু হল।

দোভেন কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস আমাদের Advertising agent নিযুক্ত করল। নাম শুনে ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই—দোভেন মানে দেবেন—আমাদের পরিচিত দেবেনদা ও তার ছোট ভাই মিলে ওষুধ তৈরি করা শুরু করেছেন। দেবেনদা আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়—অনেকদিন এক সঙ্গে হেদুয়ার ধারে বসে বাদাম চিবিয়েছি, যুদ্ধকালীন অর্থ প্রাপ্তিই দেবেনদার এই নতুন প্রচেষ্টার উৎস। দেবেনদা ধুতি পাঞ্জাবী পরেন আর তার ভাই রবীনদা পরেন পাকা স্যুট। একখানা Plymouth গাড়ীও রয়েছে। উমাই প্রথমে দেবেনদাকে রাস্তায় পাকড়াও করে আমাদের আপিসে নিয়ে আসে। দেবেন-দা B.A.B.L. পাস করেছিলেন। সারা জীবনে যা রোজগার

করতে পারতেন না—দু'বছরেই তা কামিয়ে নিলেন। টাকা থাকলে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়; দেবেনদারও খুব আত্মবিশ্বাস ছিল। হিসেব করে দেখলাম, কলকাতা, বিহার, এবং আসামের কাগজগুলোতে ওর কথামত বিজ্ঞাপন দিলে মাসে পাঁচ হাজার টাকার বিল হবে।

—পাঁচ হাজার টাকা মাসে খরচ করা কি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—একটু ভেবে দেখতে দাও। দেবেনদা বল্লেন।

হঠাৎ রবীনদা লাফ দিয়ে উঠে বল্লেন—পাঁচ হাজার টাকা মাসে? তাতে হয়েছে কি শুনি? এক ম্যালেটোনা যদি সাপ্লাই করতে পারি তাহলেই মাসে দশ হাজার টাকা কামাবো। আপনারা কালকে থেকেই কাজ শুরু করুন।

—তাহলে আর্টিষ্টের কাছে lay out করতে দিই, কি বলেন? উমা বলল।

—নিশ্চয়ই আর মনে রাখবেন এক ম্যালেটোনারই এক এক সপ্তাহে এক এক রকম বিজ্ঞাপন বেরুবে—কাজেই lay out অন্ততঃ বারো খানা করতে দেবেন।

—অতগুলো lay out-এর জন্য আর্টিষ্টকে বেশ কিছু দিতে হবে কিন্তু—আমি বল্লাম।

রবীনদা বল্লেন—দিতে হলে নিশ্চয়ই দেব।

যথাসময়ে ম্যালেটোনার বিজ্ঞাপন শুরু হল। মাল কাটতে লাগল খুব ভাল। দেবেনদা মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে একজন কেমিষ্ট আর ছ'জন B. Sc. পাশ representative রাখলেন। আমাদের বিজ্ঞাপনের টাকাটা ঠিকমত পেয়ে যাচ্ছিলাম, তবে সব সময়ে তারিখ মত নয়। বিল পেতে দেরি হলেই উমা দেবেনদাকে বলত—একজন full-time Chemist-কে পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে না রেখে দেড়শো দুশো টাকা দিয়ে একজন part-time Chemist রাখুন, আর B. Sc. পাশ representative না রেখে ম্যাট্রিক পাশ লোক রাখুন—establishment charge অনেক

কমে যাবে। হয়তো উমা ঠিকই বলত, কিন্তু দেবেনদার তাতে ঘোর আপত্তি। তার মতে বেশী মাইনে দিয়ে ভাল Chemist না রাখলে ওষুধের standard খারাপ হয়ে যাবে।

—তুমি দেখে নিও উমা—একদিন দেবেনদার ভাই রবীনদা বল্লেন—আমাদের Laboratory থেকে একদিন এমন জিনিস বেরুবে, যা বিলিতী ওষুধের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

নতুন জগতে এমনিতরো বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিকাশ হবে কি করে? মাঝে মাঝে দেবেনদার কথা শুনে মনে হত Dovin Chemical কোম্পানী শুধু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই নয়, নতুন কলকাতার একটা রূপ নির্দেশক।

আর সত্যিই তাই হয়। পরাধীন দেশের শিল্প জাগরণের প্রথম দিকটাতে দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা আর ব্যবসা কি রকম করে যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। স্বদেশী আমলের প্রথম যুগে বহু বড় বড় দেশী শিল্প গড়ে উঠেছিল—যাঁরা এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশ সেবা কতটুকু করেছিলেন বোঝা মুস্কিল, তবে তাঁরা আত্মসেবার সঙ্গে দেশসেবার যে একটা সুন্দর সূক্ষ্ম সংযোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন, তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। দেবেনদার বেলায়ও তাই দেখেছি। Dovin Chemical-এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলতে বলতে তিনি অনেক সময় সারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বলে যেতেন—তাঁর যেন মনে হত যে স্বাধীনতার প্রকৃত জীবন্তরূপ Dovin Chemical-এর কৃতকার্য্যতার মধ্যে লুকিয়ে আছে। যদি পাঁচশো বোতল ম্যালেটোনা বিক্রী হয়ে সমপরিমাণ বিলিতী ওষুধ কম বিক্রী হয় তাহলে দেবেনদার লাভ তো হবেই, তা ছাড়াও দেড়শো বছরের পরমুখাপেক্ষীতার অচলায়তনে একটুখানি ফাটল ধরবে, সে ফাটল যত ক্ষুদ্রই হক না কেন। তাই বলছিলাম যে Dovin Chemical কোম্পানীর মত আরও শত শত নতুন প্রতিষ্ঠান শুধু যে যুদ্ধ ফেরতা হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকদের কর্মসংস্থান করছিল

তাই নয়, এরা সবাই মিলে ইতিহাসের একটা বিরাট ইঙ্গিতকে রূপদান করছিল—যা হয়তো পরবর্তীকালে দেশের সমগ্র সত্বাকে প্রকম্পিত করে তুলবে।

আগেই বলেছি, ১৯৪৫-৪৬ সালে বিজ্ঞাপনের ধারা বদলে গেছে। মীনাক্ষীর মনস্তত্ত্ব দিয়ে শাড়ীর বিজ্ঞাপন করতে হয়; কুইনিন আবিষ্কারের ইতিহাস দিয়ে ম্যালেরিয়ার ওষুধের বিজ্ঞাপন করতে হয়, আর হারকিউলিসের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে টনিককে সামনে তুলে ধরতে হয়। বিজ্ঞাপনের রীতির এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা দেশের এবং জাতির রুচি এবং কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ বছরের একটা মহাযুদ্ধ, সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছে। ১৯৪৬ সালের কলকাতাটা হঠাৎ পৃথিবীর যে কোনও শিল্পোন্নত দেশকে ছুঁয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল—শিল্প-পণ্য দিয়ে নয়, শিল্প পণ্যের মানসিকতা দিয়ে।

হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা উমা উত্তেজিত হয়ে আপিসে প্রবেশ করল। ব্যাপার কি উমা—আমি জিজ্ঞেস করলাম। উমা বলল—পেয়েছি একটা বড় পার্টি—যদি পাকড়াও করতে পারি, তাহলে মাসে হাজার খানেক টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—বলই না ব্যাপার কি?

—ডাঃ সেন বলে একজন ভারী চমৎকার লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজকে। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জিনিস তৈরি করবেন বলে একটা লিঃ কোম্পানী float করেছেন। সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর জিনিস হবে।

—আরে ছাই বলই না শুনি—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—Destructive Distillation of Cocoanut Shells.

—সে আবার কি?

—বুঝলে না? নারকেলের খোলগুলোকে পিষে, তার থেকে কেমিক্যাল তৈরি করবে।

আমি চুপ করে গেলাম। নারকেলের খোল থেকে যে-অপূর্ব জিনিস ডাঃ সেন তৈরি করবেন, তা আমার বোধগম্য নয়। আমার শুধু একটা দুশ্চিন্তা, মাসে ছ'সাত হাজার টাকার বিজ্ঞাপন ছেপে সময়মত পয়সা পাওয়া যাবে তো? না খবরের কাগজের বিল কালেক্টর এলে হন্যে হয়ে টাকার জন্যে ঘুরে বেড়াতে হবে?

Dovin Chemical-ই বলুন আর ডাঃ সেনের নারকেলের খোলের কোম্পানীই বলুন—এদের একটা জিনিস আমার ভাল লাগছিল না—এরা সবাই যেন আয় হবার প্রত্যাশায় আগেই বড় বেশী টাকা খরচ করে ফেলছিলেন। নারকেলডাঙ্গা আর বেলগাছিয়া খালের ধারে এদের ছোট্ট কারখানা—কিন্তু ডালহৌসী স্কোয়ারে এদের আপিস দেখলে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। অনেকদিন আমি ভেবেছি, এটা কি বাঙ্গালী, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর একটা রোগ বিশেষ? নিজেদের যেন বড্ড বেশী করে জাহির করবার প্রচেষ্টা। সব ক্ষেত্রেই ব্যবসাটা যেন একটা আত্মসম্মান রক্ষা করবার সংগ্রাম—যেন কোন উৎসুক আঁখির প্রখর দৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার একটা অদ্ভুত প্রয়াস।

ব্যবসা জগতেও শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সাধারণ চাকুরেদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়—তাদের দুশ্চিন্তা অনেক বেশী—অনেক বেশী plan করে না চললে তাদের পদে পদে বাধা। যুদ্ধোত্তর কলকাতার অভিজ্ঞতাবিহীন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের বেসামাল অবস্থার কথা আমি উমাকে অনেকবার বলেছি।

অবিশ্যি সমস্যাটার আরও অনেক দিক আছে। ধরুন আমাদের বিনয় গুপ্তের কথা। যুদ্ধের আগে মফঃস্বল শহরে ষ্টেশনারী দোকান ছিল। লেখাপড়াও কিছুটা করেছিলেন। পিতৃপুরুষের অবস্থা ভাল ছিল। যৌবনে বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তখন অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা বিনয় গুপ্তের মনে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর তিনি স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কলকাতা এলেন। এখন করেন

কি ? হাতে হাজার পঁচিশ টাকা। অনেক চিন্তা করে তিনি একটা ছোট আপিস করলেন, ডিসপোজালের মাল কেনা বেচা করবার জন্য। মন্দ নয়, ব্যবসাটা ভালই। অনেকে, বিশেষ করে বড়-বাজারের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী এই ব্যবসা দিয়ে কোটী কোটী টাকা রোজগার করেছে এবং এখনও করছে।

মিসেস গুপ্ত'র একটা standard of living আছে—ছেলে-পিলেদের ইস্কুলের মাইনে আছে—tutor রাখবার খরচা আছে, আর আছে মেয়ের গানের মাস্টারের দক্ষিণা। মাস গেলে বাড়িভাড়া নিয়ে ছ'শ টাকা খরচা। বিনয় গুপ্ত ভদ্রলোকের ছেলে। কলকাতায় এসে মিসেস-কে খরচ কমাবার কথা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। কাজকর্ম থেকে কিছু রোজগারের আগেই পাঁচ-সাত হাজার টাকা সংসার খরচায় বেরিয়ে গেল। যখন জাল কেবল গুটিয়ে এনেছেন, তখন মিঃ গুপ্ত দেখলেন তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা সতেরো হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর আরও কিছুদিন গেল। এক বছরের মাথায় এসে বিনয় গুপ্তর ব্যবসা করবার মূলধন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

অনেকদিন তিনি ভেবেছেন, ছেলেমেয়েদের পাবনা শহরে বাবার কাছে রেখে এলে মন্দ হত না। মাসে ছ'শো টাকা করে তার ক্যাপিটাল ভাঙ্গাটা হয়তো রোধ করা যেত। কিন্তু ক্যাপিটাল-ই কি সব ? স্ত্রীর acidity ব্যাধি আছে—ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—তাদের পড়াশুনো করাতে হবে। মেয়েকে গান শেখাতে হবে, সঙ্গীত পারঙ্গমা হবে বলে নয়, রঙ ময়লা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে পাত্রস্থ করতে গেলে গানের মহড়া দিতে হয় বলে। আর তা ছাড়া দেশের এই সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থায় বুড়ো বাবার কাছে স্ত্রীপুত্র পরিবার ফেলে রেখে আসাও অসম্ভব। হতে পারে বিনয় গুপ্তের ক্যাপিট্যাল নষ্ট হচ্ছে, হতে পারে ওর এমন দিন শীগ্‌গীরই আসবে যখন বাজার খরচা যোগাড় করবার জন্যে ওকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাত পাততে হবে ; —আস্তে আস্তে রেডিও যাবে, সেলাইর কল যাবে, মিসেস

গুপ্তর গয়না যাবে—আর যাবে সেই সাংঘাতিক জ্বালাময়ী অদৃশ্য তরল পদার্থটি—সম্মান। হোক তাই—বিনয় গুপ্ত তার জন্য প্রস্তুত হতে থাকুন, কিন্তু তাই বলে যদ্দিন পারা যায়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আর অসুস্থা স্ত্রীকে একটু আরাম দেওয়ার ক্ষুদ্র ব্যবস্থা-গুলি যাতে বানচাল না হয়ে যায়, তা দেখতে হবে তো ?

বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের এই অবস্থা—কিন্তু অবাঙ্গালী কিশোরীমল সুরজমলের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। সে এখন মস্ত বড় ধনী। ডিসপোজালের মাল কেনা বেচা করে দশ বিশ লাখ টাকা করে ফেলেছে। সবুজ রং-এর প্যারাসুটের কাপড় কিনেছিল মণিপুরের ডাম্প থেকে। এক লাখ টাকার কাপড় সাড়ে বারো লাখ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। শুধুমাত্র ডিসপোজালের অফিসারকে কিছু দেওয়া ছাড়া আর এক পয়সাও খরচ করতে হয় নি।

সুরজমলের এক ছেলে, এক মেয়ে। এগার বছর আগে সে প্রথম কলকাতায় আসে। ছেলেমেয়েদের দেশে রেখেই এসেছিল। মাঝখানে বার দুই দেশে গেছে—সময়াভাবে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। বেশতো আছে সে। তার সঙ্গে আপনি তিন ঘণ্টা আলাপ করতে পারেন। ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না যে একটি যুবতী স্ত্রী আর দুটি মমতামাখা সন্তানের সাথে তার গত পাঁচ বছর দেখা হয় নি। আমি, আপনি কিংবা যে কোনও বাঙ্গালী হলে প্রথম সাক্ষাতেই বহুদিনের না দেখা সন্তান দুটির ভবিষ্যতের কথা আলাপ হত।

তুলনা করুন বিনয় গুপ্ত আর কিশোরীমলের পরিবারের মধ্যে। আজ এই শরতের মিষ্টি রোদ্দুরের ছোপ লাগান সকালের কথাই ধরুন। কিশোরীমলের স্ত্রী আড়াই মাইল দূরের এক কুয়ো থেকে জল বয়ে নিয়ে এসে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে খেতে দেবে। চারটে গাই আর বাছুরকে দানা দেবে—তারপর ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবে। আর মিসেস গুপ্তকে দেখুন, বিছানায় আড়াআড়ি হয়ে পড়ে পূজো-সংখ্যাগুলি উলটে দেখছেন। রাত্রি বেলা স্বামীর সঙ্গে

বড় বড় দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার হবে। মিসেস গুপ্ত বলবেন—যাই বল, নায়কের বড্ড বাড়াবাড়ি, ওরকম ন্যাকামি করলে, কোন মেয়েরই ভাল লাগে না। ঠিক সেই সন্ধ্যায় শুক্লা রাতের তারাভরা আকাশের তলায় এক ফালি জ্যোৎস্না এসে কিশোরীমলের বধূকে জড়িয়ে ধরেছে। নিদ্রিত শিশুসন্তানদের পাশে শুয়ে শুয়ে সে স্বামীর কথা ভাবছে—আজ পাঁচ বছর দেখা হয় না—কিশোরী কি ঠিক তেমনি আছে? মুখে মুখে শুনতে পায়, তার স্বামী বহু টাকা করেছে—বড় বাজারে গদি নিয়েছে। আচ্ছা সে না হয় অন্যের মেয়ে—প্রয়োজন হোলে আরও দু-একটা তার মত মেয়ে কিশোরীমল পয়সা দিয়ে কিনতে পারে—কিন্তু বাচ্চা দুটো? ওদের জন্যেও কি কিশোরীর মন কেমন করে না?

এহেন কিশোরীমলও যদি টাকা না জমাতে পারে, তাহলে পারবে কে? তাই যখন টাকার অভাবে ডিসপোজালের একটা ভাল ব্যবসা মিঃ গুপ্তর হাতছাড়া হয়ে গেল, তখন কিশোরীমল কানপুরে নাট বল্টুর দুটো ডাম্প কিনে ফেলেছে। হিসেব করে দেখল, সত্যনারায়ণজী সহায় থাকলে লাখ চারেক আসবে।

কিশোরীমলের আরও দুই একটা ব্যবসা-বুদ্ধি আছে, যা বিনয় গুপ্তর নেই। মাস দুই আগে কিশোরীমল পাটনাতে আঠারো পেটি কসটিক সোডা পাঠিয়েছিল। রেলের রসিদ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পুরো টাকা দিয়ে ছাড় করে পাটনার ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী যা পেয়েছিল তা কসটিক সোডার মতই দেখতে একটা জিনিস, তবে কসটিক সোডা নয়। তাই নিয়ে বহু কথা কাটাকাটি, বহু চিঠিপত্রের যুদ্ধ। দুই একখানা চিঠির জবাব আমাকেও লিখে দিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিশোরীমল হাজার খানেক টাকা খরিদ্দারকে ফেরত দিয়ে বেমালুম আট হাজার টাকা লাভ করে ফেলল। কই করুক দেখি বিনয় গুপ্ত এই ব্যবসা? ফোকোটে পয়সা কামানোর ইচ্ছে বিনয় গুপ্তের নেই, একথা বলব না; সব গুপ্তরই আছে—কিন্তু কসটিক সোডার বদলে তেঁতুলের বীচি

ভরে আঠারো পেটি মাল পাঠানো বিনয় গুপ্তের কর্ম নয়—বিনয় গুপ্ত বড় জোর এক মণের জায়গায় পঁয়ত্রিশ সের মাল দিতে পারে, আর টানাটানির বাজারে ষোল টাকা হন্দরের জায়গায় পঁচিশ টাকা হন্দর দাম নিতে পারে—কিন্তু তাতে আর ক' টাকাই বা আসবে? তাই বলছিলাম, বিনয় গুপ্ত আর কিশোরীমল সুরজমলের মধ্যে তফাত অনেক। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিশোরীমল জিতবে। আগেই বলেছি, বিনয় গুপ্ত বাজার খরচার জন্যে বন্ধু-বান্ধবের কাছে হাত পাতবে—আর কিশোরীমল দশটা ব্যবসা ফেঁদে শেঠজী হয়ে বসবে। দানধ্যান করবে প্রচুর; সাহেব-সুবাদের ডেকে হোটেলে লাঞ্চ ডিনার খাওয়াবে। বিনয় গুপ্তের ছেলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, আর সুরজমলের ছেলে সেণ্ট জেভিয়াস´ থেকে পাস করে বেরুবে—চাই কি ব্যবসা শেখবার জন্যে বিলেত ঘুরেও আসতে পারে!

সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা আর জীবনের দৃষ্টি-ভঙ্গির হেরফেরে একজন ক্লাইভ ষ্ট্রীটে জাঁকিয়ে বসবে, আর একজন আস্তে আস্তে যে-পথ দিয়ে প্রবেশ করেছিল, সেই পথ দিয়ে নীরবে বেরিয়ে আসবে একটা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে—অতঃ কিম্।

একদিন আপিস থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছি হঠাৎ দেখি একটা বিরাট সাইনবোর্ড—Venus & Diamond। বাইরের থেকে দেখে মনে হল একটা ওষুধের দোকান। কেন যেন ভাবছিলাম যে হয়তো এখানে বিজ্ঞাপনের কিছু সুবিধে হতে পারে। পরের দিন আপিস যাবার পথে দোকানটার ভেতরে ঢুকে গেলাম। দেখলাম দামী স্যুট-পরা প্রবীণ এক ভদ্রলোক বসে আছেন—তিনি অবাঙ্গালী।

—আপনি কি চান? তিনি জিজ্ঞেস করলেন হিন্দীতে। আমার আসবার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতেই তিনি হেসে ফেললেন—তুমি এত

দেরি করে এসেছ ? আমি সারা ভারতবর্ষের বড় বড় কাগজগুলিতে মাসে প্রায় দশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন করি। আমার তো তিনজন এজেন্ট রয়েছে।

আমি মাথা চুলকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক বললেন—যেও না, বস—চা খাও। আমি বসলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেইবা এই ব্যক্তি, কিই বা এর ব্যবসা। মাসে দশহাজার টাকা বিজ্ঞাপনে খরচা করবার মত কি ব্যবসা এর আছে ?

বসে চা খাচ্ছিলাম ; এমন সময়ে ডাক পিওন এসে ষাট-সত্তর খানা মনিঅর্ডার ফর্ম রেখে গেল—বলে গেল—আধঘণ্টা পরে এসে টাকা দিয়ে যাবে। চট্ করে এক নজরে দেখে নিলাম—ডাঃ নারু, C/o Venus & Diamond।

এটা তাহলে ডাক্তারখানা ? ভদ্রলোক তাহলে ডাক্তার ? ডাক্তার নারু মনিঅর্ডার ফর্মগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—বেটা ! ফর্মগুলোর তলায় বাংলায় কি সব লেখা আছে, একটু পড়ে দাও তো ?

আমি পড়া শুরু করলাম। একখানা পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। বরিশাল থেকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন—'ডাক্তার সাহেব, অমুক তারিখের অমুক পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমার প্রাণে আশার আলো জাগিয়াছে। আমি নব বিবাহিত যুবক ; ছয় মাস বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু . . . । পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম। এক সপ্তাহের আন্দাজ ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন ; প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইব।'

প্রত্যেকটা মনিঅর্ডার ফর্ম ইংরেজীতে পড়ে পড়ে ডাক্তার নারুকে শোনাচ্ছিলাম। আর তাই শুনে শুনে ডাক্তার সাহেব উর্দ্দুতে টুকে নিচ্ছিলেন। ষাটখানা ফর্মে ডাঃ নারু প্রায় পাঁচ শ টাকা পেলেন। চা পান করবার পর তিনি আমার পিঠে সজোরে চপেটাঘাত করে বললেন—নারাজ হয়ো না বাবু

সাহেব ; তুমি লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক—তোমাকে আমি বিজ্ঞাপনের ব্যবসা দেব—লেকিন মাঝে মাঝে তুমি আমার ফর্মগুলো পড়ে দিয়ে যাবে।

দুদিন বাদে গিয়ে আবার দেখি পঞ্চাশ ষাটখানা ফর্ম এসে গেছে। ডাক্তার সাহেব যা বললেন, তাতে তো আমার চক্ষু স্থির! রোজই নাকি তার নামে অতগুলো করে ফর্ম আসে। ব্যবসা পেলাম। বহু টাকার ব্যবসা। ডাঃ নারু আর সবাইকে বরবাদ করে দিয়ে আমাদের এজেন্ট নিযুক্ত করলেন। জানি না কত লক্ষ অভিশাপ আমি কুড়িয়েছিলাম—আরও তিনজন এজেন্ট করে খাচ্ছিল—আমি তাদের হটিয়ে দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম ইচ্ছা প্রথমে আমার ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, ডাক্তার সাহেব দু'চারখানা কাগজ আমায় দেবেন—অন্য কাগজগুলোর ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি থাকবে। কিন্তু হয়ে গেল উলটো। আমিই সব কাগজ পেলাম ; মাসে বিল হতে লাগল প্রায় সাত হাজার টাকা। আর বিলের টাকা আদায়? কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিলিতী কোম্পানীগুলিও অমন করে টাকা দেয় না। হয়তো পনেরো দিন বাদে বললাম—ডাক্তার সাহেব, সাড়ে তিন হাজার টাকার বিল হয়েছে, কিছু টাকা দিন ; জানেন তো আমাদের ছোট ফার্ম, টাকা নেই। 'সাড়ে তিন হাজার?' বলে ডাক্তার সাহেব ড্রয়ার টেনে এক বাণ্ডিল নোট বের করে ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে ; তারপর বললেন—গুনে নাও।

আমি ভাবলাম, হবেই তো, যার মাসে পনেরো হাজার টাকা আয়, তারপক্ষে এ-টাকা দেওয়া তো কিছুই নয়। কিন্তু তাই বা বলি কি করে। এম. নাদান এণ্ড কোং আমাদের client—বিরাট কোম্পানী ; সিমেণ্ট আর সারের ব্যবসা। কত লক্ষ টাকা যে আয় তা কেউ বলতে পারত না। হলে কি হবে? পাঁচশো টাকার বিল নিয়ে গেলে পঁয়তাল্লিশ দিন পরের একটা তারিখ দিয়ে দিত। একদিন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শীতলভাইকে বললাম—সাহেব,

আমরা গরিব কোম্পানী; পাঁচশো টাকার বিল তুমি পঁয়তাল্লিশ দিন পরে দিচ্ছ কেন? একটু আগে দিতে পার না?

—কেন পারব না? সাহেব বললেন, পাঁচশো কেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার মুখের উপর এখনই ক্যাশ ছুঁড়ে দিতে পারি, কিন্তু দেব কেন শুনি? তোমার পাঁচশো টাকা চুয়াল্লিশ দিন খাটালে আমার কত রোজগার হয় জান? সেটা আমি ছাড়ব কেন? বাজারে আমার বিশ লক্ষ টাকার ক্রেডিট আছে। তিরিশ চল্লিশ দিন বিশ লক্ষ টাকা খাটালে কত হয় হিসেব করে দেখেছ? চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিনে বিলের টাকা মিটিয়ে আমি বছরে তিন চার লক্ষ টাকা কামাই—আমি কি বুদ্ধু, যে এই টাকাটা ছেড়ে দেব?

আমি মাথায় হাত দিয়ে নাদান কোম্পানীর গদির ওপর বসে পড়লাম! কি চুলচেরা হিসেব! অর্থকে শতগুণ করে বাড়িয়ে তোলবার কি অকৃত্রিম আগ্রহ! সার্থক তোমার অর্থের প্রতি ভালবাসা, শীতলভাই! তোমার এ-প্রেমের শুধু তুলনা হতে পারে সূর্যের প্রতি সূর্যমুখীর আর চাঁদের প্রতি নীল কৌমুদীর প্রেমের। কত যুগ যুগান্তর ধরে কত লক্ষ বিরহ তোমার হৃদয়ে তুমি পোষণ করেছিলে, তাই না আজ অর্থের প্রতি তোমার ভালবাসার এত গভীরতা!

Dovin Chemical-এর দেবেনদা কিংবা Venus & Diamond-এর ডাঃ নারু ঠিক এর উলটো—যদিও বিপরীত কারণে। দেবেনদা সাতদিন পর পর টেলিফোন করে বলতেন—ওহে বিল কত হয়েছে, টাকা নিয়ে যেও। তোমাদের ছোট ফার্ম; সবাই মিলে টাকা রুখে দিলে তোমাদের চলবে কেমন করে? আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে দেবেনদা ব্যবসায়ী নন; ভাল ব্যবসা করতে গেলে যে-হৃদয়হীনতা এবং স্বার্থপরতার প্রয়োজন হয়, তার কোনটাই দেবেনদার মধ্যে নেই। আমি জানতাম যে এমন একদিন আসবে যেদিন দেবেনদা সবার টাকা মিটিয়ে দেবেন, কিন্তু দেবেনদার টাকা কেউ মিটিয়ে দেবে না। ডাঃ নারুর ব্যাপারটা

একটু স্বতন্ত্র। তিনি দেনা পাওনার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন, কারণ, তিনি তার নিজের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান ছিলেন। এটা আমি আগে টের পাই নি। দিন কয়েক পরের একটা ঘটনায় ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আপিস ফেরতা টাকা আনতে Venus & Diamond-এ গেছি। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, ডাক্তার সাহেব নেই। দুটি যুবক এসে আমাকে আপ্যায়ন করে বসাল।

এই দুটি যুবক আমার পরিচিত। ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন এরা তাঁর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। যুবক দুটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্মার্ট। দুজনেরই গলায় ষ্টেথেস্‌কোপ ঝোলানো।

—তোমরা কি ওষুধ তৈরি কর? আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম।

একজন মুচকি হাসল। কথা বলল না।

—বলই না ব্যাপারটা কি?

—কিছুই তৈরি করি না—একজন বলল।

—তার মানে?—আমি জিজ্ঞেস করলাম—এই যে হাজার-হাজার টাকার মনিঅর্ডার পাচ্ছ?

—হ্যাঁ, সে তো জরুর পাচ্ছি।—আর একজন বলল।

—তোমরা কি ডাক্তার? কোত্থেকে পাস করেছ?

—আমরা দুজনাই ডাঃ নারুর ইস্কুলে পাস, বলে একজন হো হো করে হেসে উঠল।

—ডাঃ নারু কি ডাক্তার নয়? তোমরা বলছ কি?

—আমরা কেউই ডাক্তার নই। উনি আমাদের বাবা—আর তা ছাড়া……

আমি তখন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু খুব শান্ত আর বন্ধুভাবে বললাম—বলই না—এখানে তো তোমাদের বাবা উপস্থিত নেই।

তারপর যা শুনলাম সেটা হচ্ছে এই যে ডাঃ নারু বলে যে ভদ্রলোক আমার client, তিনি আসলে হচ্ছেন মহম্মদ সৈফুদ্দিন।

ডাঃ নারু নামটা একেবারেই ছদ্মনাম। পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায় বাড়ি। এর আগে সারা ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষা করে বছর চারেক আগে কলকাতায় এসেছেন। দু'টি ছেলে ; স্ত্রী থেকেও নেই বহুদিন। অনেক রকম ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হেকিমি দাওয়াই এর ব্যবসাটাই খুব জমেছে।

সব শুনে আমি উঠে পড়লাম—আমার আর তখন বসে থেকে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার মত ধৈর্য ছিল না। ছিঃ ছিঃ এমনি করে মানুষ মানুষকে ঠকায়? আর তা ছাড়া মানুষগুলিই বা কি? যেসব ব্যাধি অনায়াসে বিনা পয়সায় হাসপাতালে চিকিৎসা করে সারানো যায়, কিংবা অনেক কম পয়সায় ডাক্তারকে দিয়ে আধুনিক কায়দায় চিকিৎসা করানো সম্ভব, সেই সব ব্যাধি নিরাময় করবার জন্য অজানা অচেনা লোকের খপ্পরে পড়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করা—কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

পরের দিন আপিসে গিয়ে উমাকে সব কথা খুলে বললাম।

উমা কিন্তু আমার মত উত্তেজিত হল না। ও বলল—তাতে আমাদের হয়েছে কি শুনি? ডাঃ নারুর মত টাকা দেনেওয়ালা আর একটা পার্টিও তোমার হাতে আছে কি?

—ওর কাজ করব না উমা, ও একটা জোচ্চোর—আমি বললাম।

—আরও বছর দুই ক্লাইভ ষ্ট্রীটে থাকলে তোমার দেখছি ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবার মত অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে।

—যাই হোক, তুমি কি বলতে চাও, আমাদের এই সব অন্যায় এবং গর্হিত কাজে সাহায্য করা উচিত?

—থাক্‌গে তোমায় আর পাদ্রীর রোল প্লে করতে হবে না। সমাজের দুস্কৃতিকারীদের উপদেশ দেবার জন্য বহুলোক রয়েছে—তুমি আপাতত চুপ করে যাও।

উমা যতই বলুক না কেন, আমি মহম্মদ সৈফুদ্দিনের নিজ মুখ থেকে সব কিছু জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব শুরু হল। সেরেফ মানুষ ঠকিয়ে যারা খায়,

তাদের সাথে ব্যবসার সম্বন্ধ রাখা কি করে সম্ভব, তা আমি বুঝতে পারছিলাম না—সে-ব্যবসা যত অর্থকরীই হোক না কেন।

এই তো সেদিন শ্রীভুজঙ্গধর সেন বলে একজন রিটায়ার্ড District এবং Sessions Judge-এর সঙ্গে আলাপ হল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ঘরে বসে আলাপ হচ্ছিল। মিঃ সেন বলছিলেন বছর তিনেক আগে রিটায়ার করেছেন। পেনসনের অর্ধেকেরও বেশী টাকা commute করে বালীগঞ্জের বাড়িখানা করতে হয়েছে—হাতে জমানো টাকা কিছুই ছিল না, মাত্র হাজার তেরো অবশিষ্ট ছিল। অনেকেই বুদ্ধি দিয়েছিল—ব্যবসা বাণিজ্য করবার জন্য—কিন্তু সরকারী চাকরে, ব্যবসার কিই বা তিনি জানেন? একদিন ওঁর বাল্যবন্ধু রায়বাহাদুর দীনেন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অনিল এসে ধরে বসল—জ্যাঠামশাই, চমৎকার একটা ব্যবসা আছে, আপনাকে করতেই হবে। হাজার দশেক টাকা লাগাবেন; মাসে দু'হাজার টাকা পাবেন।

ভুজঙ্গবাবুর ছেলেপিলে নেই; রায়বাহাদুরের ছেলেপিলেরা সবাই তাঁকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকত; সম্মানও করত যথেষ্ঠ।

বুড়োবয়সে কিছু রোজগারের ইচ্ছে ছিল না এমন নয়; তাই একদিন দুপুর বেলা ভুজঙ্গবাবু শ্রীমান অনিলের আপিসে গিয়ে হাজির হলেন। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অভিজাত পাড়ায় ছোট্ট কিন্তু সাজানো-গোছানো একটি আপিস। অনিলের পাশে আর এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। অনিল আলাপ করিয়ে দিল—ওর পার্টনার মিঃ পট্টনায়ক। নমস্কার বিনিময়ের পর মিঃ সেন পট্টনায়ককে ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শুনলেন, ওদের নাকি সারা ভারতবর্ষে নানা প্রতিষ্ঠানে মাল supply-এর ব্যবসা। খুব যে একটা বড় ব্যাপার তা নয়, তবে কথাবার্তা শুনে মনে হল, মোটামুটি ভাল প্রতিষ্ঠান। সব দেখে শুনে ভুজঙ্গবাবু দশ হাজার টাকা ইন্‌ভেস্ট

করতে মনস্থ করলেন। শুধু অনিলকে বললেন—বাবা অনিল, এই আমার শেষ সম্বল। আমার ছেলেপিলে নেই—দেখো টাকাটা যেন নষ্ট না হয়। এখন সামান্য কিছু পেনসনের ওপর ভরসা। সঞ্চয় আর কিছুই নেই। তারপরের দিনই মিঃ সেন দশ হাজার টাকার একখানা চেক্ অনিলদের কোম্পানীর নামে পাঠিয়ে দিলেন।

মাস খানেক যেতে না যেতেই খবর পাওয়া গেল, পট্টনায়ক উধাও। অনিলকে পুলিশ খোঁজ করছে—আর তাঁর দশ হাজার টাকা চিরদিনের মত ডুবে গেছে।

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম—সে কি মিঃ সেন? ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কিছুই নয়, ভাঙ্গা গলায় মিঃ সেন যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে পুলিশ একটা আন্তঃপ্রাদেশিক Railway Receipt Fraud case ধরে ফেলেছে। একটা বিরাট দল লাহোরে হেডকোয়ার্টার্স করে সারা ভারতবর্ষে ব্যবসা শুরু করেছিল। যারাই টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে Railway Receipt খালাস করেছে, তারাই দেখতে পেয়েছে যে Receipt গুলো সবই জাল। প্রায় ছ' মাস পরে পুলিশ এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারল। কিন্তু তদ্দিনে ষড়যন্ত্রকারীরা বাজার থেকে প্রায় পনেরো লাখ টাকা কামিয়ে সরে পড়েছে। ভুজঙ্গ সেনের পুত্রপ্রতিম শ্রীমান অনিল আর তার পার্টনার পট্টনায়ক সেই বিরাট জোচ্চুরীর ব্যবসার খপ্পরে পড়ে গিয়ে নিজেরাও ডুবল, বৃদ্ধ ভুজঙ্গধর সেনকেও ডোবাল।

মিঃ সেন বললেন—অনিলকে জেল থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম অনেক—কিন্তু পারি নি। তার যেদিন ছ' বছর জেল হল, তার ঠিক দুদিন পরে আমার বাল্যবন্ধু রায়বাহাদুর দীনেন্দ্র ঘোষ হার্ট ফেল করে মারা যান। মনে হয় প্রিয় পুত্রের এই পরিণতি তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

উমা আমার পাশেই বসে ছিল।

—তোমার কিছু বলবার আছে?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—দোষ হচ্ছে ভুজঙ্গধর সেনের—উমা বলল—ওঁর কি প্রয়োজন

ছিল টাকার লোভে না দেখে শুনে দশ হাজার টাকা ওরকম ভাবে ইন্‌ভেস্ট করবার ? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

—এদের সব গুলি করে মেরে ফেলা উচিত—আমি বললাম।

—চেষ্টা করে দেখতে পার, উমা বলল—তবে মুস্কিল হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

আমি চুপ করে গেলাম। ভাবলাম, বোধ হয় আমার ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আসা ঠিক হয় নি।

অদ্ভুত জায়গা এই ক্লাইভ ষ্ট্রীট। একটা রাস্তা হলে কি হয়; শত লক্ষ মানুষের প্রাণ চঞ্চলতায় এমন সজীব যে, যে কোনও মুখর লোককে হার মানিয়ে দেয়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের যেন নিজস্ব একটা ভাষা আছে। আমার আপনার কাছে হয়তো সে-ভাষা দুর্বোধ্য। কিন্তু যারা সে-ভাষার সঙ্গে পরিচিত, তারা ওর সঙ্গে কথা বলে, হাসে, সুখ দুঃখের ভাব বিনিময় করে। রামদীন দারওয়ান ওর কথা বুঝতে পারে। শঙ্করলাল আগরওয়ালা ওর সবগুলো code মুখস্থ করে রেখেছে। জনসন সাহেব ওর ফিঁয়াসে। সেই কবে দু'শ বছর আগে সাহেবের ঠাকুর্দ্দা ডালহৌসী স্কোয়ারে কোম্পানীর সেপাই হয়ে এসেছিল; তার ছেলে ছোট লাটের একান্ত সচীব হয়েছিল; তৎপুত্র জনসন সাহেব ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর বড় সাহেব। তাই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাথে ওদের বহু দিনের পরিচয়। মিঃ সরকার আর মিঃ ঘোষের মত লোকদের সাথেও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের যে অন্তরঙ্গতা হয় না, এমন নয়, কিন্তু অতি স্বল্প কালের জন্য; ওরা ওর ভাষা বুঝতে পারে না—আকারে ইঙ্গিতে কতদিন চলে ? আর তা ছাড়া ক্লাইভ ষ্ট্রীট বড় ছলনাময়ী। এর সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে যে-সাংঘাতিক ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, তা খুব কম লোকেরই থাকে। যারা ধৈর্য ধরে থাকতে পারে, যারা কুহকিনীর মায়াজাল এড়িয়ে প্রাণ

বাঁচাতে পারে তারা ওর ভালবাসা পায়। যারা মায়াবিনীর প্রথম উচ্ছ্বাসে নিজেদের হারিয়ে ফেলে, তারা কালের অতল গহ্বরে ডুবে যায়, যেমন যেতে লাগল বাংলা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলো।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি থেকেই ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা টলটলায়মান। সোনার বাংলা, দেশলক্ষ্মী আর ভারতরত্ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টররা বুঝতে পারেন নি যে মায়াবিনী ক্লাইভ ষ্ট্রীট ওদের উৎখাত করবার জন্য সঙ্গোপনে ষড়যন্ত্র করছে। সত্যিই সে এক বিরাট ষড়যন্ত্র। বড় বড় বিদেশী ব্যাঙ্ক আর তাদের তাঁবেদার ভারতীয় ব্যাঙ্কের মালিকরা ছোট ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম গোড়া থেকেই অপছন্দ করছিল। এরা বড্ড বেশী স্বাধীন ভাবে চলতে চাইছিল—টাকা পয়সা দিয়ে বড্ড বেশী উৎসাহ দিচ্ছিল ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে। ব্যাঙ্ক ফেল কিন্তু কখনও টাকার অভাবে হয় না, হয় বিশ্বাসের অভাবে। বেশ কিছুদিন হয় একটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল যে ছোট ব্যাঙ্কগুলির ওপর হয়তো একটা প্রচণ্ড আঘাত আসবে। কর্মকর্তারা সব রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ছুটোছুটি করতে লাগল। সাহেবদের হাতে পায়ে ধরাধরি।

'দোহাই সাহেব—একটু বলে দাও, কোন ব্যাঙ্কের ওপর Run হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পেছনে আছে। তাহলেই আমরা এ যাত্রা রেহাই পাই।' কিন্তু রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে সামলাবে কে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নাক সিঁটকিয়ে বললেন—বুঝিতো সবই—কিন্তু তোমরা তো Scheduled ব্যাঙ্কের পর্যায়ে পড় না—তোমাদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারব না।

ওদিকে ব্যাঙ্কগুলির উপর share market-এর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। যুদ্ধ শেষে শেয়ার বাজারে যে উর্দ্ধমুখী ভাব দেখা গিয়েছিল, আস্তে আস্তে তা কমে আসতে লাগল। দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজারওয়ালারা দুই বছরের মধ্যেই কাত হয়ে পড়েছে।

বাজারে শেয়ারের কেনা বেচা নেই। যেসব ছোটখাট ব্যবসায়ীরা শেয়ার জমা রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়েছিল, তাদের ওপর আদেশ এল—যে পরিমাণে শেয়ারের মূল্য কমেছে সেই পরিমাণে টাকা জমা দাও।

ইতিমধ্যে হংসরাজ দামানীর দালালরা বাজারে রটিয়ে দিল, শেয়ারের মূল্য সাতদিনের মধ্যে অর্ধেক নেমে যাবে। তিনমাস আগে দামানীর এবং তার দলের লোকরা দুটো ছোট্ট ব্যাঙ্কে লাখ কয়েক টাকা রেখেছিল। হঠাৎ সেই ব্যাঙ্ক দুটোতে Run হল। দামানীরা তাদের টাকা কায়দা করে তুলে ফেলল। কিন্তু মরল Dovin Chemical, Dr. Sen-এর কোম্পানী আর বিনয় গুপ্ত। ওদের সর্বস্ব গেল। বুধবার দেশলক্ষ্মী আর ভারত-রত্ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল—বৃহস্পতিবার হংসরাজ দামানীর এজেণ্টরা শেয়ার বাজারে গুজব ছড়াল—কলকাতায় বহু ব্যাঙ্ক ফেল পড়বে—শেয়ারকা বাজার দাব্ গিয়া—বেচো। মাত্র দুটো ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছিল—শেয়ারের বাজার নেমে যাবার সাথে সাথে যেসব ব্যবসায়ীরা শেয়ার জমা রেখে overdraft নিয়েছিল, তাদের কাছে ছোট বড় সব ব্যাঙ্কই টাকা ফেরত চেয়ে বসল। লক্ষ কোটিপতিরা টাকা জমা দিয়ে দিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কলকাতার বাঙালী হাজার-পতিরা টাকা জমা দিতে পারল না। তাদের ব্যবসায়ে তালা পড়ল—ব্যাঙ্কের তালা। ওদিকে ব্যাঙ্কগুলিতে যখন Run শুরু হল তখন তারা clientদের কাছ থেকে টাকা পেল না। সাতদিনের মধ্যে আঠারটি ছোট ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল।

Dovin Chemical-এর দেবেনদা একদিন বিকেলে ছুটতে ছুটতে আমাদের আপিসে এসে বললেন—সর্বনাশ হয়েছে ভাই, আমার সর্বস্ব গেছে। জান তো প্রায় দেড়লাখ টাকা ইন্‌ভেস্ট করেছিলাম—সবই যাবার পথে।

—আপনারা কি কিছুই আগে থেকে টের পান নি?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—পেয়েছিলাম—কিন্তু ভাবলাম বাঙালীর ছোট প্রতিষ্ঠান—আমরা সবাই যদি একসঙ্গে টাকা নিয়ে টানাটানি করি, তাহলে তো আমরাই ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে দেব।

—কিন্তু এখন ?—উমা জিজ্ঞেস করল—এখন বাঁচবেন কি করে ?

—উপায় কিছু নেই—স্ত্রীর নামে লয়েডস্ ব্যাঙ্কে হাজার পঁচিশেক টাকা আছে তাই দিয়ে মুখ রক্ষা করতে হবে।

দেবেনদা চলে গেলে আমি উমাকে বললাম—দেবেনদার তো বউ-এর পঁচিশ হাজার টাকা আছে—আমাদের আছে কি ? Dovin Chemical-এর কাছে ছ'হাজার টাকার বিল পাওনা আছে জান তো ?

—তাও বা কোনরকমে উত্‌রে যেতাম যদি Atlantic Bank হঠাৎ overdraft বন্ধ করবার নোটীশ না দিত।—উমা বলল।

আমি খবরের কাগজের আপিসের একখানা চিঠি বের করে উমাকে পড়িয়ে শোনালাম। এবার থেকে সাতদিনের বেশী ক্রেডিট পাওয়া যাবে না !

ডাঃ সেনের কোম্পানীর বিজ্ঞাপন সবে শুরু হয়েছিল। বিল হাজার তিনেক টাকায় উঠেছে। একদিন তার ভাই বিনয় সেন বিষণ্ণ বদনে আমাদের আপিসে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন।

—ব্যবসা আর চালাতে পারলাম না পৃথ্বীশবাবু।

—আপনাদের ব্যাঙ্কও ফেল পড়ল নাকি ?—উমা বিনয়কে জিজ্ঞেস করল।

—শুধু ফেল পড়েছে ? ওদের আশায়ই বুক বেঁধেছিলাম। ওরা বলেছিল তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত overdraft পাওয়া যাবে। দাদা হতাশ হয়ে পড়েছেন। জানেন তো, উনি বিলেত-ফেরতা ভালো স্কলার। আজ পর্যন্ত একটাও ভাল চান্স পেলেন না। আমি যুদ্ধের বাজারে পনেরো বিশ হাজার টাকা কামিয়েছিলাম। দাদা ভেবেছিলেন আমার এই টাকার সাথে ব্যাঙ্কের overdraft টা

মিলিয়ে একটা নতুন chemical তৈরি করবার কারখানা করবেন। তারও দফা শেষ হল। overdraft তো চুলোয় গেল—আমার বহু কষ্টে রোজগার করা টাকাও গেল।

বিনয় সেন বিষণ্ণ বদনে চলে গেলেন। আর শুধু বিনয় সেন কেন, কত মজুমদার, দাশগুপ্ত, মুখুজ্জ্যে, চাটুজ্জ্যে যে তখনকার কলকাতায় নিদ্রাহীন রজনী যাপন করছিলেন তার ঠিক নেই। সকলের মুখেই এক কথা, সব গেল! সব গেল! কাকে এ-নালিশ জানাতে যাবে; কেই বা এর প্রতিকার করবে?

Dovin Chemical আর ডাঃ সেনের কোম্পানীতে আমাদের নয় হাজার টাকা ডুবল। আমাদের মূলধন ছিল পাঁচ হাজার—আর চার হাজার এ্যাটলান্টিক ব্যাঙ্কের overdraft। নোটীশ এসেছে সাতদিনের মধ্যে overdraft পরিশোধ করতে হবে। টাকা কোথায়?

—একটা শুধু উপায় আছে, উমা বলল।

—কি উপায় বল তো?

—কোম্পানীর কাজ বন্ধ করে বাড়ি চলে যাওয়া।

—সে অসম্ভব, আমি বললাম।

—তোমার কাছে তো সবই অসম্ভব—এ-বাজারে কত জন উতরে গেল জান?

—হয়তো তাই—কিন্তু টাকা পরিশোধ না করে পালিয়ে যাব এ-কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচরে। পালিয়ে যাব না কিছুতেই—যদি টাকা না দিতে পারি পাওনাদারদের জানিয়ে দিয়ে যাব।

উমা যা বলেছিল তা সত্যি। এই বাজারে অনেকে উতরে গেল। কিশোরীমল সুরজমলের সঙ্গে কয়েক দিন বাদে দেখা। আমি ভেবেছিলাম কিশোরীমল ভারী মুখ করে আমাকে সম্ভাষণ করবে। দেখলাম ঠিক উলটো। কিশোরীমলের মনে আনন্দ ধরে না। একথা ওকথার পর ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার কথা উঠল।

—আপনার কি অবস্থা কিশোরীবাবু, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হনুমানজীর কৃপায় আমার কিছু হয় নি।

—তার মানে? এত লোকের টাকা পয়সা পয়জার হল, আর আপনার কিছুই হল না?

—আমরা তো আর ঘরের টাকা দিয়ে ব্যবসা করি না—লম্বা overdraft ছিল—লাল কালির দাগ। overdraft-এর টাকা যা ছিল তা আর দিতে হয় নি।

আমার প্রশ্নের জবাবে কিশোরীমল যা বললে তার অর্থ হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের গোডাউনে মাল রেখে সে টাকা নিয়েছিল। কিন্তু আসলে মাল কিছুই ছিল না। দু-হাজার বস্তা মুশুরীর ডালের বদলীতে দু-হাজার বস্তা ডালের ভূষি রেখে দিয়েছিল। মাত্র হাজার চারেক টাকা দেবে গেছে। overdraft নেওয়া ছিল ছাব্বিশ হাজার টাকা।

আমি বললাম, কিন্তু এখন ব্যাঙ্কের liquidator আপনার নামে নোটীশ দিয়ে টাকাটা আদায় করে নেবে।

—আমাকে পাবে কোথা? overdraft তো কিশোরীমল সুরজ-মল নেয় নি—নিয়েছিল সিউকিষণ ছগনলাল কোম্পানী। ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর সিউকিষণ ছগনলালও ফেল পড়ে গেছে।

—তাহলে আপনি আগে থেকেই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে-ছিলেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—ব্যবসায়ীর জাত আমরা—আগেই ভাবতে হয় বইকি?

—আপনারা এত ভাবলেন অথচ দেবেনদা কিছুই ভাবতে পারলেন না?

—বাবুজী তোমরা বাঙ্গালী; স্কুলে কলেজে পড়েছ, তোমরা কি এত সব ভাবতে পার?—বলে কিশোরীমল এমন একখানা হাসি হাসল যা শুনলে যে কোন সুস্থ লোকের বুকের রক্ত জল হয়ে যাবে।

তাহলে উমা মিথ্যা বলে নি। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় হাজার হাজার মধ্যবিত্ত পরিবার পথের ভিখিরি হয়ে গেল সত্যি—কিন্তু আবার অনেকে এই সুযোগে এক লাফে হাজারপতি থেকে লক্ষ-পতি হয়ে গেল। সাবাস্. ক্লাইভ স্ট্রীট।

হে মায়াবিনী, তোমার কাছ থেকে শত কেন সহস্র হস্ত দূরে গেলেও মানুষের নিস্তার নেই। তুমি সমাজের স্নায়ুতন্ত্রীটা এমন ভাবে অধিকার করে আছ যে, যা কিছু এখানে ঘটছে বা অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে সব কিছুর উপরই তোমার অবাধ কর্তৃত্ব। আজ সন্ধ্যায় তোমার গহ্বরে বসে কর্তারা যে-অভিসন্ধি আঁটছেন, কাল ভোর হবার আগেই সারা দেশের একান্ত নির্জ্জন পল্লীতে পর্যন্ত তার ঢেউ গিয়ে লাগবে। চাই কি এইটুকু সময়ের মধ্যে সারা বিদেশের বাজার শুদ্ধ ওলট পালট হয়ে যেতে পারে।

হংসরাজ দামানীর দালালরা সেই যে শেয়ার বাজারে "বেচো" রব তুলে দিল, তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল তখনই। যে যেখানে পারছে শেয়ার বেচছে। হ্যামিলটন কোম্পানীর বড় সাহেব তার দালালকে বললেন—বেচো। মুফৎলাল তার দালালকে বললেন—বেচো। দমদমের রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর হরিশবাবু তার দালালকে বললেন—বেচো। এ বিক্রীর আর শেষ নেই। যে পারছে সেই বেচছে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে বিষণ্ণ বদনে অনেককেই বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। প্রায় সবারই মুখ চুন। শুধু হংসরাজ দামানী শেয়ার কিনছে, অবিশ্যি একা নয়। তার দলে আরও আছে অনেকে। জনা বারো মিলে ছ'টা চায়ের কোম্পানীর প্রায় সবগুলি শেয়ার ওরা কিনে ফেললে। যারা বেচল তাদের কোন আপশোষ নেই। লোকসান হয়তো হয়েছে, কিন্তু বেচে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ত? আর তা ছাড়া বেচনেওয়ালাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা দামানীদের মত নিজেরাও বহুবার কিনেছে—

এবার তাদের বেচবার পালা। দেখা যাক! আজ বেচছে,—হয়তো কাল আবার কিনবে। ভাগ্যচক্র এমনি ক'রেই তো ঘোরে চিরকাল! এই সব হংসরাজ দামানীর দল একে অন্যের প্রতি গভীর বিদ্বেষ এবং হিংসা পোষণ করে। কিন্তু কেউ দেখলে, বুঝতে পারবে না। একে অন্যের বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশনে যাচ্ছে; রাস্তায় দেখা হ'লে "জয়রামজী" বলে সম্ভাষণ করছে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবাই গুপ্ত ছুরিকা শাণ দিচ্ছে। সুযোগ পেলে কেউ কাউকে ছাড়বে না।

মাস দুই পরে খবরের কাগজে বের হল শ্রীধর, মাটিগোদা প্রভৃতি কয়েকটি চা বাগানের শেয়ারের দাম ছত্রিশ টাকা থেকে তেরো টাকায় এসে নেমেছে। হংসরাজ দামানীরা চব্বিশ টাকায় বেশির ভাগ শেয়ার কিনেছিল—কিন্তু মাত্র দুই মাসের মধ্যে দাম চব্বিশ থেকে তেরোতে নেমেছে। দামানীদের মাথায় বাজ পড়ল। এই রকম করে যদি শেয়ারের দাম পড়তে থাকে, তাহ'লে তারা সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিয়ে মোট যে শেয়ার কিনেছিল, তার মূল্য এসে চার লাখে দাঁড়াবে। খবরের কাগজে কয়েকদিন পরে বিজ্ঞাপন ছাপা হল, সবগুলি বাগানই শতকরা বারো টাকা হারে dividend দিয়েছে। হংসরাজদের বাঁচবার শেষ চেষ্টা। এর পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস ছিল।

শেঠ ঘটিরাম ভিস্তিওয়ালার হাতে শ্রীধর আর মাটিগোদা কোম্পানীর মোটা শেয়ার ছিল। দামানী কোম্পানীর ষড়যন্ত্রে পড়ে তার বহুটাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু দামানী বাবাজীরা যাবে কোথায়! ভিস্তিওয়ালা মাটিগোদা চা বাগানের প্রবীণ ম্যানেজারের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করে বলল—সাহেব, তুমি ছ'মাসের জন্য ফার্লোতে বিলেত যাও। ছ'মাসের জন্যে ছত্রিশ হাজার টাকা আর যাতায়াতের ভাড়া দেব। ম্যানেজার মিঃ টমাস দেখলেন মন্দ কি? অতগুলি টাকা একসঙ্গে পাওয়া যাবে, আর তার ওপর Home থেকে ঘুরে আসবার একটা মস্ত সুযোগ। তিনি রাজী

হলেন। যেই না টমাস সাহেবের কার্লোতে যাওয়া, অমনি ভিস্তি-ওয়ালা বাজারে গুজব রটাল, মাটিগোদার চব্বিশ বছরের expert ম্যানেজার মিঃ টমাস কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। দামানীরা কর্মভার গ্রহণ করায় বাগানের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার! সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। দুটি চা বাগানের শেয়ারের দাম পড়তে পড়তে তেরো টাকায় এসে দাঁড়াল। হংস-রাজ কাৎ। দুই মাসের মধ্যেই দালাল বেরুল বাজারে—হংস-রাজরা দুটি বাগানই বিক্রী করবে। ঘটিরাম ভিস্তিওয়ালারা জনা ছয়েক মিলে দশ লাখ টাকার বাগানের দাম দিতে চাইল পাঁচ লাখ। অনেক বলে কয়ে ছ'লাখে বাগান দুটো বেচে দামানীরা আত্ম-সম্মান বাঁচাল।

ক্লাইভ স্ট্রীটের চিড়িয়াখানায় কিছুদিন না হাঁটলে আমার আপনার মত অল্পবুদ্ধি লোকেরা এখানকার প্রাণীদের হাব্-ভাব্ বুঝতে পারবে না। একদিনের মধ্যে কেউ বা লক্ষপতি হয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ বা হয়ে যাচ্ছে পথের ভিখিরি।

উমাই কয়েকদিন আগে বলেছিল—এখানকার চিড়িয়াখানাটা দেখে আসি চল। তারপরই দু'জনে একদিন গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় দু'বছর হল ক্লাইভ স্ট্রীটে এসেছি—ষ্টক এক্সচেঞ্জটা এখনও ভাল করে দেখা হয় নি। যাবার কখনও দরকার হয় নি। তাই সেদিন উমার সঙ্গে গেলাম।

কথা লুকোবোনা—খানিকটা লেখাপড়া শিখেছি বলে উন্নাসিকতার পরিচয় দেব না—কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে আদিম মানুষের থেকে আমাদের দূরত্ব খুব বেশী নয়। জামা কামিজ যতই পরিনা কেন, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে যতই প্রসাধন করিনা কেন, সমাজের এমন অনেক স্তর আছে যেখানকার আচার ব্যবহার যে কোনও হিংস্র প্রাণীদের থেকে খুব বেশী পৃথক করা যায় না। ক্লাইভ স্ট্রীটের চিড়িয়াখানায় এসে সেটা ভাল করে বুঝতে পারলাম। অকারণে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের জীবন নিয়ে ছিনি-

মিনি খেলবার এমন প্রশস্ত সুযোগ আর কোথাও নেই। আইন আমাদের বলে দিয়েছে যে আমরা ইচ্ছে করলে এক শ টাকার শেয়ারকে দশ টাকায় টেনে নামাতে পারি। অমন একটা অহেতুক অযাচিত হৃদয়হীন ব্যবস্থার রিহার্সেল আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না। হাজার হাজার লোক পথের ভিখিরি হয়ে যাচ্ছে এক নিমেষের মধ্যে। ইকনমিষ্টরা আমাদের জন্য বই লিখেছেন। তারা বুঝিয়েছেন যে শেয়ার বাজারের speculation ধনকেন্দ্রিক সমাজের অনেক ময়লা আর নোংরা আবর্জ্জনা পাম্প করে বের করে দেয়—ওটার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তারা একটা কথা বোঝাতে পারেন নি যে—মানুষের প্রাণ প্রাচুর্য্যের এই সাংঘাতিক অপচয় না করে আরও কত সুন্দর ভাবে সমাজ দেহ থেকে আবর্জ্জনা-গুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যায়।

সাঁইত্রিশটা ছোট ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে বিষক্রিয়ার সঞ্চার করল, তার কোনও প্রতিকার কেউ করতে পারল না। শুধু একটা অন্ধ আক্রোশ আর অভিশাপ ক্লাইভ স্ট্রাটের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলল।

Bose কোম্পানীর ধরণীবাবু এক ইস্কুলে মাষ্টারী করছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে এক বড় বিলিতী কোম্পানী থেকে মাসে এক টন মোমের কোটা যোগাড় করে দিলেন। চার শ বাহাত্তর টাকা দিয়ে কিনে ধরণীবাবু প্রতি টন মোম প্রায় চার হাজার টাকায় বিক্রী করে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। টাকা হলেই যা হয়, ক্লাইভ স্ট্রীটে এসে তিনি এক আপিস করলেন। নিজে কিছুই করতেন না। করবার দরকারই বা কি? বসে বসে মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা রোজগার। দুই একজন ছেলে ছোক্‌রাকে দিয়ে এটা সেটা কেনা বেচা করাচ্ছিলেন। লাভ বিশেষ কিছুই হচ্ছিল না। লাভ করা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ইস্কুল মাষ্টারের জীবনের চরম আকাঙ্খিত জিনিস বক্তৃতা করা। ধরণীবাবুও আসলে শিক্ষিত বাঙালী ছেলেদের ধরে ধরে বক্তৃতা করতেন। সেইজন্যেই তাঁর আপিস

করা। তাঁর বেশীর ভাগ লেক্‌চারই ছিল ব্যবসা নিয়ে, অর্থাৎ যে বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। Auto Suggestion-এর process-এ ধরণীবাবুর একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তিনি একজন ব্যবসা জগতের বড় সমঝদার এবং তাঁর নির্দ্দেশগুলি নির্ভুল। অবশ্য তাতে কারুরই কিছু আসতো যেতো না। দিনে দু'চার কাপ বিনে পয়সার চা আর গ্রীষ্মে আরামে বসে ফ্যানের হাওয়া তো পাওয়া যায়! মন্দ কি?

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হবে। পূজো প্রায় এসে গেছে। ধরণীবাবু বসে হিসেব করছিলেন—দরিদ্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের কি কি কিনে দেবেন—হঠাৎ খবর এল মাঝারী গোছের নামকরা ব্যাঙ্ক—দি গ্রেট সুবারবান্ ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। স্বপ্নেরও অগোচর। যে ব্যাঙ্কগুলি ফেল পড়বার পড়ে গেছে—এখন যেগুলি আছে, তাদের ফেল পড়বার কোনও সঙ্গত কারণও থাকতে পারে না! এই তো সেদিন ধরণীবাবু ব্যাঙ্কটার ব্যালান্স সীট্ পড়ে শোনাচ্ছিলেন আমাদের সবাইকে; রিজার্ভ ফাণ্ডে যা টাকা আছে, তাতে করে ভয়ের কোন কারণ নেই। গ্রেট সুবারবান্ ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে শুনে ধরণীবাবু একটা বিকট চিৎকার করে উঠলেন,—হায়, হায়, আমার সব গেছে—সুকুমার আমার সব গেছে! সুকুমার ধরণীবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা। ব্যাঙ্কে একলাখ টাকার Fixed deposit ছিল। "সতীন্দ্র, তুমিই আমাকে শেষ পর্যন্ত ডোবালে?" সতীন্দ্র ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং ধরণীবাবুর বাল্য বন্ধু। ধরণীবাবু মুখ থুবড়ে মাটীতে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। সেবার, আর সেবার কেন, আর কোনবারই ধরণীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্ররা পূজোয় নতুন জামাকাপড় পরতে পায় নি।

ধরণীবাবুর এই পরিণতি আমাদের সবাইকে মুষড়ে দিল। আমি অবশ্যি এর চেয়েও করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। ধরণীবাবুর স্ত্রী হয়তো স্বামীর Life Insurance-এর কিছু টাকা পাবেন; কিন্তু এমন বহু বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে,

যারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন—যাদের রাস্তায় দাঁড়ানো ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

যেদিন মীরহাটি ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ফেল পড়ল সেদিন আমি একটা দৃশ্য দেখেছি, যা জীবনে কখনও ভুলব না। ব্যাঙ্কের সামনে প্রায় চারশো লোক দাঁড়িয়ে আছে—সবাই চেক্ কেটে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টাকা তোলবার আশায়। ছ'জন পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে! তার মানে ব্যাঙ্কের আর টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। এক বুড়ো ভদ্রলোক এলেন। বয়েস প্রায় পঁচাত্তর। চোখে কম দেখেন—লাঠি ঠুকে ঠুকে হাওড়ার ব্যাঁটরা থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটে এসেছেন টাকা তুলতে। তিনি Run টান বোঝেন না।

খুব ভীড় দেখে তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ বাবা। এখানে এত ভীড় কিসের? ভদ্রলোক বললেন—ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। বৃদ্ধ কিছুই বুঝতে পারেন না। আর এক ভদ্রলোক ভাল করে বৃদ্ধকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। বৃদ্ধ হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর আর কিছুই নেই। একমাত্র পুত্র বড় খোকা যুদ্ধে মারা যাওয়ায় সরকার বাহাদুর তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তারই সবটা মীরহাটি ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ বললেন—আচ্ছা পাঁচ হাজারের জায়গায় আমাকে তোমরা এক হাজার টাকা দাও—তবুও আমি বছর দুই খেয়ে বাঁচব—আমার তো আর কেউ নেই—ওই একটা ছেলে ছিল—বড় খোকা।

যখন ম্যানেজার বাবু আর বেরিয়ে এলেন না—ব্যাঙ্কের দরজাও আর খুলল না, তখন বৃদ্ধ হঠাৎ লাঠিটা কাঁধে তুলে সৈন্যদের মত pose নিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর চীৎকার করে বলে উঠলেন—বড় খোকা দাঁড়া, আমি আসছি—কুইক মার্চ। সেই পঁচাত্তর বছরের চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ তীরবেগে লাঠি কাঁধে করে বড় খোকার খোঁজে বেরুলেন। একজন গুজরাটী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—উস্‌কা হো গয়া।

আমার চোখ বেয়ে বুঝি ততক্ষণে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে এসেছে। ব্যাঁটরার বৃদ্ধ কিন্তু বেঁচে গেলেন। সমস্ত শোকতাপের ঊর্দ্ধে চলে গিয়ে এখন তিনি মহা আনন্দে থাকবেন। মীরহাটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন এখন যদি তাঁর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েও দেয়, তাতেই বা তাঁর কি এসে যায়? চোখের সামনে দেখতে পেলাম, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সার্কুলারগুলি যেন procession করে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! হায় রে পরাধীন দেশের Reserve Bank!

খবরের কাগজে একদিন দেখলাম এক বিরাট Chamber of Commerce-এর সভাপতি লম্বা বক্তৃতা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চুলচেরা বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি uneconomic trading করে দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান-গুলির পক্ষে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করছিল। তাছাড়া এগুলি ফেল পড়ে দেশের অগণিত জনসাধারণের যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য তিনি এবং তাঁর chamber-এর সভ্যরা অত্যন্ত দুঃখিত। জানি না যেদিন শেষ তিনটে বাঙালী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ফেল পড়ল, সে দিন ক্লাইভ স্ট্রীটের কোন কোনও আপিসে মহা সমারোহে নৃত্যগীত হয়েছিল কি না; তবে একথা জানি, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিতে জমার অঙ্ক এক সপ্তাহের মধ্যে দশগুণ বৃদ্ধি পেল। বড়র মধ্যেও আবার যারা সর্ব্ববৃহৎ, তাদেরই পেট ফুলতে লাগল বেশী, কারণ তখনকার অবস্থায় শুধু বৃহৎ এর উপরও টাকাওয়ালা লোকদের আস্থা ছিল না, কাজেই বৃহত্তমের কাছে যাওয়াই সমীচীন। বৃহৎ আরও বৃহৎ হতে লাগল।

আপিস ফেরতা Venus & Diamond-এ গেলাম। তখন আমাদের যা অবস্থা তাতে করে Venus & Diamond-ই আমাদের একমাত্র ভরসা। সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা এনে খবরের কাগজের বিল মিটিয়ে দিচ্ছিলাম। Dovin Chemical-এর দেবেনদা বউ-এর

অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে খুব ছোট করে কারবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার ওপর চাপ দিতে পারছিলাম না। দেবেনদা যেরকম লোক, তাতে করে চাপ দিলে হয়তো পুরো বাকী টাকাটাই আদায় হয়ে যেত, কিন্তু ভুললে চলবে না যে আমি ও উমা দেবেনদারই সমগোত্রীয়। নিজেদের যা খুসী তাই হোক বিপদগ্রস্থ লোককে বিপর্য্যস্ত করে তুলব এ-শিক্ষা আমাদের নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমাদের এমন অবস্থা, পাছে দেবেনদা কিংবা ডাঃ সেন মনে করেন যে আমরা টাকার তাগাদায় গেছি, আগে থেকেই আমি আর উমা বললাম—ভয় নেই, টাকার জন্যে আসি নি। ভাল করে ব্যবসা করুন, পরে টাকা দেবেন! অথচ আমার ব্যক্তিগত অবস্থা গুরুতর; দু'মাসের হোটেলের টাকা দেওয়া হয় নি। উমার চলে যাচ্ছে কোনওরকম করে। তার কেরোসিন তেলের দোকান থেকে কিছু আসছে—আর তা ছাড়া একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাবা কাকারা সবাই রয়েছেন। কিন্তু তবুও দেবেনদা আর বিনয় সেনের দাদার কাছে টাকা চাই কি করে?

ডাঃ নারুর কাছে হাজার দুই টাকা পাওনা আছে আর তাছাড়া সেই লোকঠকানোর প্রশ্নটাও তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে! এই দু'মাসে অনেক ঠকাঠকি দেখলাম। সাধারণ ভাবে হয়তো ডাঃ নারুর ব্যাপারটা অনেক কম গোলমেলে, কিন্তু তবুও তার নিজের মুখ থেকে ব্যাপারটা না শোনা পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। বিকেলের দিকে সেদিন ডাক্তারের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

—নমস্কার ডাক্তার সাহেব, গম্ভীর গলায় বললাম।

—আসুন বাবুজী, বলেই ডাঃ নারু মুচকি হাসলেন।

আমার মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। লোকটাকে দেখেই আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে।

ডাঃ নারু বললেন, সবই তো জানতে পেরেছেন—বহুৎ সরম কা বাৎ সন্দেহ নেই।

আমি চুপ করে মহম্মদ সৈফুদ্দীনকে দেখছিলাম। সত্যিই কি লোকটা খুব খারাপ?

—বাবুজী আমার দোষ কি বলুন তো? আপনাদের কলকাতা শহরে পঞ্চাশ লাখ লোক আছে। এর মধ্যে ক'লাখ বুদ্ধু আছে জানেন কি?

—উনপঞ্চাশ লাখই বুদ্ধু, আমি বললাম।

সৈফুদ্দীন বললেন, রাগের কথা না বাবুজী। পঞ্চাশ লাখ লোকের মধ্যে কম করেও দশ লাখ বুদ্ধু আছে। আমি তাদের মধ্যে থেকে মাত্র হাজার পাঁচেক লোকের সঙ্গে ব্যবসা করছি।

আমার সত্যিই কিছু বলবার ছিল না। ক্লাইভ স্ট্রীটে বসে যারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে ঠাণ্ডা মাথায় রোজ ঠকাচ্ছে, তাদের তুলনায় মহম্মদ সৈফুদ্দীনের পাপের ভাগ অনেক কম। কিন্তু তবুও আমি জিনিসটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। এটা আমাদের বর্তমান সভ্যতার একটা বিশেষ দিক। যে জিনিস সহজ সরল ভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয় তাকে আমরা অত্যন্ত crude বলে ভাবি—দেখে ঘৃণায় নাক সিঁটকাই, তার কোনও মূল্য দিতে চাই না; কিন্তু যে জিনিস বহু ছলনার পথ বেয়ে আসে, যার স্বরূপ ধরতে পারি না—তার দাম দিতে চাই বেশী। যে জিনিস যত আঁকানো বাঁকানো পথ দিয়ে আসে, আর সেই পথ দিয়ে আসতে আসতে যত অশিষ্টতার ছাপ লাগিয়ে আসতে পারে আমাদের কাছে সেই জিনিসটাই তত সুন্দর এবং মূল্যবান। শত হ'লেও মহম্মদ সৈফুদ্দীনের মানুষ ঠকানোর ব্যবসাটা অনেক সহজ ও সরল—তা Economics-এর theory পুষ্ট হয়ে আসে নি; এসেছে হয়তো নিতান্তই জীবন সংগ্রামে বাঁচবার তাগিদ থেকে। কে ভাল? কিশোরীমল সুরজমল না ডাঃ নারু ওরফে মহম্মদ সৈফুদ্দীন?

—যাই বলুন, আপনার এ-ব্যবসাটা ভাল নয়—আপনি বরং অন্য ব্যবসা করুন, আমি ডাঃ নারুকে বললাম।

—ভাল ব্যবসা একটা বাতিয়ে দিন—মনে রাখবেন, আমি লেখা-পড়া কিছুই জানি না।

—এছাড়া কি আর আপনি ব্যবসা পেলেন না? আমার গলার স্বরে রাগের ভাব প্রকাশ পেল।

তখন মহম্মদ সৈফুদ্দীন ওরফে, ডাঃ নারু আমাকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সুদীর্ঘতর কাহিনী বলা শুরু করলেন—

"১৯১৬ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে পল্টনে নাম লেখালাম। তখন আমার বয়েস খুবই কম। বাবা মা বেঁচে ছিলেন না। ১৯১৯ সালে লড়াই থেকে ফিরে এসে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টে হাবিলদার হয়ে ঢুকলাম। আমার বয়েস যখন ২৬ বছর, তখন আমার চাচাতো বোন হানিফাকে সাদি করলাম। হানিফাকে ছোটবেলা থেকেই আমি খুব ভালবাসতাম। চাকরী করতে করতে ১৯৩২ সালে চাকরী থেকে বরখাস্ত হলাম। তারও একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে এমন সময়ে আমাদের রেজিমেণ্টকে ব্রিটীশ সরকার বাহাদুর বারদৌলীতে যাবার আদেশ দিয়েছে। একদিন দুপুর তিনটের সময় রেজিমেণ্টের ওপর অর্ডার হল সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি চার্জ করবার। আমি, বাহাদুর সিং আর এমদাদ আলী লাঠি চার্জ করতে অস্বীকার করলাম। তিন হাবিলদারেরই চাকরী গেল—আমার আর এমদাদ আলীর দু'বছর করে জেল হল। দু'বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, আমার দেশের সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে; ঘরদোর কিছুই নেই। আমার সুন্দরী স্ত্রীকে পরগণার জমিদার ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে সাদি করেছে—আর আমার দু'টি ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—ভিক্ষুকের বাচ্চারা সব! এ-বাড়ি ও-বাড়ি চেয়ে চিন্তে দুমুঠো মিলছে। বাবুজী, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে তখন শুধু একটা প্রশ্ন—হানিফা কি ইচ্ছে করেই গেছে, না তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে? কি আর করি বলুন? বছর ছয়েক একটা মহাজনের গদীতে কাজ করলাম।

ছেলেপিলেদের মানুষ করতে লাগলাম, কিন্তু হানিফাকে ভুলতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম, হয় আমার গুলবদনীকে আমি ফিরে পাব, না হয় আমার জান্ কোরবাণী করব—এর মাঝখানে কোন রাস্তা নেই।

তারপর ১৯৩৮ সালে একটা মোকা মিলে গেল—লাহোরের রাস্তা দিয়ে সন্ধেবেলা যাচ্ছি, দেখি একটা চক্চকে নতুন গাড়িতে করে হানিফা যাচ্ছে—পাশে বসে আমার পরগণার জায়গীর সাহেব। আমার রক্ত তখন মাথায় চেপে গেছে—আমি লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'হানিফা'—বলে বাঘের মত চেঁচিয়ে উঠতেই জায়গীর সাহেবের রিভলবার আমার বুকে এসে ঠেক্‌ল।

'বান্দা কা বাচ্চা—তুমি এখন খাপসুরত জেনানার হেফাজত চাইছ!' আমি জায়গীর সাহেবের কথায় উত্তর দিলাম না। শুধু হানিফার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি আমাকে বরবাদ করে দিলে হানিফা'—

হানিফা কথা বলল না—ড্রাইভারকে আদেশ দিল জোরে গাড়ি চালাতে।

সেইদিন থেকে আমি ঠিক করেছি, আমি জায়গীরদারের চেয়েও অনেক বেশী টাকা কামাব—ওর একখানা গাড়ি আছে, আমি কিনব তিনখানা—তারপর দেখি হানিফা ফিরে আসে কিনা। তাই আমার এই ব্যবসা শুরু। এর আগে সারা হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়িয়েছি, টাকা রোজগারের ফিকিরে। কোথাও সুবিধে করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত এই কলকাতা শহরে আমার মোকা মিলেছে—ভারী আচ্ছা শহর তোমাদের এই কলকাতা।"

আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন—এখন আর কি হবে হানিফা বিবিকে দিয়ে? যা হবার তা হয়ে গেছে—এখন ছেলেরাও বড় হয়ে গেছে। চুপ্‌চাপ্ করে থাকুন না?

সৈফুদ্দীন সাহেব গর্জে উঠলেন, পুরুষ মানুষের কখনও বয়েস হয়, না প্রতিশোধের কোনও সময় দেয়া থাকে?

আমি শেরকা বাচ্চা—কবরে যাবার আগের দিন পর্যন্ত চেষ্টা করব হানিফাকে ফিরিয়ে আনতে, যদি না পারি, তা হলে জিন্দগী কবুল করব।

—কিন্তু সাহেব, হানিফা তোমাকে কি এখনও ভালবাসে?

মহম্মদ সৈফুদ্দীন মুচকি হাসলেন, বাবুজী মহব্বত কখনও করেছ? জীবনে একবারের বেশী মহব্বত হয় না। হানিফা আমাকে জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসত। তবে কি জানো? জায়গীরদারের টাকা ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমারও টাকা চাই। যেমন করে হোক্। হানিফাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসি, তারপর আমি এ-ব্যবসা ছেড়ে দেব—তোমাকে কথা দিচ্ছি।

বিলের বাকী টাকা নিয়ে ফেরবার পথে ভাবছিলাম, মহম্মদ সৈফুদ্দীন ওরফে ডাঃ নারুকে ক্ষমা করব কি করব না। যেন আমার মতামতের ওপর সারা দুনিয়ার ইষ্ট অনিষ্ট নির্ভর করছে। কিন্তু খুব বেশী দিন সৈফুদ্দীন আমাকে এ প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দিলেন না। সে কথায় আসছি পরে।

এবার শুরু হ'লো সেই রাম রাবণের যুদ্ধ, যা ভারতের ইতিহাসের এক চূড়ান্ত কলঙ্কময় অধ্যায়। মানুষ মানুষকে যে এমন ঘৃণা করে, তা আগে কেউ জানত না। যারা এ-যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তারা নিজেরাও বোধ হয় জানত না যে প্রয়োজন বোধে তারা এমন করে নিজেদের দাঁত নখ কাজে লাগাতে পারবে। তবে তারা ইতিহাসের একটা বড় সত্যকে রূপদান করল—যে সত্য আমরা চোখ বুঁজে এড়িয়ে চলতে ভালবাসতাম। সে সত্যটা হচ্ছে এই যে যুগে যুগে ধর্ম জিনিসটা মানুষের অন্তরের রূপ কখনও বদলাতে পারে নি। ধর্মের বাইরের যে জিনিসটা মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে এসেছে, সেটা নিতান্তই তার মামুলী রূপ; যতবারই সেই বাইরের রূপের সাথে ভেতরকার রূপের দ্বন্দ্ব

হয়েছে, ততবারই প্রমাণ হয়েছে যে আসলে ধর্ম মানুষের হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করতে পারে নি। যেটুকু প্রবেশ করেছে, সেটা ভীতি—অন্তর আলোকিত করবার কোনও মাঙ্গলিক নয়।

১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট যাঁরা কলকাতায় ছিলেন তাঁরা ধর্মের আসল রূপ দেখতে পেয়েছেন। গীতা, ভাগবৎ, রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ সব আমরা পড়েছি। আর শুধু পড়ি নি, তাদের সব অমৃত বাণীগুলি আমাদের হৃদয়ে গেঁথে রাখবার জন্য চাঁদা তুলে পাড়ায় পাড়ায় মঠ ও মসজিদ তৈরি করেছি—চাঁদা আমরা যা না দিয়েছি, বড় বড় ধনীরা দিয়েছে তার সহস্র গুণ; এই একটা ব্যাপারে তাদের দান-ধ্যানের শেষ নেই। তারা যেন আমাদের চরিত্র সংশোধন করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা নিজেরা এ-সবের ঊর্দ্ধে—উচ্চস্তরের মানুষ। ধর্ম তাদের হাতের মুঠোয়—তারা ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে—ধর্মকে পরিচালনা করতে পারে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট যে আসবে, তা ক্লাইভ স্ট্রীটের বড় কর্তারা জানত। কিন্তু তারও আগে, তারা জানতো যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আসবে। ১৯৪৭ সালের যে কোনও একটা তারিখে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংরেজদের চলে যেতে হবে, একথা ইংরেজ বণিকরা জানত। একবছর পরে যা আসবে, যা হবে, অর্থাৎ ভবিতব্যকে প্রতিরোধ করবার একটা বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা যে হবে, তা কিন্তু আমরাও বুঝতে পারছিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সারা পৃথিবীতে যে নিদারুণ পরিবর্তন এল, ভারতবর্ষ, বার্মা আরও দুই একটা ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুক্তি তারই প্রকাশ মাত্র। যুদ্ধে যে বিরাট ক্ষতি হয়েছিল, তাকে সামলে ওঠা একা ইংরেজ জাতির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য ইংরেজকে তখন অন্য জাতের কাছে হাত পাততে হচ্ছে—দাও বাবা কিছু, খেয়ে বাঁচি। যাদের কাছে হাত পাততে হল, তাদের বহুদিনকার পুরানো ঈর্ষা রয়েছে—অমন সুন্দর নধর দেশগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে ইংরাজরা চিবিয়ে খেয়েছে!

ধার কর্জ্জ তো দিতে পারি—কিন্তু তোমাদের নামে বড় বদনাম—তোমরা ভারতবর্ষের মত অমন বনেদী একটা দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছ। যারা এ কথা বলল, তারা ভারতবাসীদের ভালবাসে না—তাদের শুধু এ দেশের কাঁচা হাড় চিবিয়ে খাবার একটা উদগ্র লালসা। Imperial Preference যদি না থাকে—তো কিছু মালপত্র বেচতে পারি—দেশের লোককে প্রতারণা করে যে উদ্বৃত্ত দ্রব্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছি, তার কিছুটা ভারতবর্ষে রপ্তানী করতে পারি।

ইংরেজ কাবু হয়ে আসতে লাগল। পৃথিবীর উপর দিয়ে যে নিদারুণ ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তাতে করে দুনিয়ায় সমস্ত মানুষের মনেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিন-চার বছর ধরে হিটলার সাহেব সারা ইউরোপে যে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, তার ফলে সারা পৃথিবীর দেশের লোকদের জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হিট্‌লার চক্রের সেই দানবীয় প্রেমের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সারা বিশ্বের লোক স্বাধীনতার অর্থ শতগুণ ভাল করে বুঝতে পারল। মার খেয়ে মারের প্রতি ঘৃণা জন্মাল,—স্বাধীনতা হারিয়ে স্বাধীনতার প্রতি মূল্যবোধ বাড়ল। চতুর্দ্দিকে রব উঠল—'পরাধীনতা' কথাটা রাজনৈতিক Dictionary থেকে তুলে দাও। পৃথিবীর সব মানুষ স্বাধীন।

বিয়াল্লিশ সালের বিদ্রোহের কথাও ইংরেজরা ভোলে নি। আবার যদি ঐ রকম একটা কিছু ঘটে তাহলে, পাড়াপড়শীর সাহায্যের কথা তো বাদই দিলাম, নিজের দেশের লোকদেরও ডেকে পাওয়া যাবে না। অতএব আসুক উনিশশো সাতচল্লিশ সাল—যা অবশ্যম্ভাবী, তা ঘটতে দাও!

কিন্তু সে কেমন করে আসবে? বহু প্রতীক্ষিতা প্রিয়ার মত, না অজানা অচেনা গুপ্ত ঘাতকের মত? বিলেতের কর্তারা এখানকার কর্তাদের পরামর্শ চাইলেন। এঁরা বললেন,—বাঃ ভারতের স্বাধীনতার ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইন তো বহু বছর আগেই সৃষ্টি

করে রাখা হয়েছে—তাকে জাগিয়ে দাও। বলা যায় না '৪৭ সাল '৫৭ সালে গিয়েও ঠেকতে পারে।—যদি তদ্দিন পিছিয়ে দেওয়া নাও যায়, তাহলেও চিরকাল ভারতবর্ষের লোকদের মনে থাকবে, ইংরেজ রাজত্ব এমন কিছু খারাপ ছিল না।

তাই ষড়যন্ত্র শুরু হল।—এইবার ডাঃ নারুর Theory-তে আসতে হয়; কলকাতায় বুদ্ধু কতজন আছে? বুদ্ধুদের সুড়সুড়ি দিতে হলে, সবচেয়ে অবাস্তব জিনিসকে নাড়া দেওয়াই বিজ্ঞের কাজ—সেটি হচ্ছে মখমলের বাক্সে ঢাকা সেই ধর্মের ভূত। তাকে একবার লেলিয়ে দাও, পেশোয়ার থেকে মাদ্রাজ, আর সিন্ধু থেকে আসাম, সব জায়গায় ভূমিকম্প শুরু হবে।

তাই, ধর্মের ভূতকেই ছেড়ে দেওয়া হলো। এক ধর্ম আর এক ধর্মকে টুঁটি চেপে ধরে হত্যা করতে লাগল। আশ্চর্য! সব ধর্মেরই কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান! কিন্তু তাঁরও কি বিন্দুমাত্র সন্তান-প্রীতি নেই—অমন করে মারপিট করে সবাই মরছে, একটু থামিয়ে দেবার নামটি পর্যন্ত নেই!

সেদিন দুপুরের দিকে চীনাবাজার আর কলুটোলার মোড়ে একটি মৃতদেহ উবু হয়ে পড়ে মাতা ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গোপনে কথা কইছিল। দু'দিন মরে পড়ে আছে—তাই ব্রহ্মা বরুণকে বললেন—ওর মুখে একটু জল দিয়ে এস তো? বরুণ চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন—শুধু ঐ লোকটিই কেন, আরও বহুলোক শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে এক ফোঁটা জল চেয়ে পায় নি। দাও ওদের জল দাও!—তৃষ্ণার্ত জীবনের শেষ দিনে ওদের একটুখানি জল পান করতে দাও! তাই জীবনদায়িনী বর্ষা নামল। চীনা-বাজারের মৃতদেহটার পৃথিবীর সঙ্গে কথা কওয়া হয়তো বা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই—হঠাৎ বর্ষার অনুরাগ মিশ্রিত আহ্বানে তার উবু হয়ে যাওয়া দেহটা চিৎ হলো—তারপর শুরু হলো তার জল পান—হাঁ করে প্রাণ ভরে আকণ্ঠ জল পান।

আমি সামনেই একটা দোকানে দাঁড়িয়ে sleeping suit পরা

বলিষ্ঠ মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে আছি—হঠাৎ দেখলাম তার ওপরের পকেট থেকে একটা নীল খামের খানিকটা বেরিয়ে আছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামনে গিয়ে তার পকেট থেকে খামখানা বের করে আনলাম। খুব কাছে কেউ ছিল না—তা না হলে মৃতদেহের পকেট মারার অপরাধে অভিযুক্ত হতাম। আমাদের যা culture-এর বহর, তাতে করে একটা জীবন্ত মানুষকে ঠেঙিয়ে হত্যা করলে ধর্মের সিঁড়িতে বেশ কয়েক ধাপ বেয়ে ওঠা যায়, কিন্তু খবরদার, যে মরে গেছে তার গায়ে হাত দেবে না—ধর্মস্খলন হবে! খামখানার ওপরের লেখা জলে ধুয়ে মুছে গেছে। কিছু বোঝা গেল না। ভেতর থেকে একখানা আধময়লা কাগজ বেরিয়ে এল। তার মধ্যে লেখা রয়েছে—

বেলেণ্ডা
বর্দ্ধমান

'বাবা,

আজ তিন-চার দিন তুমি কলকাতায় গেছ—তোমার চিঠি পাই নি। শীগ্‌গীর চলে আসবে। আসবার আগে আমার জন্যে একটা কলের মোটর গাড়ি নিয়ে আসবে।'

অনেকটা লেখা পড়তে পারলাম না। বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু তলায় একটা ছোট্ট নাম তখনও বোঝা যাচ্ছিল—'খোকন'।

হায়রে খোকন, তোমার মত বহু হিন্দু আর মুসলমান পুত্র পিতৃহারা হয়েছে। তুমি আর কলের মোটর পেলে না। গতকাল বিকেলে তোমার পিতাকে অকারণে হত্যা করা হয়েছে—আজ সকালের যে প্রথম বাতাস তোমার মুখকে চুম্বন করেছে, সে কি তোমায় বলে নি যে তোমার পিতা সভ্যতার মধ্যমণি বিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের চীনাবাজারের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে? তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি বাঁচবে—তোমাকে বাঁচতে হবে—জীবন মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশী সত্য আর প্রখর। কিন্তু বড় হয়ে

তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে, তোমার বাবার এই অকারণ মৃত্যুর কারণ কি ?

ক্লাইভ স্ট্রীটে সলা পরামর্শ চলেছে—কি করে মৃত্যুর এই হোলি-খেলাকে আরও বেশ কিছুদিন চালানো যায় ! ইংরেজ সরকারের চরণ-রেণু ধন্য হয়ে যারা কলকাতা আর বাংলাদেশে রাজত্ব চালাচ্ছিল, তাদের ওপর আদেশ এল, যদি ফয়দা কিছু করতে চাও, তো খুনের পিচ্‌কিরী নিয়ে বেরিয়ে পড় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ; যেখানে মানুষ এখনও নিশ্চিন্তে শান্তিতে বাস করছে। কলকাতায় যা রং-খেলা হয়েছে, তার ছোপ এখনও অনেক কাল থাকবে। আর তা ছাড়া ধর্মের চেয়েও প্রভাবশালী জিনিস এই শহরে আছে। সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড লোভ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ডামাডোলে ক্লাইভ স্ট্রীটের অনেকেই বেশ কিছু কামিয়ে নিচ্ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পকেটে কিছু আসতে থাকবে, ততক্ষণ তারা নিজেদের স্বার্থে মৃত্যুর নেশাকে জাগিয়ে রাখবে। ধর্মের প্রয়োজন ছিল প্রথম আঘাত হানবার সময়ে, যখন কলকাতার মানুষকে স্বখাত সলিলে ডোবানোর আহ্বান সোজাসুজিভাবে দেওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এখন মঠ মসজিদের চেয়েও অনেক কর্মতৎপর মৃত্যুগুহা আছে—সেগুলি হচ্ছে ক্লাইভ স্ট্রীটের বড় বড় আপিসের ঠাণ্ডা ঘরগুলি। চলতে থাকুক না এই খেলা—যদ্দিন চলে, মন্দ কি ?

বেশ কয়েকদিন পরে আপিসে যেতে পারলাম। গিয়ে দেখি কর্মমুখর ক্লাইভ স্ট্রীট ফাঁকা। সারা রাস্তায় চীনেমাটি আর কাচের বাসনের ভাঙ্গা টুকরো ছড়িয়ে আছে। ক্লাইভ স্ট্রীটের দারোয়ানরা মুর্গী-হাটার অনেক দোকান লুঠ করেছে। তা করবেই তো—মুসলমানরা মল্লিকবাজারের রেখেছে কিছু ? জানবাজারের অবস্থা তথৈবচ। খবর রাখে কি কেউ, পার্ক সার্কাসে একজন হিন্দুও বেঁচে নেই। যদি তাই হয়, বেলেঘাটায় একজন মুসলমানও বেঁচে থাকবে কেন ? সুন্দর প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। যদিও বা দু'দলের লোক

পাড়ায় পাড়ায় শান্তি আনবার চেষ্টা করছিল—অলৌকিক প্রচারের মাহাত্ম্যে তা ব্যাহত হতে লাগল বার বার। আবার ডাঃ নারুর কথা মনে পড়ে—পঞ্চাশ লাখ আদমীর মধ্যে বুদ্ধু আছে ক'জন? ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসের কলকাতায় সবাই কেমন যেন বুদ্ধু বনে গিয়েছিল। ষাট বছর বয়সের প্রবীণ অধ্যাপক রাখালদাস বসুকে একদিন দেখি একখানা হকি ষ্টীক নিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পুরোভাগে আছে লাট্টু-পাড়ার বীরপুরুষেরা। সত্যিই বীরপুরুষ—না হলে থুড়থুড়ে বুড়ো এক ধুনুরীকে মৃত্যুফাঁদে ফেলে পঞ্চাশ জন যুবকের সে কি উদ্দাম নৃত্য! কতক্ষণে তাকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হবে! অধ্যাপক রাখালদাস বসু সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন। মাঝে মাঝে পৈশাচিক উল্লাস। খোলার বস্তির ঘরটাতে আগুন দেওয়া হলো—তারপর বৃদ্ধ ধুনুরী বেরিয়ে আসতেই ছাব্বিশ জন মিলে তার মাথায় আঘাত হানলো!

বড়বাজার আর ক্লাইভ স্ট্রীটে বজরঙ্গ সমিতি স্থাপিত হয়েছে। পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠেছে—হিন্দুর সম্পত্তি বাঁচাতে হবে। বলা যায় না, যে কোনও সময়ে কলুটোলা আর চিৎপুর দিয়ে ইসলামের পয়গম্বররা ঢুকে পড়ে গড্‌রেজের সিন্দুকগুলি লুট করে নিয়ে যেতে পারে। দু'হাজার ভলান্টিয়ার তোলা হলো—সর্বক্ষণের কর্মী! তাদের কাছে অস্ত্রের অভাব নেই। তরোয়াল, লাঠি, ছোরা তো এখন মামুলী অস্ত্র। এমন কি রিভলবার, রাইফেল, দোনলা বন্দুকও বড্ড সেকেলে। যুদ্ধোত্তর কলকাতায় এসব অস্ত্র মূল্যহীন, বড্ড বেমানান। ডজন ডজন sten gun যোগাড় হয়ে গেছে। যে রকম সাংঘাতিক সংকট, তাতে বোধ করি machine gun হলেই হত ভাল—নিদেন পক্ষে sten gun হলেও চলবে। ভলান্টিয়াররা মহাপ্রাণ ব্যক্তি সব। কারুর কারুর পকেটমারা এমন কি মানুষ মারারও রেকর্ড রয়েছে! থানার পুলিশ অফিসাররা সবাই এদের চেনে। কিন্তু তা বললে কি

হবে! আজকের এই সঙ্কটে এরাই তো আমাদের মুক্তিদাতা! দিক না এসে কাঁধে হাত? আমার আপনার মেয়েবোনকে দেখে দাঁত বার করে হাসুক না কেন? প্রয়োজন হলে আমাদের বাঁচাবে তো?

কলুটোলা আর চীৎপুরে মুসলিম গার্ডরা রয়েছে। ইসলাম ধর্মের ধ্বজাবাহক; চোর পকেটমার আর গাঁটকাটাদের রাজত্ব। কিন্তু তবুও ওরা ভাল; কাফেররা যে কোন সময়ে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে এসে চীৎপুর-কলুটোলাতে ঢুকে পরে মুসলমানদের সর্বনাশ করতে পারে। অবিশ্যি ব্যাপারটা অত সোজা নয়—পাঠান পুলিশ ছাড়া হয়েছে অনেক। যতক্ষণ তারা আছে, ততক্ষণ কোন ভয় নেই। কিন্তু তবুও হিন্দুদের কথা বলা যায় না—ওরা ভারী চালাক আর কায়দাবাজ! কবেই বা ওদের সঙ্গে বুঝিতে পারা গেছে!

আর তা ছাড়াও কথা আছে—ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ করে দুভাগে ভাগ করে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু তাব জন্য অবস্থা সৃষ্টি করে রাখতে হবে। যুদ্ধ না চললে, সন্ধির প্রশ্ন আসে না। যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কলুটোলার chamber of commerceএর সভায় আলোচনা হলো—আমাদের যদি মানুষের মত বাঁচতে হয়, তা হলে দেশ বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই—আমরা এমন এক স্বর্গরাজ্য চাই, যেখানে শুধু আমরাই থাকব, রাজত্ব করব, যেখানে কোটি কোটি মানুষের উপর আমাদের অবাধ কর্তৃত্ব থাকবে। আমাদের কলকাতার অর্দ্ধেকটাও চাই। প্রবীণ মুসলমান নেতা মামুদ সাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—কলকাতা বাংলার প্রাণকেন্দ্র—এখানকাব কলকারখানায় হাজার হাজার মুসলমান শ্রমিক কাজ করছে—আমাদের বড় কর্তারা যা বলেছেন, তাই ঠিক,—অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্দ্ধেকটা আমরা চাই। আর তাই বললেই শেষ হবে না—কলকাতার অর্দ্ধেকটাও আমাদের চাই। করাচীর ধনী

ব্যবসায়ী তোরাবুদ্দীন সাহেব সভার সভাপতিত্ব করছিলেন। সর্ব-শেষে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমরা দেশ বিভাগ করতে চাই, একথা শুনে হিন্দু ভাইদের উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। মুসলমানদের শিক্ষা, দীক্ষা, তমুদ্দুন আলাদা—তাদেরকে বাঁচতে হলে একটা আলাদা রাজত্বের প্রয়োজন আছে। সব চেয়ে অবশ্যি ভাল হয় যদি দুটো দেশই সম্পূর্ণভাবে মাইনরিটি মুক্ত হয়। সমস্ত সমস্যাটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে—আশা করি আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা আমাদের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

তোরাবুদ্দীন সাহেবও দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। বক্তৃতা করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মনে হচ্ছিল, সেই শস্যশ্যামলা পূর্ববঙ্গের কথা, যেখানে সোনার শস্য পাট জন্মায়! স্বপ্ন দেখছিলেন নারায়ণ-গঞ্জের কাছাকাছি তিনি যেন একটা পাটকল খুলেছেন—বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রী! কেউ তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে না! অন্তত বিঠল-দাস বিলমোরিয়া আর ফুকনমল গম্ভীরলাল তো থাকবে না? তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন—চাঁটগায়ের বন্দরে বড় বড় বিদেশী জাহাজ এসে নোঙর করেছে! ওরই একটা জাহাজে তাঁর হাজার গাঁট পাট উঠেছে! এ-স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে যায়! তাই হিন্দু ভাইদের কাছে যুক্তির আবেদনই সবচেয়ে ভাল, মিছে মারামারি ঝকাঝকি করে লাভ নেই। যদি দেশবিভাগ ভেস্তে যায়!

ওদিকে গগনপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তদ্দিনে বাংলার বাঘ আখ্যা পেয়ে গেছেন। সারা জীবন তিনি ইংরেজদের ভজনা করেছেন, আর প্রয়োজন বোধে সাহেবদের বলে কয়ে দু-একটা গরম বুলি ছেড়েছেন। এবারও ক্লাইভ স্ট্রীটের সাহেবরা তাঁকে ডেকে বলল—গগনপ্রসাদ তুমি করছ কি? তোমার দেশ যে বিভক্ত করবার আওয়াজ তোলা হয়েছে! এখনও সময় আছে—ময়দানে নেমে পড়।

গগনপ্রসাদ বেরিয়ে পড়লেন দেশে দেশে। থেকে থেকে তিনি এমন এক একটা হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন, যাতে করে

কলুটোলার chamber of commerce-এর সভ্যদের হৃৎকম্প উপস্থিত হতে লাগল।

বিলেতের কাগজগুলিতে তোরাবুদ্দীন আর গগনপ্রসাদ দুজনারই বক্তৃতা বেরুতে লাগল। —অসম্ভব। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ভারতবাসীরা স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। যদ্দিন ওদের নিজেদের গৃহবিবাদ বন্ধ না হয়, তদ্দিন এ-ব্যাপারে কথা বলা চলে না।

মাস দুই দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটল। ব্যবসা বাণিজ্য সবই বন্ধ। কলকাতার লোকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। দেবেনদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। পৃথ্বীশ, আমার বেলেঘাটার কারখানাটা লুঠ হয়ে গেছে। জানো তো ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে কোনও রকম করে কারবারটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আর আমার কোনও পথ নেই। পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর আমার কোন গত্যন্তর নেই। তোমাকে সত্যি কথা বলছি—সাতদিন পর থেকে আমি সপরিবার না খেয়ে থাকব। বলতে পার, মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ আছে কিনা ?

আমি বললাম, দেবেনদা, আপনি লেখাপড়া জানেন, যাই হোক করে চালিয়ে নিতে পারবেন—নিদেন পক্ষে একটা চাকরি-বাকরী ? অথবা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ওকালতি ! দেবেনদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। মনে মনে আমি ভাবলাম—এইবার মায়াবিনী ক্লাইভ স্ট্রীট দেবেনদার জন্যে একটা রাজকীয় exit এর ব্যবস্থা করেছে। যে পথ দিয়ে তিনি পাঁচ বছর আগে এসেছিলেন, সেই পথ দিয়ে নিঃশব্দে তাঁকে আজ বেরিয়ে যেতে হবে। এত বছর ধরে যাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তারা একবারও খোঁজ খবর নেবে না। দেবেনদা এখন ভুলে যাওয়া একটা সংখ্যা মাত্র। ক্লাইভ স্ট্রীটে যে অসংখ্য অদৃশ্য score board

আছে তার একটার ভেতর থেকে অদৃশ্য লেখক দেবেনদার নামটি পরিষ্কার করে মুছে দেবে। তিনি যে এখানে কখনও ছিলেন, তাও আর কেউ জানতে পারবে না।

এর মধ্যে একদিন ডাঃ সেনের ভাই বিনয় সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। —কেমন আছেন, ভালো তো? জিজ্ঞাসা করলাম। বিনয় সেনের মুখে কথা নেই। দু'মিনিট চুপ করে থেকে বললেন—চীৎপুরের গুদোমে হাজার পাঁচেক টাকার chemicals ছিল—সব গেছে।

বুঝতে পারলাম ডাঃ সেনের শেষ চেষ্টাটাও মাঠে মারা গেল। দেবেনদা গেলেন, ডাঃ সেন গেলেন, আরও দু'একটা ছোট খাট Client যা ছিল, তারাও প্রায় যাই যাই করছে। আর এই সুযোগে যারা যায় নি, তারাও যাবার ভান করতে লাগল। যাদের ভান করা মানায় না, তারা লম্বা মুখ করে দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে পাওনা টাকা কি করে দুদিন পরে দেওয়া যায়, তার সুযোগ খুঁজতে লাগল। অর্থাৎ যে মরেছে, তাকে আরও যদি মারতে পার তো তাতে কোনও দোষ নেই। কাপুরুষতা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অবিশ্যি একে জাহির করবার মধ্যে বাহাদুরি আছে। যে যত সুন্দর করে ক্লীবত্ব প্রকাশ করতে পারবে সেই তত বড় বাহাদুর।

সেদিন হঠাৎ কিশোরীমল সুরজমলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। দেখলাম, ভদ্রলোক এই দাঙ্গার বাজারে বেশ যেন একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন। আমাকে দেখেই বললেন, আরে বাবুজি ভাল আছেন তো? যা দেশের অবস্থা তাতে কে যে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে, তার ঠিক নেই।

—আপনি তো ভালই আছেন—দেখে যদ্দুর মনে হয়।

—হনুমানজীর কৃপায় মন্দ নেই।

—ব্যবসা বাণিজ্যের খবর কি?

—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

আমি শুধু অবাকই হলাম না, আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। বললাম, সে কি কিশোরীবাবু! সবাই যে বলছে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ?

—আপনি লেখাপড়া জানা লোক; ব্যবসায়ীদের কথা বুঝতে পারেন না। এই বাজারে বেশ দু'পয়সা কামাবার মোকা মিলেছে।

—আপনার দু-একটা মোকার গল্প বলুন শুনি।

—বাবুজী, আমি বিশ হাজার মণ ডাল ধরে রেখেছিলাম। গত একমাসে আপনাদের মা বাবার কৃপায় প্রতি মণে আট টাকা মুনাফা করেছি। এখন আলু রেখেছি পাঁচ হাজার বস্তা—ওতেও কিছু আসবে। আর তাছাড়া দু'পয়সা কম দামে আমার মাল কেনবার সুবিধা আছে।

—তার মানে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—বাবুজী আপনি কি জানেন না, আমি বজরঙ্গ সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট?

আমি বললাম, তাতে মাল সস্তায় কেনেন কি করে?

সুরজমল হো হো করে হেসে উঠলেন। —বজরঙ্গ সমিতির ভলান্টিয়ারদের ভয় পায় না, ক্লাইভ স্ট্রীট আর বড়বাজারে এমন আড়তদার খুব কমই আছে। আমার মাল চাই জানতে পেলে; যে কোনও আড়তদার দু-টাকা কম দামে আমাকে মাল পাঠিয়ে দিচ্ছে—দাম যখন খুসী তখন দিলেই হয়।

—বেশ আছেন আপনারা, আমি বললাম।

—বাবুজী আমি তো কিছুই কামাতে পারলাম না—কামিয়ে নিল লক্ষ্মীপ্রসাদ আগরওয়ালা, আমাদের প্রেসিডেণ্ট সাহেব। বহুৎ আফসোস হয়।

—সে বুঝি আরও কম দামে মাল কিনতে পারে?

—ওর মাল কিনতে একটা পয়সাও লাগছে না।

—বুঝতে পারছি না, সুরজমলজী, একটু বুঝিয়ে বলুন।

—লক্ষ্মীপ্রসাদ হচ্ছে একজন আড়তদার। পশ্চিম থেকে মহাজনরা ডাল, গম, সরষে আর তিসি ওর আড়তে পাঠায়। ও সেগুলো বেচে যার যার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেয়। একশো টাকায় ছ'পয়সা কমিশন পায়। এই দাঙ্গার সুযোগে ও আর মহাজনদের টাকা দিচ্ছে না—সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে মাল সব লুঠ হয়ে গেছে। বাবুজী, আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না—এই একমাসে লক্ষ্মীপ্রসাদ কম করেও চার লাখ টাকা কামিয়ে নিয়েছে। আফসোস কা বাৎ, আমাদের হাতে অন্যের মাল ছিল না।

—পশ্চিমের মহাজনরা যদি এখানে এসে সব কিছু নিজেরা দেখে যাচাই করে নেয়, তাহলে?

—ওরা কখনও আসবে না বাবুজী—লক্ষ্মীপ্রসাদ ওদের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, হাওড়া ষ্টেশনে যে সব গাড়ি আসছে, তাতে জ্যান্ত প্যাসেঞ্জার একজনও আসছে না। রাস্তায়ই সব খালাস হয়ে যাচ্ছে। শত হলেও ওদের জীবনের ভয় আছে তো?

—যাক্‌গে, আপসোসের কি আছে? আপনিও তো বিশ হাজার মণ ডালে দেড় লাখ টাকা কামিয়েছেন।

—তা কামিয়েছি, কিশোরীমল বললেন, সবই হচ্ছে হনুমানজীর দয়া। তা না হলে লক্ষ্মীপ্রসাদ ছিল কি? মাসে সাত আটশো টাকার বেশী ওর রোজগার ছিল না। এই যে সব দেখছেন যুদ্ধ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা,—এগুলি আর কিছুই নয়—হনুমানজী কতকগুলি লোককে বোকা করে দেবার জন্যে এই সব অনাসৃষ্টি করে থাকেন! লক্ষ্মীপ্রসাদের ওপর হনুমানজীর বহুৎ কৃপা।

নমস্কার বিনিময়ের পর কিশোরীমল চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন ফিরে আমাকে ডাকতে লাগলেন। কাছে আসতেই বললেন, বাবুজী একটা নতুন গাড়ি কিনেছি—একদিন আপনাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসব।

কিশোরীমল চলে গেলেন। উনি লেখাপড়া জানেন না, —ইতিহাস পড়েন নি, ইকনমিকস্‌ও নয়। কিন্তু সেরেফ জীবনের

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটা অদ্ভুত সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন—যা অনেক বড় বড় পণ্ডিতরাও অনেক সময় পারেন না। হনুমানজী কতকগুলি লোককে মোকা করে দেবার জন্যে যুদ্ধ আর দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে দেয়। হনুমানজীর ওপর ওর বিশ্বাস আছে, তাই, না হ'লে হয়তো বা বুঝতে পারতেন যে যারা মোকা পেতে চায় তারাই এগুলি ইচ্ছে করে সৃষ্টি করে।

কিশোরীমল সুরজমল গাড়ি কিনেছেন—আর দেবেনদা প্লাই-মাউথখানা দেড় বছর আগে বিক্রী করে দিয়েছেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ আগরওয়ালা হাজার হাজার টাকার মাল লুঠ করে নিজের কুক্ষিগত করেছে, আর দেবেনদার হাজার হাজার টাকার মাল লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম, সুরজমল আর লক্ষ্মীপ্রসাদ মিলে দেবেনদার বেলেঘাটার গুদোম ভেঙ্গে বস্তা বস্তা কেমিক্যাল বের করে নিয়ে আসছে। আসলে লুঠ অবিশ্যি গুণ্ডারা করেছে, কিন্তু ওদের সাথে এদের তফাত খুব বেশী আছে কি? ওরা গরীব মানুষ, ধর্মের দোহাই দিয়ে ওদের দিয়ে লুঠ করানো সোজা। কিন্তু এদের অনেক টাকা আছে, তবুও এরা লুঠ করে। ওরা লুঠ করে প্রয়োজনে, এরা লুঠ করে লোভে। ওরা বড়জোর ধর্মের ষাঁড়—এরা হিংস্র শ্বাপদ। মানুষের রক্তে এদের নেশা লেগেছে।

উমা আর আমি দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তায় সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমাদের আপিসও তালা বন্ধ করবার সময় আগতপ্রায়। শুধুমাত্র একটা অবাস্তব আশাকে আশ্রয় করে যে কয়েকদিন ক্লাইভ স্ট্রীটে থাকতে পারি। উমার জন্যে কষ্ট হয়। ব্যবসায়ে যে পাঁচ হাজার টাকা মূলধন ছিল, তার সবটাই ওর। বাবার কাছ থেকে বহু কষ্টে টাকাটা এনেছিল। তিনি আগেই বলেছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য তোমাদের কম্ম নয়। তাই আজ যখন সব টাকাটাই যাবার মুখে, তখন উমার

মনের অবস্থা ভাল হবার কোনও কারণ নেই। তবুও পারিপার্শ্বিকতার কাছে হার মানা আমাদের কারুরও কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবার কাছে গালমন্দ শুনতে হবে তো!

—সে সব আমি ম্যানেজ করে নেব, উমা বলল।

—বাড়িওয়ালার দারোয়ান এসেছিল। ভাড়া কালকের মধ্যে দিতে হবে, অন্তত এক মাসের।

উমার চোখে মুখে লজ্জার ছায়া ঘনিয়ে এল। ধাপ্পা দেওয়া ওর স্বভাব নয়।

—দাঙ্গার নাম করে দু'মাসের ভাড়া দেওয়া হয় নি।—

—সে আমি দারোয়ানকে বুঝিয়ে বলবোখন। তা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, উমা বললে।

উমা সাধারণতঃ দেনা-পাওনার ব্যাপারে আমাকে থাকতে দেয় না। কারণ আমার মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা নয়। বাড়িওয়ালার দারোয়ান উঁচু নীচু কথা বললে হয়তো বা আমার কাছে হেনেস্তা হতে পারে। তাই ও আমাকে সাবধান করে দিল।

কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল। এবার দারোয়ান কথা শুনল না। এর আগের মাসে পাঁচটাকা বখ্‌শিশ্‌ দিয়ে উমা কোনওরকমে Manage করেছিল, কিন্তু এবার মালিক বলে দিয়েছে, হয় ভাড়া আদায় করে নিয়ে এসো, না হয় নোটিশ দিয়ে ভাড়াটে তুলে দাও। অগত্যা আমি আর উমা লোহিয়া কোম্পানীর আফিসে গিয়ে মালিক রামপ্রসাদ লোহিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। ভাবলাম, অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে হয়তো রাম প্রসাদ বাবু শান্ত হবেন। আমাদের তো ফাঁকি দেবার কোনও উদ্দেশ্য নেই!

একটা বিরাট তিনতলায় মোজেইক্ করা একটা ঘরে গদীর ওপর রামপ্রসাদ বাবু বসে আছেন। কোটিপতি রামপ্রসাদ লোহিয়াকে দেখে মনে হোল তিনি যেন অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। আশে পাশে সব মুনীবজীরা আছেন। খুব শান্ত

পরিবেশ। আমরা গিয়ে বসতেই রামপ্রসাদ চেঁচিয়ে উঠলেন—কা মাঙ্‌তা ?

—আমরা আপনার ক্লাইভ স্ট্রীটের বাড়ির ভাড়াটে, উমা বলল।

—ক্লাইভ স্ট্রীটকা কোন্ কৌঠী ? হামারা সতরো ঠো কোঠী হ্যায় হুয়া।

আমি প্রমাদ গুনলাম—ক্লাইভ স্ট্রীটে সতেরো খানা বাড়ি ? আমাদের অনুরোধ কি শুনবে ?

উমা বলল, রামপ্রসাদ বাবু, আমরা দু-মাসের ভাড়া দিতে পারি নি—যদি আমাদের আরও একমাস সময় দিন, তাহলে ভাল হয়।

—কাঁহে নেহি দিয়া ভাড়া ? তুম্‌কো বাপকা কোঠী হ্যায় ?

আমাকে বাঁ হাতের আস্তিন গুটোতে দেখে উমা এক হাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরল। ওর হাতের ভাষা আমি বুঝতে পারলাম। উমা আমাকে বলতে চাইছিল যে ধনীরা এরকম কথা বলে থাকে—তাদের বলবার অধিকার আছে।

উমা বলল, রামপ্রসাদ বাবু, আপনি রাগ করবেন না—দাঙ্গার জন্যে আমাদের এই অবস্থা—আপনি একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি কথা দিচ্ছি, পনেরো দিনের মধ্যে যেমন করে হোক আপনার বাকী ভাড়া দিয়ে দেব।

রামপ্রসাদ গর্জ্জে উঠে বললেন, রূপায়া কা ব্যাজ দেগা কোন্ ?

—দু এক টাকা বেশী দিতে হয়, আমি দেব। উমা বলল।

দু-এক টাকা সুদ হিসাবে দেওয়া হবে শুনে রামপ্রসাদের মেজাজের temperature-এ অদ্ভুত পরিবর্তন হলো—১০৬° থেকে ১০১°। —হাঁ, দাঙ্গামে আদমী লোগকা বহুৎ লোক্‌সান হুয়া—ও বাৎতো ঠিক হ্যায়—লেকিন্ হামারা রূপায়া কা ব্যাজ ক্যায়সা ছোড় দে ?

উমা আরও একটু ঘনিষ্ঠ হবার জন্য হেসে জিজ্ঞেস করল, শেঠজী, দাঙ্গায় আপনার কোন ক্ষতি হয় নি তো ?

—নেহী বাবুজী! গোপালজী কা দয়া সে, কুচ ফায়দা উঠায়া। বি, কে, পাল এভিনিউ মে তিন ঠো কোঠী বহুৎ সস্তা মে মূল লিয়া। মুসলমান লোগোঁকা থা। সায়েদ্ তিন লাখ রূপয়া কা কোঠী পচাত্তর হাজার মে মিল গিয়া—সব গোপালজী কা কৃপা।

আমরা দুজন নমস্কার করে উঠে পড়লাম। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরোব, এমন সময়ে রামপ্রসাদ বাবু ডেকে বললেন, বাবুজী শুনিয়ে—পন্দ্রেরো দিন মে রূপায়া নেহি মিলনেসে নোটীশ মিল যায়গী—ইয়াদ রাখিয়ে।

কলকাতার দাঙ্গায় হনুমানজী আর গোপালজীর কৃপা অনেকের ওপরই বর্ষিত হয়েছে! কিশোরীমল, লক্ষ্মীপ্রসাদ আর রামপ্রসাদ বাবু বড়লোক হয়ে গেছেন। দেবেনদা আর আমাদের মত হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের ঘরে তালা পড়েছে। তা তো হবেই। একদল ফেঁপে উঠলে, আর একদল যে নিঃস্ব হবে, এতো অতি সহজ সরল সত্য।

দুদিন পর থেকেই ভাবতে লাগলাম, অফিস ভাড়াটা কি ভাবে সংগ্রহ করা যায়। নাদান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর শীতলভাই-এর সঙ্গে দেখা করে বললাম, সাহেব, তুমি যদি এইবারটা দয়া করে ৪৫ দিনে টাকা না দিয়ে ১৫ দিনে দিয়ে দাও, তাহলে আমাদের বড্ড উপকার হয়।

ওখানে আসবার আগে উমা বলে নিয়েছিল, নিজেদের দৈন্যের কথা যেন প্রকাশ না পেয়ে যায়—তাহলে নাদান কোম্পানীর ব্যবসা আর পাওয়া যাবে না।

এটাও ক্লাইভ স্ট্রীটের একটা বিশেষত্ব। তুমি আসলে যা, তা প্রকাশ করা চলবে না। তুমি যা নও, তাই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। এখানে মানুষের কোনও মূল্য নেই। Bank Reference সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। যাই হোক, নাদান কোম্পানীর শীতলভাই গললেন না। সত্যি ওরা সব হৃদয়হীনতার হীমপ্রবাহে জমে এমন কঠিন হয়ে গেছে যে, ওদের গলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এখন একমাত্র ভরসা ডাঃ নারু। দু-মাস ওর কাছে যেতে পারি নি। দাঙ্গার দুদিন আগে শেষবার গিয়েছিলাম। কলুটোলা এলাকাটা খুব ভাল নয় বলে যেতে পারি নি। দু-একবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু স্ব-প্রতিষ্ঠিত মোড়লদের জন্যে ওদিকে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 'ওদিকে যাবেন না—যাবেন না, ভয়ানক ব্যাপার!' প্রত্যেকবারই ভেবেছি, এইসব নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকরা না থাকলে হয়তো কলকাতার দাঙ্গা হতই না, আর হলেও দু' এক দিনের বেশী স্থায়ী হতো না। ওদেরই বা দোষ দিই কি করে। ওরা নিয়মিত মাইনে পাচ্ছে—বিনে পয়সায় খাবার, চাই কি ধান্যেশ্বরীও মিলছে দু-এক পাঁইট্!

ডাঃ নারুর কাছে শ আড়াই টাকা মাত্র বাকী ছিল। দাঙ্গার দুটো মাস বিজ্ঞাপন ছাপা হয় নি, তাই পাওনাও আর বেশী কিছু নেই। আমি জানতাম গেলেই বাকী টাকাটা পাব। বাড়িওয়ালার ক্রোধের আগুন থেকে বাঁচতে গেলে এই মুহূর্তে ডাঃ নারুই একমাত্র ভরসা।

তাই আমি আর উমা গেলাম। কিছুটা দূর থেকেই দেখতে পেলাম, ডাঃ নারুর অফিসের দরজা খোলা। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম, বাড়িটায় যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। পোড়ে নি, তবে Venus & Diamond-এর প্রকাণ্ড সাইন বোর্ডটির খানিকটা অংশ কালো হয়ে গেছে। উমা বলল—পৃথ্বীশ, চল ফিরে যাই—ডাঃ নারু পালিয়েছেন; ওর দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না?

—এসেছি যখন ফিরে যাব না—আমি বললাম—চল দেখি ব্যাপারটা কি?

ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম, চেয়ার, টেবিল, একখানাও নেই। আলমারীগুলি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে আছে। ভাবলাম, এসব না হয় গেল, ডাক্তার সাহেব আর তার ছেলেরা গেলেন কোথায়? ওরা তো এই বাড়িরই পেছন দিকে থাকতো?

হঠাৎ ডাঃনারুর বৃদ্ধ দারোয়ান ঘরভরণরাম এসে উপস্থিত হলো।

—ডাক্তার সাহেব কোথায় গেছেন ? উমা জিজ্ঞেস করল।

ঘরভরণরাম উত্তর দিল না। এক মিনিট—দু' মিনিট—তিন মিনিট—হঠাৎ 'বাবুজী' বলে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

—হুয়া কেয়া দারোয়ানজী, আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—উস্ লোগোঁকা জিন্দীগি বরবাদ হো গ্যয়া—বাবুজী, সব খতম হো গ্যয়া—এতনা আচ্ছা আদমীকো এইসা কুত্তাকা মাফিক মার ডালা···। ঘরভরণরাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ততক্ষণে আমি আর উমা বাক্যহীন হয়ে পড়েছি। উমা সহ্য করতে না পেরে ধপ করে ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ল। আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ইতিহাসের ছাত্র—বহু করুণ হৃদয়হীনতার কাহিনী আমি পড়েছি, জেনেছি, পরীক্ষার খাতায় লিখেছি।

—দারোয়ানজী, বল তো ব্যাপারটা কি হয়েছিল ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—কি শুনবে পৃথ্বীশ, উমা আমার দিকে তাকিয়ে বলল। সব ঘটনাই এক।

—শোনবার অনেক কিছু আছে। মহম্মদ সৈফুদ্দিনের মত লোক আর দশজনের মত যে মরে নি তা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

ঘরভরণরাম চোখ মুছতে মুছতে ভাঙ্গা গলায় যা বলল, তা হচ্ছে এই—

দাঙ্গার তৃতীয় দিনে রাস্তার ওধার থেকে প্রায় দুশো লোক এধারে এসে ডাক্তার সাহেবের দোকান ঘিরে ফেলল। তখন বেলা দশটা হবে। ঘরভরণরাম চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে —কেন না, কথা বললে তাকেই প্রথম শহীদ হতে হবে। ডাঃ নারু ওপরে ছিলেন—নীচে নেমে এলেন। শান্ত গম্ভীর মুখ—সারা দেহে একটুও উত্তেজনার ভাব নেই। নেমে আসা মাত্রই জনা পাঁচেক এগিয়ে এল—'এই ব্যাটা, এখানে কি করছিস ?'

—আমাকে আপনারা মারতে চাচ্ছেন কেন ?

—বুঝতে পারছ না—তুমি মুসলমান বলে।

—তাতে কি হয়েছে, আমি কি তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি ?

—তুমি কর নি, কিন্তু জান, তোমাদের জাতভাইরা পার্ক সার্কাস আর বেনিয়াপুকুরে কি করেছে ?

—ওরা আমার জাতভাই নয়—ওরা দেশকে ভালবাসে না—আমি আমার দেশকে ভালবাসি। ১৯৩২ সালে আমি গান্ধিজীর সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি চালাই নি বলে আমার হাবিলদারের চাকরি যায়। আপনারা যারা এখানে এসেছেন, তাদের মধ্যে এমন একজনও কেউ আছেন, যিনি এইরকম ভাবে চাকরি ছেড়েছেন ?

—ব্যাটা আবার দেশসেবক সেজেছে। ভণ্ড কোথাকার! ব্যাটাকে মেরে ফেল্। ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল।

আর একজন বীরপুরুষ বলল, আর হলোইবা চাকরি ছেড়েছে—ব্যাটা মুসলমান তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ শতকণ্ঠে আওয়াজ হলো। ওদিকে আর কয়েকজন ততক্ষণে পেট্রোল ছড়িয়ে ডাঃ নারুর দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। জন কয়েক বীরপুরুষ বেলচা হাতে করে এগিয়ে গেল।

—তোমরা আমাকে মারবে জানি, ডাঃ নারু বললেন, কিন্তু তার আগে তোমাদের বলতে হবে—কেন তোমরা আমাকে মারবে।

কিন্তু বীরপুরুষদের ঠেকায় কে ? তারা অস্ত্র নিয়ে আরও কাছে এগিয়ে এল।

—দাঁড়াও, আমার ছেলেদুটোকে ডেকে আনি—ওদের অনেক কষ্টে মানুষ করেছিলাম। আমি জানি, তোমরা ওদেরও ছাড়বে না।

ছেলে দুটো এল। ভোরবেলায় ফোটা পদ্মকোরকের মত দেখতে দুটি নির্দোষ যুবক। তারা এসে বাপের পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।

ঘরভরণরাম একবার শেষবারের মত সেই অস্ত্রধারী মহাপুরুষদের কাছে ডাক্তার সাহেবের জীবন ভিক্ষা করল। সে বলল, দাঙ্গার

প্রথম দিনেই কলুটোলা থেকে মুসলিম গার্ডরা সাহেবকে নিয়ে যেতে এসেছিল, কিন্তু উনি যান নি।

'চোপরাও'! বলে দুজন মহাবীর ঘরভরণরামকে থামিয়ে দিল।

আটান্ন বছর বয়সের ঋজুদেহ, সুকান্তি পুরুষসিংহ মহম্মদ সৈফুদ্দিন যখন দেখলেন, বাঁচবার কোনও পথ নেই, তখন চিৎকার করে বললেন, তোমরা কাপুরুষ—মরদের বাচ্চা যদি হও, তাহলে এস, আমি এক এক করে তোমাদের সঙ্গে লড়ব। যদি লড়ে মরে যাই কোনও আপশোষ নেই। কিন্তু কুকুরের মত মরলে আমি নরকে যাব! মরতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমাকে মরদের মত মরতে দাও! আমি তোমাদের আশীর্বাদ করব!

হায়রে ১৯৪৬ সালের কলকাতার কাপুরুষতা, তোমাকে আমরা অনেককাল মনে রাখব! তুমি এমন করে নির্বীর্যতার বীজ সবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলে, যে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদের কত শত বছর ধরে সংগ্রাম করতে হবে কে জানে? একজন একটা দোষ করলে আমরা দশজন মিলে তাকে ধরে ঠেঙ্গাব, ছোট্ট অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হাজারটা অন্যায় করব। কাপুরুষতার মত নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন প্রবৃত্তি আর একটাও আছে কিনা সন্দেহ।

তাই মহম্মদ সৈফুদ্দিনের Challenge-এ সাড়া দেবার মত একজন বীরপুরুষও পাওয়া গেল না! 'মারো' 'মারো' বলে শত তূর্য নিনাদিত হোল—আর মিনিট দশেকের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিক তার প্রাণ হারাল।

ঘরভরণরামের কাছে সব কথা শুনতে শুনতে কখন যে আমার আর উমার জামাগুলো চোখের জলে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল, টের পাই নি। উমা তখনও ওঠে নি! আমার পা কাঁপছিল, হঠাৎ ঘরভরণরাম বলল, বাবুজী, ডাক্তার সাহেব আপকো লিয়ে আড়াই-শো রূপায়া রাখকে গিয়া—আপকা পাওনা থা।

শুনলাম, যখন বীরপুরুষরা শেষ আঘাত হানবে, তখন ডাক্তার সাহেব ঘরভরণরামকে ডেকে বললেন—দারোয়ান, পাবলিসিটি কোম্পানীর বাবুদের আড়াইশো টাকা পাওনা আছে দিয়ে দিও। ওদের বলো আর দেখা হলো না—ওদের জন্য আমার শতলক্ষ আশীর্বাদ রইল। আর আমার কোটের পকেটে সাড়ে পাঁচহাজার টাকা আছে, সেটা নিয়ে এই ঠিকানায় মনিঅর্ডার করে দেবে ঃ—

হানিফা বেগম
c/o. জায়গীরদার আবদুল সামাদ
গ্রাম, পোঃ বীরধানা
জেলা ফিরোজপুর
পাঞ্জাব

উমা টাকার কথা শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আড়াইশো টাকার বাণ্ডিলটা দারোয়ানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেশলাইর কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

আগুন জ্বলল—নোট পুড়ল, আর তার সাথে পুড়ল এক বিরাট প্রেমিকের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। সত্যিই ও-স্মৃতির বোঝা নিয়ে বাঁচা যায় না!

মহম্মদ সৈফুদ্দিন ওরফে ডাক্তার নারু আর নেই, কিন্তু একথা বলতে পারি যে সেই মহাপ্রেমিক আর পুরুষসিংহের অস্থি চর্ম মিলিয়ে গিয়ে যে পঞ্চভূত তৈরী হয়েছে, তার থেকে ফুটবে লক্ষ হাসনুহানা, গোলাপ আর নীলপদ্ম।

আপিস থেকে ভাড়া আদায়ের আর কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাদের ব্যবসা আর চালানো আদৌ উচিত হবে কিনা, তাই নিয়ে আমার আর উমার মধ্যে তখন প্রায়ই আলোচনা চলছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে।

শুধু আমরাই নয়, আমাদের মত বহু মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পর পর ব্যাঙ্ক ফেল আর দাঙ্গার চোট সামলাতে পারল না।

হঠাৎ একদিন উমা দুপুরবেলা দু'শো টাকা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞেস করতেই বলল, এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনেছে। ভাববার সময় নেই—বাড়িওয়ালাকে দিয়ে এলাম—সঙ্গে আরও তিন টাকা সুদ। বলাবাহুল্য, সুদের টাকাটা না দিলে রামপ্রসাদ লোহিয়া ভাড়ার টাকা কিছুতেই নিতেন না।

অনেক আশা, নিরাশা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিচার করে অবশেষে দুই উদীয়মান বাঙালী romantic ব্যবসায়ী স্থির করলাম, ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়াটাই সমীচীন হবে! উমা শুধু একবার বলল, বাবা ঠিকই বলেছিলেন—ভদ্রলোকের ছেলেদের দিয়ে কখনও ব্যবসা হয়?

তাই ডিসেম্বর মাসে আমরা আপিস বন্ধ করে দিলাম।

প্রথম জীবনের কোনও উদ্যম ব্যাহত হলে মনে যে বেদনামিশ্রিত তিক্ততার সৃষ্টি হয়, আমার ও উমার ক্ষেত্রেও তা বাদ গেল না। দুজনেই ভাবতে লাগলাম, আর কি আমরা কিছু করতে পারব, আর যদি পারিও তবে সেই শুভলগ্নের জন্য আর কতদিন বসে থাকতে হবে? তবে মনে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল, যে কারুরই টাকা মেরে দিই নি। না বাড়িওয়ালার, না খবরের কাগজগুলির।

আমরা আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে পাড়ি জমালাম। এর পরে কি হবে একবারও ভাবলাম না। ইচ্ছে করলে অনেকগুলি টাকা না দিয়েও ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারতাম। হাতে কিছু থাকতো, কিন্তু শিক্ষার অভিমানই বলুন, আর ব্যবসার morality-ই বলুন, শেষ পর্যন্ত তা করতে পারলাম না। আর পারলাম না বলেই নিজেদের কথা ভাববার সময় পেলাম না।

দেশে তখন একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার রাজত্ব চলেছে। ক্লাইভ

স্ট্রীটের গহ্বরে-গহ্বরে সভা সমিতি। বিলেতের কর্তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া স্থির করেছেন—কিন্তু এখনও দেশের নেতারা একমত হতে পারছেন না। যেন ঐক্য সৃষ্টি করবার জন্য বিলেতের ডাউনিং স্ট্রীট আর কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের কর্তাদের চেষ্টার অন্ত নেই! নেতারা জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলছেন,—স্বাধীনতাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। এমন দয়ার দান বার বার হাতের মুঠোয় নাও পাওয়া যেতে পারে তো? আমাদের স্বাধীনতার বড় প্রয়োজন। তা সে যেমন করেই আসুক! পূর্ববঙ্গ পাঞ্জাব, বিহার আর পেশোয়ারে প্রত্যহ নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে, হিন্দু মুসলমান দুই জাতি। দুই জাতির ভৌগলিক অস্তিত্ব দুই স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে থাকবে, এক রাষ্ট্রে হতে পারে না। দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদন করবার সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রায় সমাপ্ত। দিল্লীর আর করাচীর নেতারা ভাবছেন—হোক না কয়েক কোটি লোকের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। থাকুক না তারা কালের অতল গহ্বরে নিদ্রিত! আমরা যা চাইছি, তা পেলেই হয় একবার। ইংরেজ রাজার প্রতিনিধির তখন দেশে অবাধ কর্ত্তৃত্ব। দাঙ্গা-হাঙ্গামাই বলুন, আর দেশবিভাগের বৈজ্ঞানিক যুক্তিই বলুন, সব ব্যাপারেই তাঁর বক্তব্যই শেষ বক্তব্য—তিনি মহান্, তিনি স্থিরধী, মেধাবী আর দয়ার সাগর।

আমরা তখন মায়াবিনী ক্লাইভ স্ট্রীটের আশ্রয়চ্যুত। চিরনবীনা আর অঘটন ঘটন পটীয়সী যক্ষদুহিতা তার ছলনা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে হাসাচ্ছে, কাঁদাচ্ছে—যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন করে।

উমা ক্লাইভ স্ট্রীটে আসা বন্ধ করেছে। ওর পাঁচহাজার টাকা মার গেছে, কম কথা নয়! তার উপরও আছে ব্যবসায়ে অকৃত-কার্য্যতার গ্লানি। এই দুই মিলে ওর মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। একদিন ও আমাকে বলল, আমি আর ও পাড়ায় যাব না।

আমি বললাম, ভাল কথা—তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল—কিন্তু

আমি যেতে থাকব—দেখি মায়াবিনী আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়!

তাই ক্লাইভ স্ট্রীটে রোজ আসি। যাকে না পাওয়া যায়, যাকে না বোঝা যায় তার প্রতি মানুষ মাত্রেরই আকর্ষণ থাকে—আবার আমার আকর্ষণটা আরও একটু নিবিড়। হাতে পয়সা নেই একটিও। দুপুর বেলাটা বন্ধুবান্ধবদের আপিসে বসে দু-এক কাপ চা খেয়ে গল্পগুজব করে কাটাই! মধ্যাহ্নের খররৌদ্র তাপে ছলনাময়ীকে দেখি—দেখি গোধূলির ম্লান আলোকে। প্রিয়াকে লক্ষবার দেখেও যেমন মন ভরে না, সেই রকম যতবারই আমি ক্লাইভ স্ট্রীট দিয়ে যাই আসি, ততবারই আমি ছলনাময়ীর নব নব রূপে মুগ্ধ হই।

তারপর একদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এল। দেশ স্বাধীন হলো। একদিকে change of Arms এর Army Band বাজছে, আর অন্যদিকে শত লক্ষ লোকের করুণ আর্তনাদ। এক দিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস, আর একদিকে ক্রন্দনময়ী দেশমাতৃকার হাহাকার। এমন সহজ অথচ বেদনাময় পথে স্বাধীনতা এল যে সাধারণ মানুষের তাতে কোনও আনন্দ হোলো না। সবারই মুখে এক কথা—এই কি স্বাধীনতা!

কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন হলাম। বহু যুগ পরে আমরা বলতে পারলাম, আমরা এখন স্বাধীন। আমরা আমাদের মত চলতে পারব। কারুর সঙ্গে এখন আর গাঁটছড়া বাঁধা নেই। বহুদিন পরে গাছে গাছে কোকিল গান গাইল—ডালে ডালে ফুল ফুটল। যদিও বহু দেরি করে আর বহু শীতের ভার বহন করে বসন্ত এল, তবুও তো সে বসন্ত!

১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে হবে—একদিন ক্লাইভ স্ট্রীট দিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ আসছি; হঠাৎ এক বৃদ্ধ সামনে এসে বললেন—**Headmaster Sir, Please help me।**

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। —কি বললেন?

—আমি নোয়াখালির গ্রামের একটা ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলাম—দাঙ্গায় আমার বাড়িঘর সব গেছে। একটি মাত্র ছেলে আছে, ক্লাস এইট্‌-এ পড়ছিল। এখানে এসে অবধি তাকে ভর্তি করতে পারি নি। এ ছাড়াও ছুটি মেয়ে আর স্ত্রী আছেন। বহু চেষ্টা করেও একটি চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না। দিতে পারেন আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে? যে কোনও চাকরি—office peon-এর চাকরি করতেও রাজী আছি।

বৃদ্ধকে সঙ্গে করে একটা খাবারের দোকানে নিয়ে গেলাম। দেখে মনে হচ্ছিল বেশ কয়েকদিন ধরে ভদ্রলোক খান নি। আপনি কিছু খেয়ে নিন, আমি বললাম, আমার পকেটে বেশী পয়সা নেই। আনা আষ্টেক মাত্র আছে। আমিও বেকার।

ভদ্রলোক মুখ নীচু করে বসে রইলেন। বুঝলাম তার খাবার ইচ্ছে নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছেলেপিলেদের ফেলে কি করে খাই? ওরাও যে না খেয়ে আছে!

আমি আর একটি কথাও বললাম না। আট আনা পয়সা তার হাতে গুঁজে দিয়ে উলটো দিকে মুখ করে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলে এলাম।

এরপর বৃদ্ধ হেডমাষ্টার মশাইএর কথা যখনই মনে হয়েছে তখনই আর একজনের মুখ আমার সামনে ভেসে উঠেছে—পাটগ্রাম অনাথবন্ধু হাইস্কুলের হেডমাষ্টার দেবেনবাবু—তিনি কোথায়?—তিনিও কি 'Headmaster Sir, please help me', বলে ক্লাইভ স্ট্রীটে কোথাও দাঁড়িয়ে আছেন? আজও মনে পড়ে 2nd class-এ চোখ বুজে তিনি পড়াতেন—

'যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'।

পাটগ্রাম ইস্কুলের হেডমাষ্টার মশাই কি এখনও অমনি আবাবেগে কবিতাটি পড়তে পারেন ?

ব্যাঙ্ক ফেল আর কলকাতার বিধ্বংসী দাঙ্গার পরেও যে সব ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছিল, তাদের মনে স্বাধীনতার পরে অশেষ আশার সঞ্চার হলো। বড়দের কথা ছেড়েই দিলাম—তাদের পৌষ মাস জীবনে যে আর কখনও বদলে অন্য মাসে রূপান্তরিত হতে পারে তা তারা ভুলেই গিয়েছিল। ক্লাইভ স্ট্রীট ভরে গেল অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ীদের ভীড়ে। স্বাধীন দেশের ব্যবসায়ী—ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা মনকে ভরপুর করে রেখেছে।

একদিন সুধীর মৈত্রের সঙ্গে দেখা। ইনি যুদ্ধের ঠিক পরেই একটা ছোট্ট ওষুধের কারখানা করেছিলেন বিশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে। কোনও রকমে এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার মত রোজগার করছিলেন।

—আপনার ব্যবসা কেমন চলছে ; সুধীরবাবু ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুধীরবাবু মুচকি হাসলেন, আমার তো হয়ে এসেছে—

আমি বললাম, তার মানে ?

—মানে আর কিছুই নয়। সরকার বাহাদুর কোটি কোটি টাকার ইমপোর্ট লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন। ইংলণ্ড, জার্মাণী আর আমেরিকা থেকে ওষুধ দেশে আমদানী হলে আমার ওষুধ আর কিনবে কে ?

—কেন আপনার 'ভিটাফস্'টা তো বেশ চলছিল ?

—কিন্তু বাজারে যখন ওয়াটার বেরী'স্ কম্পাউণ্ড পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর তখন 'ভিটাফস্' খায় কে ?

—ডাক্তারদের কাছে সার্কুলার দিন—দেশের তৈরী জিনিস তাঁরা যেন রোগীদের জন্য ব্যবহার করেন।

—আপনি বুঝি ভেবেছেন দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ডাক্তারদেরও স্বাধীনতা হয়েছে দেশী ওষুধ পেস্ক্রীপশন করবার ?

আমি বললাম, দেশের শিল্পকে ডাক্তাররা সাহায্য করবেন না?

—বাজারে কেই বা দেশী জিনিস কিনছে, সুধীরবাবু বললেন। New market আর বড় বড় stores এ গিয়ে দেখবেন—এখন যত বিদেশী মাল পাওয়া যাচ্ছে, ইংরেজদের আমলেও তা মিলত না।

কথাটা সত্যি। অদ্ভুত বিদেশপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশীর সব কিছু ভাল। বিদেশের লোকরাও ভাল, বিদেশের জিনিস ভাল এমন কি বিদেশের ভাবধারাও ভাল। এমন স্যুটের বাহার কেউ কখনও দেখেছেন কি? বড় বড় হোটেলে লাঞ্চ, ডিনার খাওয়ার রেওয়াজ আগে তো বড় একটা দেখি নি। আর এখন? সত্যাগ্রহী নেতা রামবাবু থেকে উচ্চতম সরকারী কর্মচারী সবাইকে নেমন্তন্ন করে আপ্যায়ন করা হচ্ছে—বড় বড় বিলিতী-কায়দার হোটেলগুলিতে। বাড়িতে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ানোটা এখন বড্ড সেকেলে মনে হয়। চলে যাক্ না সাহেবরা—হোটেলের ব্যবসায় এতটুকু ভাটা পড়ে নি। সালেমত খানের দর্জির দোকান দু-দরজা থেকে চার-দরজা হয়েছে। সালেমত আগে পার্ক স্ট্রীট আর থিয়েটার রোডের সাহেবদের অর্ডারী স্যুট তৈরী করতো; তাদের মধ্যে অনেক সাহেবই নেই, কিন্তু তার বদলে এসেছে চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী আর আগরওয়ালার দল। চৌরঙ্গীর Style-cut saloon টাতে আগে মেমসাহেবরা চুল কাটতো। তারা দেশে চলে গেছে—এখন চুল কাটছে মিনি রায়, শেলী মিত্তির আর রুবি সিং-রা। আগে চার্জ ছিল আড়াই টাকা—এখন হয়েছে সাড়ে চার টাকা। ব্যবসা জমেছে ভাল।

সেদিন ক্লাইভ স্ট্রীটে বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী অসিত সেনের সঙ্গে দেখা। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সহপাঠীদের মধ্যে অমন পণ্ডিত ছেলে খুব কমই দেখেছি। সাহিত্য, দর্শন আর ফাইন আর্টসে অমন জ্ঞানী আর চিন্তাশীল ছাত্র সারা দেশে ক'জনই বা আছে?

অনেকদিন বাদে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে যে-উচ্ছ্বাস এবং ভাবাবেগের সঞ্চার হয়, এক্ষেত্রেও তার কিছু কম হল না, বরং একটু বেশীই হলো—অসিতের সঙ্গে হৃদ্যতা বরাবরই আমার একটু বেশী ছিল। শুনলাম অসিত এম, এ, পাস করবার পর পূর্ববঙ্গের একটা কলেজে ইংরেজী সাহিত্য পড়াচ্ছিল। মাস দুই হলো বাড়ির সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে।

—আপিসে আপিসে হাঁটাহাঁটি করে শুধু জুতোর পরমায়ু কমছে। এখানে চাকরিবাকরি মিলবার কোনও লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না। অসিত বলল।

বুঝতে পারলাম স্বাধীনোত্তর কলকাতার নিঃসীম এবং দুঃসহ বেকারত্বের সাঁড়াশি অসিতকে চেপে ধরেছে—যেমন ধরেছে আমাকে আর উমাকে। আমার খবর জিজ্ঞেস করতে বললাম—তথৈবচ, তবে আমি তোমার মত আপিসে আপিসে ধরনা দিচ্ছি না। প্রয়োজন নেই বলে নয়, প্রয়োজনকে কেটে ছেঁটে প্রায় নিস্প্রয়োজনের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছি। আপ সে যা হবার হবে, আমি পরোয়া করি না।

অসিত কলকাতার সওদাগরী আপিসগুলিতে চাকরির চেষ্টা করছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দিল, আমার হবে না ভাই—আমার ইংরেজী উচ্চারণ তত ভাল নয়।

—তার মানে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম। ততক্ষণে আমি আর অসিত একটা রেষ্টুরেণ্টে দু' পেয়ালা চা নিয়ে বসেছি। পয়সা আছে তো পকেটে ? দুজনেই দুজনার পকেট হাতড়ে দেখলাম সব মিলে দু-কাপ চা আর দুটো সিগারেট হবে। অসিত বলতে থাকল—দিন সাতেক আগে এক অফিসে গিয়েছিলাম। কোম্পানীটা ইংরেজদের, তবে Director-in-charge হয়েছেন ভবতোষ মিত্র—স্যার গঙ্গাদাস মিত্রের ছেলে। শুনেছি বিলেতে পড়াশুনো করেছেন। কথাবার্তায় কায়দায় ভদ্রলোক সাহেবদের হার মানান। হাজার চারেক টাকা মাইনে পান। ভবতোষবাবুই Interview নিলেন।

অনেক প্রশ্ন করবার পর আমায় জিজ্ঞাসা করা হোল—এ-যুগটাকে আপনি এক কথায় কি বলে প্রকাশ করতে পারেন? আমি বললাম—Industrial age বা machine age বলা যেতে পারে। ভবতোষবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন—গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলাম আপনার ইংরেজী উচ্চারণ অত্যন্ত miserable। কি বললেন আপনি? মেসিন এজ? It is not m´a´chine but mach´ine। ঈ-কার 'm'-এর উপর হবে না, 'ch'-এর উপর হবে। Hopeless! I am sorry মিঃ সেইন্, আপনাকে আমরা নিতে পারি না। আমরা আরও Smart ছেলে চাই।

—তুমি কোনও উত্তর দিলে না? আমি বললাম।

—হ্যাঁ, অসিত বলল, আমি বললাম, যে কোনও বিষয়ে লিখে পরীক্ষা দিতে রাজী আছি, ইংরেজী আমার মাতৃভাষা নয়—উচ্চারণে ভুল হতে পারে। ভবতোষ মিত্র ভয়ানক চটে গিয়ে বললেন —এটা ইস্কুল নয়—Essay লিখবার জায়গা নয়—এটা হচ্ছে ব্যবসার জায়গা। হাজার রকম লোকের সঙ্গে কারবার—এখানে কথা বলাটাই আসল। মোট কথা আমরা Smart লোক চাই। আপনাকে দিয়ে হবে না। বুঝতে পারলাম, মিঃ ভবতোষ মিত্র আরও বহু মিষ্টারের মত ভাষা, ভাব ও উচ্চারণের অরণ্যানীতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

—তুমি কলকাতার কোনও কলেজে চেষ্টা করলে না কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—কোনও কলেজ বাদ রাখি নি। হয়তো বা পেতাম—জানো তো অসুস্থতার জন্য আমার B.A. তে Hon's পরীক্ষাটা দেয়া হয়েছিল না—তাই M A.তে ফল মোটামুটি ভাল হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় অধ্যাপনার দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দেওয়াটা কর্তৃ-পক্ষ ভাল মনে করছেন না।

Hon's সীল না থাকার সাথে জ্ঞান বা পড়াবার ক্ষমতার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, আমি আমার চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণ স্থিতি-

ব্যাপকতা প্রয়োগ করেও বুঝতে পারলাম না। অথচ আমি জানি অসিত সেন শুধু ছাত্রদের কেন, বহু কলেজের অধ্যাপকদেরও পড়াবার ক্ষমতা রাখে।

—কমপক্ষে একটা ইস্কুলের হেডমাষ্টারী তো জুটতে পারে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাই চেষ্টা করে দেখ না।

—হেডমাষ্টারী তো ভাল, সাধারণ মাষ্টারীও জুটবে না, কারণ আমি B.T. পাশ করি নি।

—তুমি তাহলে হয় B.T.টা দিয়ে দাও, না হলে ইংরেজী সাহিত্যে Hon'sটা দিয়ে দাও।

উত্তরে অসিত পারিবারিক অসুবিধার কথা বলল। বৃদ্ধা মা, আর তিনটি ভাই-বোন নিয়ে একটা নাতিবৃহৎ পরিবার চলে কোত্থেকে! দেশে যা জমিজমা ছিল তাতে করে খাওয়া-পরার অসুবিধা ছিল না। নিজেদের বাড়ি ছিল, ভাড়া লাগতো না। দু-চার-ছ-মাস চাকরি করলেও চলে যেত। কিন্তু এখন B.T, কিম্বা Hon's পড়তে গেলে সংসার চালাবে কে?

—আচ্ছা অসিত, একটা competitive পরীক্ষা দিয়ে দাও না? আমি বললাম।

—বয়েস নেই।

আমার ধৈর্য তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। —কিছুই নেই! তুমি তো আছ, এই রক্ত মাংস দিয়ে গড়া শরীরটাকে নিয়ে।

অসিত ধরা গলায় বলল, জানো পৃথ্বীশ, মাঝে মাঝে ভাবি, এ-দেশে জন্মানোটাই একটা অভিশাপ। জান তো চিরটা কাল পড়া-শুনা করে কাটালাম। আগে যদি বুঝতে পারতাম তাহলে এ সব বাদ দিয়ে ছোটবেলা থেকে একটা মুদি দোকান খুলে বসতাম। অন্তত দু-মুঠো খেয়ে পরে বাঁচবার জন্য এই উঞ্ছবৃত্তি করতে হত না?

সিগারেটটা শেষ করে অসিত বিদায় নিল। বেচারা! অমন জ্ঞানীগুণী ছেলে একটা চাকরি পায় না। স্বাধীন দেশের একি বিড়ম্বনা! এই কি স্বাধীনতা! এরই জন্যে কি দেশের লোকে

অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন ? এই কি আমাদের স্বপ্নের নর্মসহচরী সেই বিপ্লবের শেষ পরিণতি ? কৈশোর এবং যৌবনের শত সহস্র স্বপ্ন কি আজ ছলনায় পর্য্যবসিত হোল ?

অসিত সেন চাকরি পায় না, কিন্তু অনেকে পায়। ইংরেজ বণিকরা যখন দেখল যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোল—তখন তারা শোষণের রূপ বদলে দিল। ক্লাইভ স্ট্রীটের ঠাণ্ডা গহ্বরে সভা বসল। বণিকশ্রেষ্ঠ Sir Mackneil Godfray জাতভাইদের বললেন—পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়াই ইংরেজদের জাতীয় ধর্ম। আমরা শাসন হারিয়েছি, কিন্তু সাম্রাজ্য হারাই নি। এখনও এ-দেশের শতকরা নব্বটি বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা আমাদের হাতে। আমাদের শত্রু অনেক আছে সত্য, কিন্তু বন্ধুও বড় কম নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের হাত মিলাতে হবে। কোম্পানীগুলিতে ভারতীয় ডিরেক্টর নিতে হবে—আর তা ছাড়াও Labour management এবং Public Relation বিভাগগুলিতে ভারতীয়দের নিতে হবে ; আমরা কোনও ক্রমেই শ্রমিকদের মুখোমুখী হবো না। জান তো এদেশে কম্যুনিষ্টরা রয়েছে। ওরা এর মধ্যেই ইংরেজ শিল্পগুলিকে nationalise করবার দাবী তুলেছে! আমি তোমাদের অনুরোধ করব যে হিন্দুস্থানের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় আমাদের অর্থনৈতিক চালগুলির মধ্যে যেন কোনও গলতি না থাকে। আর তা ছাড়া আমরা Her Majesty's Govt.-এর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছি যে আমাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করবে না। তোমাদের ভয় নেই।

Sir Godfray যেদিন বক্তৃতা করলেন তার কয়েকদিন পরেই ভারতীয় কর্তাদের কাছ থেকে হুকুম এল, বিলিতী কোম্পানী-গুলিতে এদেশের লোকদের বড় বড় চাকরি দিতে হবে। বিদেশ থেকে লোক আনা আর চলবে না। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞরা আসতে

পারবে। এটা ভারতের শিল্পায়নের যুগ। তাই বিশেষজ্ঞ আনতে হবে হাজারে হাজারে। ওরা আসতে লাগল, একজন নয়, দুজন নয়—শত শত হাজার হাজার।. কেইবা কার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেছে। যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের বেকার সমস্যার সমাধান করবার এই সুবর্ণ সুযোগ। Tattoo আঁকা ছোকরারা সব বিশেষজ্ঞ সেজে আসতে লাগল। সবাই বিশেষজ্ঞ। কারখানার Foreman ও বিশেষজ্ঞ, আবার বসে বসে Bill-এ tick দেনেওয়ালা Executive-ও বিশেষজ্ঞ। ১৯৪৯-৫০ সালে ইংরেজ কর্মচারীতে ক্লাইভ স্ট্রীট ছেয়ে গেল। অভিজাত পাড়ায় বাড়িভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যেই একটা নতুন বাড়ি তৈরী হল, অমনি. ক্লাইভ স্ট্রীটের বড় সাহেবরা দালাল পাঠিয়ে দশ বছরের lease নিয়ে ফেলল। দেড়শ টাকার বাড়ির ছশো টাকা ভাড়া। আমি আপনি বাড়িভাড়া নিতে গেলে বাড়িওয়ালা নেটিভ বলে মুখ খিঁচিয়ে উঠবে।

—আপনি কোথায় কাজ করেন?

—আজ্ঞে আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীনে একজন ইঞ্জিনীয়ার।

—sorry, হবে না—আমি মার্চেণ্ট আপিসের executive চাই। লালমুখো যদি নাও হয়, বেগ্‌নে মুখো হলেও আপত্তি নেই।

যে বিলিতি ছোকরা বিলেতে সপ্তাহে দশ পাউণ্ড অর্থাৎ মাসে প্রায় ছশো টাকা মাইনে পাচ্ছিল, সে এখানে এসে পেতে লাগল কম পক্ষে সাড়ে তিন হাজার। এ ছাড়াও ফ্রি কোয়ার্টার, ছ'টা বেয়ারা আর entertainment allowance মাসে হাজার টাকা। ছোকরাগুলি হয়তো ভাবতে লাগল আরও দশ বছর আগে ভারত কেন স্বাধীন হল না?

১৯৫০ সালের ক্লাইভ স্ট্রীট Executive মুখরিত হয়ে উঠেছে। সাহেব Executiveদের সাথে আমাদের বড় একটা দেখা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালী সাহেবদের সাথে দেখা হয় প্রায়ই। ক্লাইভ স্ট্রীটের স্বাধীনতোত্তর যুগে এক পৃথক জাতের মানুষের সৃষ্টি হল। এরাই হচ্ছে "ইক্জাকিউটিভস্"। এরা প্রায় সবাই বড় লোকের

ছেলে; ছোট বেলা থেকে ইংরেজী ইস্কুলে পড়েছে। বেশীর ভাগই senior cambridge পাস—দু-এক জন বিলেত ফেরতাও আছে। এদের কোনও qualification-এর দরকার নেই, শুধু সাহেবদের মত accent-এ কথা বলতে পারা চাই, আর লাঞ্চ ডিনারে বসে গ্যালন গ্যালন হুইস্কি খেতে পারা চাই। ব্যস। দেশের বড়কর্তারা হুকুম দিয়েছেন Indian অফিসার নিতে হবে—তাই এমন ছেলেছোকরাদের যোগাড় কর, যাদের আশাতীত মাইনে দিলে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। এমন সব কিম্ভুতকিমাকার যুবকদের নিয়োগ কর, যারা সাহেবদের আশ্রয়পুষ্ট হলে নিজেদের ধন্য মনে করে। পনেরো বছর ধরে যারা চাকরি করে হাত পাকিয়ে ফেলেছে, তাদের promotion দেওয়া মুশকিল, কারণ তারা Boss দের কীর্ত্তিকলাপ সব জেনে ফেলেছে—বিশেষ করে sterling cheque কিনে বিলেতে পাঠাবার কায়দা আর entertainment-এর নাম করে মাসে আলাদা করে দু'তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করবার ফন্দি ফিকির। এমন সব লোক ধরে নিয়ে এস, যারা বাবুসাহেবদের এসব ব্যাপার জানে না, আর জানলেও সেগুলিকে smartness-এর পর্য্যায়ে ধরে নিয়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে। কিন্তু সোজা কথা হচ্ছে, টাকা দিয়ে ওদের মনোবল ভেঙ্গে দাও।

ওদের মনোবল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ওরা ছোটবেলা থেকেই সাহেবদের ইস্কুলে পড়েছে—বাংলা ভাল করে শেখে নি। দেশের মাটির প্রাণবন্ত প্রকাশকে ভাল করে উপভোগ করতে পারে নি, আর শেখে নি দেশের মানুষকে ভালবাসতে। ওদের দেখলে কষ্ট হয়। সব সময়ে কেমন যেন একটা ছন্নছাড়াভাব—একটা কৃত্রিমতার প্রলেপ দিয়ে নিজেদের ঢেকে রেখেছে। দু-কথা বলেই shrug করছে, আর ইংরেজী বুলিতে swear করছে। কিন্তু সত্যিই কি ওরা খারাপ? অনেকের সঙ্গে মিশে দেখেছি—আমার আপনার মত প্রাণোচ্ছ্বাস পূর্ণ মানুষ, কিন্তু—এক জারজ সংস্কৃতির প্রভাবে পড়ে আজ ওদের এই পরিণতি।

এই রকম অনেক সময়ে হয়। বিশেষ করে যখন কোনও শ্রেণীর লোক স্বদেশী কৃষ্টি থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদেশী কৃষ্টিকে প্রাণ-পণে আঁকড়ে ধরে। দেহের রক্ত কণিকায় রয়েছে ভাটিয়ালী, বাউল, ঠুংরী আর টপ্পা; অথচ সেই ছোটবেলা থেকে শিখতে হচ্ছে ইংরেজী সুর। সংস্কৃতির ধারায় এ এক অদ্ভুত উলটো রকমের স্রোত—এই স্রোতের টানে লোকগুলিকে জীবন তরণী উজিয়ে বেয়ে যেতে হয়—সে কী কম বেদনাদায়ক ঘটনা?

এই কৃষ্টির সংকট যে আজ হয়েছে, তা নয়—ইংরেজ আসবার পর থেকেই শুরু হয়েছিল। আজও চলেছে সমান তালে। ইংরেজরা শিল্পোন্নত দেশের লোক—তাদের ভাবধারা ও আচার ব্যবহার অন্য ধরনের। স্বভাবতঃই আমাদের গ্রামপ্রধান দেশের লোকেদের শিল্পায়নের পথে যেতে যেতে ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে, জানতে হয়েছে। অনেক ভাল জিনিসও আমরা ওদের কাছ থেকে পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমরা অনেকে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি—আর নতজানু হয়ে বলেছি—হে প্রভু, তুমি কিছু দাও। কিন্তু তাই কি হয়? Daffodils আর পদ্মফুল, টেমস্ আর গঙ্গা, সাদাম্পটন্‌শায়ার আর গঙ্গারামপুর কি কখনও এক হয়? কখনও হয় না—মহাচেষ্টা করলেও হবে না। ইংরেজরা চেষ্টা করেছিল কৃষ্টি সমন্বয় করতে, কিন্তু পারে নি। কৃষ্ণনগরের পাদ্রীরা দেশী খৃষ্টানদের এখনও বোঝাতে পারে নি যে রোমান ক্যাথলিকদের রমন কালী বললে যীশু রাগ করবেন। সাহেবগঞ্জের ক্রীশ্চীয়ানদের বোঝানো গেল না যে মনসাপূজোয় কলা ভোগ দেওয়া খৃষ্টান ধর্মবিরোধী কার্য্য।

নতুন সংস্কৃতি সমাজ বিবর্তনের ধারায় এমনিতেই আসে—তার জন্যে কারুর কাছে হাত পাততে হয় না। জার্মান, ফ্রান্স বা রাশিয়ার লোকরা ইংরেজদের কাছ থেকে শিল্পায়ত্ত পৃথিবীর কৃষ্টি শেখে নি—তাদের ইংরেজী ভাষাও শিখতে হয় নি। মানুষের জীবন ধারার রূপ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির রূপ বদলে যায়—

আর জন্যে 'হায় সাহেব, হায় সাহেব' বলে দিবারাত্রি মালাজপ করবার দরকার হয় না। এই সাধারণ সত্যটা বুঝতে না পেরে ভারতীয় Executive আর তাদের সমগোত্রীয়রা একটা আত্মঘাতী সংস্কৃতির মোড়ক দিয়ে নিজেদের ঢেকে রেখেছে। ইংরেজ বণিকরা বুদ্ধিমান। তারা বুঝলো এরাই Indianisation-এর সবচেয়ে ভাল আধার। এদের দিয়ে দু' কাজই চলবে।

এদের নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না—এরা কজনাই বা আছে—কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বেশ বড় অংশ ক্লাইভ স্ট্রিটের Executive কৃষ্টি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে বলে আমার আপনার দুশ্চিন্তা। এই কৃষ্টি যদি ছোটবেলা থেকে দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুপ্রবেশ কবাবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সারা দেশটা গোল্লায় যাবে।

এর মধ্যে একদিন সহপাঠী অখিল দত্তর সঙ্গে দেখা। অনেক বলে কয়ে ধরে ওব বাসায় নিয়ে গেল। সুন্দর ছোট্ট গোছানো সংসার। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। আধুনিকা সুন্দবী গৃহিণী। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহ দেখে গৃহিণীর কদর বুঝলাম। অখিল আলাপ কবিযে দিল। পরিচয়ে আনন্দ পেলাম। একথা ওকথার পর অখিল-গৃহিণী আট বছরের ছেলের ইস্কুল-ভর্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

তিনি বললেন, কাছাকাছি ভাল ইস্কুল নেই বলে, ছেলেকে ভর্তি করতে পারছেন না।

আমি বললাম, কেন, সামনেই তো একটা ভাল ইস্কুল রয়েছে—ছেলেকে ভর্তি করে দিন। আখিল-গৃহিণী আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন—আমার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে ওঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে। অখিল চট্ করে আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলল—আরো ভাল ইস্কুলের নাম কর। বাংলা ইস্কুলের আভিজাত্য নেই। গৃহিণী ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—তোমার সঙ্গে কথা বলা চলে না। আমি আবহাওয়াটাকে লঘু করে দেবার জন্যে হেসে

বললাম—ওঁর সঙ্গে বারো বছর ধরে তো কথা কইছেন—এমন কি খারাপ লেগেছে। অখিল-গৃহিণী সরোষে মত প্রকাশ করলেন, আপনিও আপনার বন্ধুর দলে—আপনার সঙ্গেও এ-ব্যাপারে কথা বলা চলে না। অখিল একটা ভাল সুযোগ পেল। খানিকটা মুচকি হেসে বলল—এ কিন্তু তোমার স্বামী ইনকামট্যাক্সের উকিল অখিল দত্তকে পাও নি, পৃথ্বীশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্র। যতই ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে থাকো, দশটা লাইন লিখলে এখুনি ডজনখানেক ভুল বের করে দেবে।

আলোচনাটা খুব সুস্থ পথে যাচ্ছিল না দেখে আমি মুচকি হেসে বললাম—যাকগে, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। মিসেস দত্ত, বলুন তো পাড়ার ইস্কুলের বিরুদ্ধে আপনার কি কি অভিযোগ আছে?

আধ ঘণ্টা ধরে আধুনিকা অখিল-গৃহিণী যা বললেন, তার বিশেষ কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না। তিনি যখন কথা শেষ করলেন, তখন আমার সামনে মাত্র কয়েকটা শব্দ ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল, শব্দগুলি হচ্ছে unmethodical—rustic—archaic—stupid—unmannerly ইত্যাদি।

আমাকে উত্তর দিতেই হলো। অখিল-গৃহিণীর সঙ্গে তর্কে জেতবার জন্যে নয়, ভবিষ্যতের অখিল-পুত্রদের তাদের সম্বিত-হারা জননীদের হাত থেকে বাঁচাবার একটা প্রচেষ্টা করব বলে। আমি বললাম, আপনি কি বলতে চান, ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত যত জ্ঞানীগুণী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই ইংরেজদের ইস্কুলে পড়েছিলেন? আমি তো দেখতে পাই না। আপনি হয়তো জানেন না যে আজও বাংলাদেশে পণ্ডিত বলে পরিচিত ব্যক্তিদের শতকরা পঁচানব্বই জন গ্রামের স্কুলে পড়েছিলেন।

অখিল-গৃহিণীর দম বন্ধ হবার অবস্থা। এখন কি বলা যায়? ওঁর নিজের বক্তব্য নিজেই পেশ করতে পারছিলেন না। আমি অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম। ওঁর ভেতরকার সংগ্রাম পাড়ার বাংলা ইস্কুলের সঙ্গে নয়, ওঁর সংগ্রাম সেই ইঙ্গ-বঙ্গ জারজ সংস্কৃতি পুষ্ট

মানসিকতার সঙ্গে। নিজের স্বামী অখিল দত্ত রংপুরের জেলা ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশনে চারটে লেটার্ পেয়ে পাস করেছিলেন। কিন্তু তবুও স্বামীর আচার-ব্যবহার, ভাবধারা বড্ড সেকেলে। তাঁর মনের সঙ্গে খাপ খায় না। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে ইংরেজী ইস্কুলে ভর্তি করবার জন্যে এমন ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। তার কারণ, এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলাতে হলে বন্ধুবর শ্রীমান অখিলকে যে-সংগ্রাম করতে হবে সেকথা চিন্তা করে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। গৃহিণী ছেলেকে সাহেব বানিয়ে তবে ছাড়বেন। আজকাল এরকম সংগ্রাম স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে লেগেই আছে। স্বাধীনত্তোর কলকাতায় এমন কোনও মধ্যবিত্ত সংসার নেই যেখানে এ-সংগ্রাম না চলছে। এখনও অনেকদিন এ-সংগ্রাম চলতে থাকবে—যতদিন না একটা বিরাট নতুন জাতীয় সংস্কৃতির ঢেউ এসে অখিল-গৃহিণীদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সংস্কৃতি-সংকট শুরু হয়েছে—এটা অন্তর্বর্তীকালীন একটা বিরাট সমস্যা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-রকম সংকট বহুবার এসেছে। আমি আপনি মাথা খুঁড়ে মরলেও এর হাত থেকে রেহাই পাব না—এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে সমস্যা আরও সঙ্কটাকুল হয়ে উঠবে। পরিবর্তনের যে-স্রোত ইতিমধ্যেই এসে গেছে, তাকে ঠিকমত পরিচালনা করে, জাতীয়জীবনের ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

কৃষ্টি সংকটের পেছনে ক্লাইভ স্ট্রীটে যে-পরিবর্তন এসে গিয়েছিল তার নমুনাটা একটু বোঝা দরকার। আগেই বলেছি, ইংরেজ বণিকরা বুঝতে পেরেছিল যে এ-দেশে বাণিজ্য-সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাত করতে হবে—লোভ দেখিয়ে তাদের অংশীদার করে নিতে হবে। একদিন রায়বাহাদুর

গোবিন্দলাল মুকুন্দলালকে ড্রাইডেন কোম্পানীর বড় সাহেব চিঠি লিখে পাঠালেন, 'দয়া করে একবার দেখা করলে বড়ই ভাল হয়।' মুকুন্দলাল আহ্লাদে গদ্‌গদ। ড্রাইডেন কোম্পানীর সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে? হলামই বা আমরা স্বাধীন—কিন্তু আজও ভুলতে পারি নি, সাহেবরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়, হয়তো বা অনেক ভালও। মনে মনে ঈর্ষা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু ওদের সঙ্গে টেক্কা দেবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? দুনিয়ার বাজারে ওদের কত জানাশোনা—কত বন্ধুত্ব! আমাদের চেনে কে? রায়বাহাদুর মুকুন্দলাল কোচা-কাছা সামলে সাহেবদের আপিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কি বিরাট আপিস! কত লোক কাজ করছে! কিন্তু চারিদিকে সব চুপচাপ। ঘরের মধ্যে ঢুকলে শুধু শোনা যায় টাইপ রাইটারের খটাখট্ শব্দ। তার নিজের আপিসের কথা মনে হলো—একটা পুরোদস্তুর বাজার। সত্যিই সাহেবরা অনেক কিছু জানে—ওদের শাসনক্ষমতা অনেক প্রখর—নইলে দুশো বছর ধরে সারা পৃথিবীকে পায়ের তলায় রাখল!

মিনিট খানেক দাঁড়াতেই ড্রাইডেন কোম্পানীর সাহেবের বেয়ারা এসে রায়বাহাদুরকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। এই সেই ঘর! যেখান থেকে আজও সারা দেশের কয়লার বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মিঃ ড্রাইডেন আদর-আপ্যায়নের পর বললেন, রায়বাহাদুর, আপনাকে আমরা কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর করে নেব ঠিক করেছি—আপনার মত কি?

আহা! আজ সূর্য উঠেছিল কোনদিক থেকে? আজ বাতাসটাই বা এমন মধুগন্ধী কেন?

—আমার আপত্তি কিই বা থাকতে পারে, সাহেব? এ তো ভগ্‌দীরের কথা আছে।

ড্রাইডেন সাহেব বললেন, লণ্ডন আপিস থেকে চিঠি পেয়েছি—তারা আপনার নাম approve করেছে।

—ঠিক আছে, তাহলে কত টাকার শেয়ার কিনতে হবে আমার?

সাগ্রহে মুকৎলাল জিজ্ঞেস করলেন। মুকৎলালের তখন চোখে স্বপ্নের নেশা, আর মুখ রস-সিক্ত। ড্রাইডেন কোম্পানীর দশ টাকার শেয়ার বছরে বিশ টাকা ডিভিডেণ্ড দেয়। লাখ দশেক টাকার শেয়ার পাওয়া যায় না? কিংবা পঞ্চাশ লাখ—আরও বেশী কিনতেও সে রাজী আছে।

মিঃ ড্রাইডেন বললেন, না, আমরা এখন আর নতুন শেয়ার কিছু আপনাকে দিতে পারব না। আইন বজায় রাখবার জন্যে কয়েকখানা শেয়ার আপনার নামে ট্রান্সফার করে দেব। তবে কোম্পানী আপনার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার হিসেবে দুই এক কোটি টাকা নেবে—ভাল সুদ দেবে।

রায়বাহাদুর মুকৎলালের মনটা একটু খারাপ হলো। ড্রাইডেন কোম্পানীর share-scriptগুলি ততক্ষণে ওঁর চোখের সামনে ভাসছিল। তবুও তিনি রাজী হলেন। নাই বা এলো ডিভিডেণ্ড-এর টাকা—তাঁর সম্মান তো আকাশের মত উঁচু হ'ল! অমন একটা কোম্পানীর ডাইরেক্টর হতে পারা তো যে সে কথা নয়। আর আশা রইল, যদি ধারের টাকা সময়মত পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে একদিন তিনি হয়তো ড্রাইডেন সাহেবের দোলানো চেয়ারটাতে গিয়ে বসতে পারবেন।

দুদিনের মধ্যে রায়বাহাদুর গোবিন্দলাল মুকৎলাল ক্লাইভ স্ট্রীটের শ্রেষ্ঠ বিলিতী সওদাগরী কোম্পানীর ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। আর তারই কয়েকদিনের মধ্যে তিনি এক নতুন লিমিটেড কোম্পানী float করলেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—এক কোটি টাকা। ডাইরেক্টর ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছেন, বাকী পঞ্চাশ লাখ জনসাধারণের কাছে বিক্রী করা হবে—সময় মাত্র সাত দিন। সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বিক্রী শুরু হয়ে গেল। আজ কোটিপতি রায়-বাহাদুর মুকৎলালের বাজার মূল্য হাজার গুণ বেড়ে গেছে। তিনি এখন শুধু আদা, হলুদ আর গরম মশলার ব্যবসায়ী নন্—

ড্রাইডেন কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর! যে মুফৎলাল পনেরো দিন আগে হয়তো দু-লাখ টাকার বেশী শেয়ার বাজারে বেচতে পারতেন না, সেই মুফৎলাল সাতদিনের মাথায় পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার বেচে ফেললেন। বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্-এ ড্রাইডেন সাহেবও রয়েছেন। বলাবাহুল্য এ সমস্ত প্ল্যানটাই তাঁর। তিনি জানতেন, এখন নতুন করে বিদেশীদের পক্ষে কোম্পানী শুরু করার অনেক অসুবিধে আছে—এখন কিছু করতে হ'লে ভারতীয়দের সঙ্গে নিতে হবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানীর খসরা বহু বছর আগেই তিনি করে রেখেছিলেন। কয়লার খনির যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারলে, খুবই লাভ। ভারতীয় ডাইরেক্টর বা অংশীদার না থাকলে নতুন ইম্পোর্ট লাইসেন্স পাওয়া মুশকিল। তাই সাহেব রায়বাহাদুর মুফৎলালের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করলেন। একটা লাখটাকার ডাইরেক্টরীর পরিবর্তে বছরে দশ-লাখ টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে নিলেন।

দেশের বড় কর্তারা সাহেবদের বলে দিয়েছেন—দেখো হে বাপু! তোমরা পাকা ব্যবসায়ী, তোমাদের ছাড়া দেশ চলবে না। কিন্তু তোমরা আমাদের দেশের লোকদের সঙ্গে নিয়ে কাজকর্ম কর; তোমাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে। তোমরা ৪৯% শেয়ার রাখ, আমাদের দাও ৫১%। আমরা স্বাধীন হয়েছি—আমাদের একটুখানি মর্যাদা দাও; আর সেই মর্যাদাকে আমাদের চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে দাও। মাত্র তো দু'পার্সেণ্ট বেশী শেয়ার চাইছি—খুব বেশী কিছু চাইছি কি?

যারা খুব বড় শিল্পপতি—অর্থাৎ রায়বাহাদুর মুফৎলালের মত উঁচুদরের ব্যবসায়ী, তারাই সাহেবদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল। তারা নিজেরাও দু-চারটে বড় বড় শিল্পে হাত লাগাল। বিলেত থেকে টেকনিশিয়ান এল।—লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ফরমুলা আর ব্লুপ্রিণ্ট

কেনা হল। ক্লাইভ স্ট্রীটের জীবনে নব-জাগরণ এল।—কাগজে কাগজে নতুন লিমিটেড কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। যাদের হাতে পয়সা আছে, তারা শেয়ার কিনতে লাগল। ইংরেজরা তো আছেই—জার্মান, ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান সবাই তাদের দালাল পাঠাতে লাগল—তোমাদের যা চাই, আমরা দেব। আমাদের লোকজন গিয়ে তোমাদের কাজ চালাবে। ইঞ্জিনীয়ার আমাদের, জেনারেল ম্যানেজার আমাদের। কমপক্ষে দশ বছরের কণ্ট্র্যাক্ট চাকরি চাই—ব্যস তা হ'লেই হল। পঞ্চাশ লাখ নগদ টাকা তোমরা দেবে—আমরা শিল্পের গূঢ় তত্ত্বগুলো সব দেব—চাই কি যন্ত্রপাতিও আমাদের দেশ থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের শেয়ার দু'পার্সেণ্ট বেশী চাই, দেবো, কিন্তু কর্তৃত্ব আমাদের—অর্থাৎ আমাদেরই ব্যবসা, তোমরা এসে বসবে, চা, পান খাবে। মাসে একটা করে মিটিং করবে। তার জন্যে কিছু টাকা পাবে—আর লাভ হ'লে তার অংশ পাবে। কিন্তু খবরদার, মাতব্বরি করতে পারবে না। পাঁচ বছরের মধ্যে তোমাদের দেশের কিছু কিছু লোককে ফিটার, মিস্ত্রী তৈরী করে দেব। দরকার হলে দু-চারজনকে আমাদের দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। আর চাই কি?

কিন্তু এখনও কলকাতায় শিল্পায়নে যোগ দেবার মত পয়সা-ওয়ালা লোক খুবই কম। বলতে গেলে বনেদী বড়লোকেরা নতুন আভিজাত্যের ছাপ লাগানোর জন্যে শিল্পপতি হ'লো। এদের বাইরেও বহু পয়সাওয়ালা রয়েছে—যারা যুদ্ধের সময় কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে। তারা দেশের শিল্পায়নে যোগ দিতে রাজী নয়—তাদের কথা হচ্ছে, তৈরী মাল রাখব—সুযোগ বুঝে বেচে দু-পয়সা কামাব। দশ, বিশ, পঞ্চাশ লাখ লাগাতে রাজী আছি।

এইটেই হচ্ছে ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতির একটা বিশিষ্ট ধারা। মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন কতকগুলি লোকের হাতে প্রচুর অর্থ জমেছে। দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে গেলে যে খানিকটা

ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন হয়, তা বেশীর ভাগ ধনীরা নিতে রাজী নয়। আজ দশ লাখ টাকা লাগিয়ে পাঁচ বছর পরে তার থেকে লাভ পাওয়া যাবে, অত ধৈর্য তাদের নেই। আজ টাকা লাগিয়ে কালই বেশ কিছু আমদানী করবার উপায় থাকলে, সুড়সুড় করে কোটি টাকা বেরিয়ে আসবে।

এর ফল হলো এই যে দেশের ধান, চাল, গম, চিনি, নিয়ে কাটকা শুরু হলো পুরোদমে। চিনিকলের মালিক নিজেই শ্যালক, ভাগ্নের নামে এজেন্সি নিয়ে মিল থেকে মাল সরিয়ে পোস্তা, বড়বাজার আর চীৎপুরের গুদোমে রাখতে লাগল। বাজারে হাহাকার! আজ চাল নেই, কাল চিনি নেই। লোকের মনে গভীর নিরাশা, স্বাধীনতা পেয়েই ভাল হ'লো, না ইংরেজ রাজত্ব ভাল ছিল। এমন প্রশ্নও স্বাধীন দেশের লোকরা কখনও করে? কিন্তু স্বাধীনতা পাবার তিন বছর পরেই আমাদের দেশের লোকের মনে সে-প্রশ্ন জাগল।

ব্যবসায়ীদের মাল পাচারের মনোবৃত্তি একশ্রেণীর নতুন লোকের সৃষ্টি করল। এরা ইংরেজ আমলে জেল খেটেছে, ভারী ভারী বক্তৃতা করেছে, জীবন আহুতি দিয়েছে। আজ এদের ভারী মোকা। চাল, চিনি, কয়লা পেতে হলে পারমিট চাই। পারমিট সবাই পায় না। শুধুমাত্র যাদের বড়কর্তাদের সাথে নাক শোঁকাশুঁকি আছে, তারাই পায়। তারা ব্যবসা জানে না—কি করে কি করতে হয় তা তাদের জ্ঞানের বাইরে। কিন্তু তাদের টাকার প্রয়োজন আছে। এতদিন এত কষ্ট করেছেন, এখন একটু ভাল খাওয়া-পরার প্রয়োজন আছে, বৈকি? মাল পাচার করনে-ওয়ালারা এদের সঙ্গে জুটে গেল।

পারমিট যোগাড় করে দিন, থোক টাকা মিলবে। পারমিট পেল রণজিৎ ঘোষ, মাল বেচে লাখ টাকা কামাল সুরজমল কিশোরীমল।

একদিন ক্লাইভ স্ট্রীটে সুরজমল কিশোরীমলের সঙ্গে দেখা।

কুশল আদান-প্রদানের পরই কিশোরীমল আমাকে তাঁর ক্লাইভ স্ট্রীটের গদিতে আমন্ত্রণ জানালেন।. খুব জরুরী কথা আছে।

—কি কথা বলুন না, আমি বললাম।

—ব্যবসার ব্যাপারে আপনার সাথে দু-একটা কথা আছে।

আমি তো অবাক, লক্ষপতি কিশোরীমল আমার সঙ্গে কি পরামর্শ করবেন? আর তিনি ভাল করেই জানতেন যে আমি ব্যবসাতে বকলম।

যাই হোক সন্ধ্যেবেলা ক্লাইভ স্ট্রীটে কিশোরীমলের গদিতে গেলাম।

—বাবুজী, আপনার কর্তাদের সঙ্গে জানাশোনা আছে?

আমি বললাম, না, তবে একে ওকে ধরে জানাশোনা করতে কতক্ষণ?

—একটা লোহার পারমিট বের করে দিতে পারেন? হাজার বিশেক টাকার কোটা হ'লেই হবে। আপনাকে দশ হাজার টাকা নগদ দেব।

আমি বললাম, বিশ হাজার টাকার পারমিট-এ দশ হাজার টাকা দেবেন—ব্যাপার কি?

শুনে কিশোরীমল হো হো করে হেসে উঠলেন, বাবুজী, বিশ হাজার টাকার পারমিট পেলে আমি কম করে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ করব—দেখুন না চেষ্টা করে বাবুজী। বলেই তিনি একখানা লেটার হেড্ আমার হাতে দিলেন। —এই নামে পারমিট বের করবেন।

আমি হাত জোর করে কিশোরীমলের কাছে মাপ চেয়ে বললাম, কিশোরীবাবু, আমার সাথে কোনও কর্তা ব্যক্তিদের চেনা জানা নেই—আমি পারব না। শুধু শুধু আপনি আমার কাছে মিথ্যে আশা করে বসে থাকবেন কেন?

কিশোরীমল ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি কল্পনাই করতে পারেন না যে আমার মত একজন শিক্ষিত লোকের বড় কর্তাদের সাথে

দহরম্ মহরম্ নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বাবুজী আপনি কোনও কাজের নন্, আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না। আপনার জন্যে আমার খুব আপশোষ্ হয়। এত চালাক চতুর লোক, অথচ পয়সা কামানোর ফিকির জানেন না।

বলতে গেলে ১৯৪৮ সাল থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে—তাকে আমি বলি পারমিট-এর যুগ। এ-যুগে পারমিট ধর্ম, পারমিট স্বর্গ—তারই মহিমা প্রচার একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের প্রধান উপজীব্য।

সেটা শ্রাবণ মাস হবে—অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে—আকাশে ঘনঘটা। একটা সরকারী আপিসের নীচে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ হৃষিকেশ গাঙ্গুলীর সাথে দেখা। হৃষিকেশ আমার বাল্যবন্ধু। খুব ভাল ফুটবল খেলত বলে ওকে ছোটবেলায় সবাই সমীহ করে চলতাম। ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়ে নি। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। শুনেছি, যুদ্ধের সময়ে দু-হাতে পয়সা কামিয়েছে। আমাকে দেখেই হৃষিকেশ জড়িয়ে ধরলো। কথাবার্তা অনেক হল—অনেকদিন পর দেখা। পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি আজকাল কি করছ ?

ও বলল, লোহা লক্করের ব্যবসা করছি।

আমি কিছু বলবার আগেই হৃষিকেশ একটা নোট বই দেখে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, বর্দ্ধমান কিংবা বাঁকুড়ার গ্রামে তোমার কোনও জানাশোনা লোক আছে ?

—তোমার উদ্দেশ্য কি বল ?

—উদ্দেশ্য ব্যবসা—আমি কয়েকটা থানার নাম দেব—সেই সব থানা এলাকার লোক হওয়া চাই—আর তাদের জমির settle-ment-এর দাগ নম্বর থাকা চাই।

চেপে ধরতে হৃষিকেশ যা বলল, তা হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা থানার জন্য লোহার পারমিট দেওয়া আছে—লোকদের ঘর বাড়ি করবার জন্যে। যাদের জন্যে পারমিট, তারা কেউই লোহা পায়

না—ক্লাইভ স্ট্রীটেই পারমিটগুলি কেনা-বেচা হয়ে যায়! তবে পারমিটগুলি বের করতে হলে নির্দিষ্ট এলাকার লোকদের নাম ঠিকানা চাই—enquiry-তে টিঁকলেই হয়। হৃষিকেশ চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা কামিয়েছে—এখন বর্দ্ধমান বাঁকুড়া জেলায় জাল বিস্তার করবার চেষ্টা করছে।

লোহার পারমিট নিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে এত তোড়জোড় আর হৈ-হট্টগোল, যে আপনি বেলা বারটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত রিজেন্ট কাফেতে এক কাপ চা খেতে বসতে পাবেন না—জায়গা নেই। পারমিট পাচ্ছে পঁচিশ জন—দালাল রয়েছে তিনশো পঞ্চাশ জন—informer আছে দু-শো তিয়াত্তর জন। মোটকথা প্রায় শ পাঁচেক লোক রোজ পারমিট-এর পেছনে ছুটোছুটি করছে। অসুবিধে নেইঃ ৫০০% লাভ; সবাইকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েও পারমিটওয়ালা ২৫০% পেয়ে যাচ্ছে। এমন ব্যবসা সারা ভারতে কেন, পৃথিবীতে নেই। যারা এই সব হুজ্জোৎ করে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেকের সাথে আমার মুখ-চেনা আছে। পাঁচ বছর আগে থেকেই আমি তাদের ক্লাইভ স্ট্রীটে দেখছি। তখন লোহার পারমিট পাওয়া যেত না; অন্য ব্যবসা ছিল। অনেকের হাতেই পয়সা ছিল। যাদের সে পয়সা এখনও আছে, তাদের সাজ-সজ্জা দেখে মালুম হবে। হয় ট্রপিক্যালের স্যুট, আর না হয় গিলেকরা পাঞ্জাবী। যাদের পয়সা যুদ্ধোত্তর ক্লাইভ স্ট্রীটে হারিয়ে গেছে, তাদের অবস্থা শোচনীয়; দালালীর কোঠাতে তাদের সর্বনিম্নে স্থান। সেই পাঁচ বছর আগেকার সুসময়ের কেনা ফুলপ্যান্টগুলো তালি দিয়ে পরা, আর না হয়তো আস্তিন গোটানো ময়লা পপ্লিনের সার্ট আর ধুতি। দালালদের পোশাক ভাল হওয়া চাই! তাদের মুখের কথাই সব! যার পোশাক-আসাক ভাল নয়, তার মুখের কথার মূল্য কতটুকু? ওদের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবি—এরপর কি?—অর্থাৎ লোহার পারমিট যেদিন উঠে যাবে, সেদিন এরা কি করে খাবে?

অবিশ্যি বলতে পারেন লোহা না থাকে অন্য কিছু একটা থাকবে। সেই জেলখাটা ভদ্রলোকরা একটা কিছু ফন্দীফিকির বের করে ফেলবেন! সোজাসুজি না হয়, বড় কর্তাদের ধরে একটা কিছু কন্ট্রোলের আইন করিয়ে নেবেন। তাই হৃষিকেশ গাঙ্গুলীর মুখে অমন হাসি দেখলাম। কিশোরীমলের মুখে কোনও হাসি নেই, কিন্তু দালালরা রয়েছে ওর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে। আগে জানতাম না—নাহলে রিজেণ্ট কাকের কথাটা বলে দিলেই হত। হয়তো বা তিনি এতক্ষণে এসে গেছেন সেখানে, এবং তাঁর মুখে ফুটেছে হৃষিকেশের হাসি।

দিন সাতেক পরের কথা। একদিন বন্ধুবর অসিত সেনের বাড়ি গেছি। তখন সন্ধ্যে সাতটা হবে। গিয়ে দেখি সেখানে আট দশ জন লোক বসে আছে। আমাকে দেখে অসিত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘরে ঢুকতেই ইশারা করে বারান্দায় ডেকে নিয়ে বলল—ভাই এখন রক্ষে কর। কি করে এরা জেনেছে, ইমপোর্ট লাইসেন্স দেবার কর্তাদের মধ্যে আমার একজন কেউকেটা আত্মীয় রয়েছেন। একটু বলে কয়ে দিলেই বেশ মোটা দাগের একটা লাইসেন্স পাওয়া যায়। আর তার জন্যে ওরা আমাকে দু'হাজার, পাঁচ হাজার এমনকি দশহাজার পর্যন্ত দিতে রাজী আছে—এখন উপায়?

আমি বললাম—এই তো মোকা—দু-পয়সা কামিয়ে নাও।

—বাজে কথা বলো না, অসিত বলল।

আবার দুজনাতে বসবার ঘরে এলাম। দয়ানন্দ বাবু বলে এক ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ করে বললেন—স্যার আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে—যদি দয়া করে একটু শোনেন।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে তিনি বললেন, আপনার বন্ধুকে বলে কয়ে দিন না—একটা এক লাখ টাকার পেনিসিলিনের লাইসেন্স বই'ত নয়। গলাটা আর একটু খাটো করে বললেন—বাঙ্গালীরা

তো লাইসেন্স পাচ্ছেই না। ওঁর মেসোমশায় বাঙালী বলে যদি একটু দয়া করেন তাহলে ভাল হয়।

আমি বললাম, আমি কিছুই জানি না, আমি ওর বন্ধু বটে; কিন্তু কস্মিনকালে ওর মেসোকে দেখি নি। আমি মশাই কিছু বলতে পারব না। আপনি নিজেই বলে দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন। আচ্ছা মশাই, আপনারা মেসোমশাইয়ের শ্যালিকাপুত্র অসিত সেনের খবর পেলেন কোথায়?

দয়ানন্দ বাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, খবর রাখতে হয় স্যার, খবর রাখতে হয়, এই দেখুন—বলে তিনি পকেট থেকে একগাদা ঠিকানা বের করলেন। হালফিল যত সব বড় কর্তা কলকাতায় আছেন, তাদের সব আত্মীয়দের ঠিকানা। এমন কি পাটনা ভুবনেশ্বরে আছেন এমন আত্মীয়দের নামও রয়েছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ভাবলাম এরা কি গয়ার পাণ্ডাদের মত বড়কর্তাদের পরিবারপঞ্জী রাখছেন? কি বিরাট organisation আর কি নিখুঁত সব ব্যবস্থা। সোনার চাঁদরা সব যাবেন কোথায়? ধরা একদিন দিতেই হবে!

লোহার পারমিটের মত ইম্পোর্ট লাইসেন্স নিয়েও ক্লাইভ স্ট্রীটে তখন মারামারি কাড়াকাড়ি চলছে। হাজার হাজার লোক এর পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার কত টাকার পেনিসিলিনের লাইসেন্স আছে? এক লাখ টাকার? কি দরকার সব ঝামেলা করে, এই নিন সোজাসুজী পঁচিশ হাজার টাকা। লিখে দিন যে আপনি আমার হয়ে পেনিসিলিন ইম্পোর্ট করে দিচ্ছেন। আগাম টাকা নিয়ে মালটা বেচে দিয়েছেন। এও সেই লোহার পারমিটের মত ব্যাপার। লাইসেন্স পেয়েছে East West Company, মাল এসে উঠল Lambodar Companyর ঘরে। East West Company-র মালিক জেলখাটা স্বদেশী বাবু। তিনি জীবনে যা কল্পনা করতে পারেন নি, তাই হল! এক টুকরো কাগজ সম্বল করে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার হতে লাগল।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেমন প্রস্তর যুগ বা লৌহ যুগ আছে, কাব্যের ইতিহাসে যেমন রোম্যান্টিক যুগ আছে, ক্লাইভ স্ট্রীটের ইতিহাসে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের যুগকে তেমনি করে 'কোটাযুগ' বলা চলে। যারা এ-যুগের কর্ণধার, তারা রাতারাতি ফেঁপে ফুলে উঠল। কোথায় হুগলী জেলার কোনও অখ্যাত পল্লীগ্রামের লোক—পাঁচ বছর জেল খেটেছিলেন। তখনকার অবস্থায় সত্যিই তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। কিন্তু আজ তিনি পরিবর্তিত পরিবেশে একজন কোটাযুগের কর্ণধার। এরই মত কয়েক শো লোক মিলে ক্লাইভ স্ট্রীটের আবহাওয়াটাকে বিষিয়ে তুলেছে। হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমানের এই সব পাণ্ডারা মিলে বড়কর্তাদের বললেন—দেখুন মশাই, গ্রামই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি—গ্রামের লোকরা সুযোগ সুবিধে কিছুই পাচ্ছে না। আপনারা প্রত্যেকটি জেলার জন্যে সব জিনিসের আলাদা আলাদা 'কোটা' ঠিক করে দিন। বড় কর্তারা বললেন—লোহা-লক্কর, চাল, ডাল, গম, চিনি, সব কিছুরই তো কোটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আবার চাই কি? ভদ্রলোকরা বললেন—ইস্কুল কলেজের 'সিট', 'স্কলারসিপ', হাসপাতালের 'বেড', ট্যাক্সির পারমিট সব কিছুরই 'কোটা' চাই। ঘন ঘন সভা বসল। কর্তারা প্রমাদ গনলেন। এমন করে সব ব্যাপারের 'কোটা' বেঁধে দেওয়া কি সম্ভব? কিন্তু উপায় নেই। ইলেকশন্ এসে গ্যাছে—এদের চটালে চলবে না। কোটা ভাগ করে দেওয়া হল। মুসলিম লীগ আমলের চাকরি reservation-এর মত ব্যাপার। কিন্তু উপায় কিই বা আছে? যাদের লেজ ধরে নির্বাচন সাগর পার হতে হবে, তাদের কথা এখন শুনতেই হবে।

একদিন ট্রামে আসতে আসতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর ভাই ফার্স্ট ডিভিশনে আই, এস, সি পাস করেও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারে নি। ছেলেটি ভাল—ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ে। ভদ্রলোক বলছিলেন—এমন দেশ হয়েছে, মেধাবী

ছেলে ইচ্ছে মত পড়তে পারে না—এ কি স্বাধীনতা হল বলতে পারেন? আমি মাথা নাড়ছিলাম। হঠাৎ পাশের বেঞ্চি থেকে এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন—কি বললেন? মেডিক্যাল কলেজের সীটের কথা বলছেন তো? কলকাতার ছেলেদের জন্যে এখনও ষোলটি সীট খালি পড়ে আছে। তারপর গলার স্বর নামিয়ে আমার কাছে মুখটা এনে বললেন—কিছু এদিক-ওদিক করতে পারলে সীটের অভাব নেই—বুঝলেন মশাই? আমিও তো ছেলের জন্যে একটা সীট করে নিয়েছি—যান না মশাই পতিত পাবন বাবুর কাছে। সরাসরি গেলে হবে না—একজন জানাশুনো কারও 'through' দিয়ে যাবেন—সেখানেও আক্কেল সেলামী যাবে কিছু। কিন্তু সীট পাবেন ঠিকই।

ক্লাইভ স্ট্রীটের এই 'কোটাযুগে' শাসনতন্ত্রের মধ্যে এল নিদারুণ শ্লথতা। সবাই সব জিনিস সহজ ভাবে নিতে লাগল —যেনতেন প্রকারেণ কর্তব্য করার স্বাধীনতাই যেন আমরা অর্জন করেছি। দেশ এখন স্বাধীন, আমাদের কর্মক্ষমতা দশ গুণ বাড়িয়ে স্বাধীনতার মূল্যবোধকে বাড়িয়ে তুলব, সে-ইচ্ছে আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। যেখানেই যাবেন, একজন via-media না হলে কাজ হবে না। হবে কেন? আপনার কি হেড ক্লার্ক বা বড়বাবুর সাথে আলাপ আছে যে আপনি গেলেই কাজটা তিনি করে দেবেন? আসল কথা এই সব মধ্যমণিরা সারা শাসন-তন্ত্রটাকে এমন করে কুক্ষিগত করে ফেলেছেন, যে তাঁরা ছাড়া আর কেউ গেলে কোনও কাজ হবে না! মধ্যমণিদের অসীম ক্ষমতা—কোটাযুগের নেতাদের কাজটা আগে করে দিতেই হবে, কারণ তাঁদের সঙ্গে কর্তাদের দহরম্ মহরম্ রয়েছে। বড় অফিসাররা ভাবতে লাগলেন, কর্তাদের নেক নজরে পড়বার রাস্তা এরাই দেখাতে পারেন, এদের চটালে চলবে কেন? ছোট অফিসাররা

বড়দের পথ চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আমাদের কি? মহাজনো গতঃ যঃ পন্থা। সত্যি এখন এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বড়কর্তাদের ইয়ার দোস্ত দলীয় লোকরা জাঁদরেল কর্মচারীদের চোখরাঙাতে লাগল—খবরদার, যা বলছি, তা যদি না হয় তো দেখে নেব, না হয়তো confidential report টির দফা সেরে দেব।

একদিন কাগজে দেখলাম, এক জেলা শাসকের সঙ্গে স্থানীয় নেতাদের সংঘর্ষ বেধেছে। ভদ্রলোকরা নাকি জেলার শাসন ব্যবস্থায় নাক গলাতে চেয়েছিলেন। শাসক খেপে উঠলেন। শাসনব্যবস্থার জন্য তিনি সরকারের কাছে দায়ী। তিনি নেতাদের হটিয়ে দিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর কাজকর্মে অহেতুক বাধা দান করতে মানা করে দিলেন। আর যাবে কোথা! এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমরা জেলার মাথার উপর বসে আছি—ক্লাইভ স্ট্রীটের বড় কর্তারা আমাদের ডেকে কানে কানে কথা বলেন, আর কিনা তোমার মত চুনোপুঁটি আমাদের কথা শুনবে না?

কয়েকদিনের মধ্যেই উপর থেকে জেলাশাসকের কাছে ফতোয়া এল—স্থানীয় নেতাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করা তাঁর অন্যায় হয়েছে—ভবিষ্যতে যেন এমনটা আর না হয়! জেলার কর্তা দেখলেন, শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে এল বলে—এখন মানে মানে চাকরি থেকে রিটায়ার করাটাই যুক্তি-সঙ্গত। এর পর আর মান সম্মান বলে কিছুই থাকবে না।

দেশপ্রেমিকদের প্রেমোচ্ছ্বাসে তখন ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীটের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম। তাদের ক্ষমতার লালসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শাসন ব্যবস্থা বিকল হবার অবস্থা। ছোট, বড়—সবাইর মুখে এক কথা—দেশের শাসন যন্ত্রের যা অবস্থা, তাতে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা অসম্ভব। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য করাও আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। ছোট ব্যবসায়ীদের দুঃখ আর অসুবিধার অন্ত রইল না।

একদিন আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক বললেন—

হাজার পাঁচেক টাকা ধার কর্জ্জ করে ছোট্ট একটা কন্‌ট্রাক্ট-এর কাজ শুরু করেছিলেন—কিন্তু তিন মাস হয়ে গেল, বিলের টাকা পাচ্ছেন না। টাকাটা না পেলে বাকী কাজ করতে পারবেন না এবং তাহলে সিকিউরিটির টাকাটাও মাঠে মারা যাবে।—'ভাবুন তো ভাই আমার অবস্থাটা কি? যার কাছ থেকে টাকা এনেছি, তাকেই বা দিই কি, আর আমিই বা সংসার চালাই কি করে?'

কি আর করি, ভদ্রলোকের সবিশেষ অনুরোধে তাঁর সঙ্গে ক্লাইভ স্ট্রীটের একটা আপিসে গেলাম। বলা বাহুল্য সেখানে কারুরই সাথে আমার চেনা নেই। ভাবলাম, সব ব্যাপারে চেনা থাকতেই হবে, এমন কথা কি আছে? একজন তার ন্যায্য পাওনা আদায় করবে, তাতে আর চেনা-জানার প্রয়োজন কি?

সিঁড়ি বেয়ে আপিসের ভেতর ঢুকতেই, বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দু'জন ভদ্রলোক ছুটে এলেন।

—কি স্যার, বিলটিল আটকেছে নাকি? কিসের বিল—রাস্তা কনস্‌ট্রাকসান, ইলেকট্রিকের পোষ্ট পোঁতা—না রেফিউজীদের বাড়ি তৈরী? কত টাকা? বিল পাস হয়েছে কি?

—আপনারা কি এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আজ্ঞে না। মাথা চুলকাতে লাগলেন একজন।

আমি বললাম, তাহলে, আপনারা কি করতে পারেন?

আর এক ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে স্যার, জানাশুনো আছে, চলুন রাখহরিবাবুর কাছে নিয়ে যাই, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন।

ওদের কথা না শুনে, ডিপার্টমেণ্টের ভেতরে ঢুকে বড়বাবুর কাছে গেলাম। বড়বাবু তখন পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে রসালো গল্প করছিলেন। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন। পুরো দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও যখন তাঁর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না, তখন বাধ্য হয়েই বার তিনেক গলা

খাঁকারী দিয়ে সবিনয়ে কথাটা পাড়তে চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোক যখন দেখলেন আমি নাছোড়াবান্দা, তখন দয়াপরবশ হয়ে আমার দিকে ঘুরে বসলেন। তারপর সব শুনে তিনি বললেন, দিন তিনেক বাদে আসবেন, আমি সব দেখে রাখব। যে-ভদ্রলোকের বিল, তিনি বললেন—স্যার, আমি অন্ততঃপক্ষে ছত্রিশবার আপনার কাছে এসে এই একই উত্তর পেয়েছি।

—তা পেয়ে থাকবেন হয়তো, বিল তো আর একটা দুটো নয় যে আমার মুখস্ত থাকবে? বড়বাবু বললেন।

যাই হোক, দু-তিন দিন বাদে আবার ভদ্রলোককে নিয়ে বড়-বাবুর কাছে গেলাম। সেদিন তাঁর মনটা কেন যেন একটুখানি নরম ছিল। ফাইলটা বেয়ারাকে দিয়ে আনালেন। সব দেখে-শুনে বললেন—আপনার বিল তো দেখি পাস হয়ে আছে প্রায় দেড়মাস হল—এখন এটাকে payment-এর জন্যে অন্য ডিপার্ট-মেণ্টে পাঠাতে হবে—আমি আজকেই পাঠাচ্ছি।

—টাকা পেতে আর ক'দিন দেরি হবে তাহলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তা এমন আর দেরি কি? ধরুন আর দিন পনেরো।

ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ফিরে এলাম। সারা রাস্তা তিনি চুপ করে থাকলেন। আমাকে বিশেষ কিছু আর বললেন না, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিল পেতে তখনও যা দেরি আছে, তাতে করে তাঁর ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি ভাবলাম, রাখহরিবাবুকে ধরলেই বোধ হয় ভাল ছিল—হয়তো বা কিছু খসত; কিন্তু ব্যবসার আকাশ থেকে একেবারে বিচ্যুত না হয়ে রাখহরিবাবুর জন্যে কিছু খসাটাই কি ভাল ছিল না? কি হবে সততা আর সাধুগিরি দিয়ে? শত হলেও রাখহরিবাবু তো টাকাটা আদায় করে দিতে পারতেন। বলব নাকি ভদ্রলোককে তাঁর কাছে যেতে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না। এমনি করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোজ হাজার হাজার লোককে অন্যায়

আর অসত্যের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে—এ কি কম মর্মন্তুদ ব্যাপার ?

কিন্তু এভাবে আমার আর ক'দিন চলে ? রোজ ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীটকে একবার দেখতে আসি—ওর সঙ্গে অন্ততঃ একটি-বার দেখা না হলে রাত্তিরে ঘুম হয় না। অথচ পকেটে একটিও পয়সা নেই, আশা ছাড়তেও পারি না—যদি ছলনাময়ী আমার জন্যে সঙ্গোপনে কিছু কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে—মায়াবিনীর তো লীলার অন্ত নেই ! আমি সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যে-শ্রেণীর লোকেরা সামনের উঁচু হর্ম্যমালার দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে—পর্দার ওপরে নায়ক-নায়িকার অভিনয় দেখে নিজেদের নায়কের জায়গায় বসিয়ে নায়িকার সঙ্গে মধুকূজনের আবেশ অনুভব করে ! আমি নিচের দিকে তাকাতে পারি না—সব সময়ই উপরের দিকে দৃষ্টি—যদি একদিন পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সমুদ্র সাঁতরে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুমন্ত রাজপুরীতে গিয়ে পৌঁছতে পারি ! আমার মত আরও হাজার হাজার বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত একই ভাবে চলছে। সাধারণ চাকরি-বাকরিতে পোষাবে না—হয় এক ঘা মেরে বড়লোক হও, আর না হলে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াও !

উমা আজকাল আর ক্লাইভ স্ট্রীটে আসে না। পাড়ায় একটা স্টেশনারী দোকান দেবার চেষ্টা করছে। দেবেনদার সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় না ! আমাদের সেই বিনয় গুপ্তর তো দাঙ্গার পরে আর কোনও খোঁজই পাই নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-র মধ্যে বহু বন্ধু-বান্ধব, জানাশোনা লোককে ছলনাময়ী পথ ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে, তার ঠিক নেই !

১৯৫১ সালের শরৎকাল হবে। একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের পুকুরটার ধারে বসে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবছি—সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে—শীতের সান্ধ্য আমেজটা কেবল কিছু কিছু শুরু

হয়েছে। লোকজন বড় একটা কেউ নেই। হঠাৎ যেন মনে হল ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট আমার মানস প্রিয়ার রূপ ধরে আমার খুব কাছে এসে বসল।

—তুমি কে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আমি ছলনাময়ী—আচ্ছা আমাকে তুমি এত ভালবাস কেন বল তো?

—তা দিয়ে তোমার প্রয়োজন কি?—এইটুকু জেনে রাখ যে ভালবাসি কিন্তু মোহ নেই।

—তুমি আমাকে তো ভাল করে জান—যারা আমাকে ভালবাসে তাদের জীবন নিয়ে কি ছিনিমিনিই না আমি খেলি!

—জানি; তোমার ইতিহাস আমার অজানা নেই—নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে তোমার জুড়ি মেলা ভার!

—তোমার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়, ছলনাময়ী বললে।

—কেন?

—তোমাকে নাগালের মধ্যে পাই না বলে—তোমার দৈন্যের কথা আমি জানি। কিন্তু তবুও তো তুমি আমার কাছে কিছু চাও না—

—যাকে ভালবাসা যায় তার কাছে কি কিছু চাওয়া যায়? সে নিজে থেকে যতটুকু দেয় তাই তো ভাল।

—তোমার কি লোভ নেই—কোনও প্রয়োজন নেই?—কেন তুমি অমন অভিমান করে থাক?

—বলেছি তো, আমার কোনও মোহ নেই। আমি তোমার নিষ্ঠুরতার ইতিহাসটাকে একটু ভাল করে পর্যালোচনা করতে চাই—তা থেকে অনেক অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা ছলনাময়ী, তোমার কি ভালভাবে, ভদ্রভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

—ও! ছলনাময়ীর স্বর যেন গাঢ় হয়ে এল—তোমাকে বলতে বাধা নেই, মাঝে মাঝে ভালভাবে বাঁচবার কি প্রবল আগ্রহ যে আমার মনকে দোলা দেয় তা আর কি বলব? কিন্তু এমন এক

অবস্থা এবং ব্যবস্থার মধ্যে আছি, যে আমার ইচ্ছে মত চলবার উপায় নেই। কোনও এক দুর্বার শক্তি যেন আমাকে এই মানুষ ঠকানোর কাজে লাগিয়েছে। বল তো কার ভাল লাগে এই অন্তহীন ছলনা করা ? . তোমাকে একটা অনুরোধ করব ?—

—বল, আমি বললাম।

—তুমি এখানে আর এসো না—দোহাই তোমার, শেষকালে তোমাকেও যদি ছলনা করে বসি, তাহলে আমার দুঃখের অন্ত থাকবে না, ছলনাময়ী বলল।

—তোমার ছলনাকে আমি ভয় পাই না—তোমার ছলনার রূপ-বন্যায় অবগাহন করব বলেই তো তোমার কাছে আসি। তোমার কাছে চাওয়ার বা পাওয়ার আমার কিছুই নেই, আমি বললাম।

ছলনাময়ী চলে গেল। জানি না কেন, মনে হল এইবার ও আমাকে নিয়ে একটু খেলতে চায়—আর ঠিক হলও তাই।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকে একদিন ক্লাইভ স্ট্রীট দিয়ে আসছি, হঠাৎ একজন বিদেশী সাহেবের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক একটা আপিসের ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারলাম, ইংরেজ নয়, কন্টিনেণ্টের লোক। এটা সেটা বলবার পর সাহেবকে নিয়ে রিজেণ্ট কাফেতে গিয়ে বসলাম। সাহেব বললেন—আমার নাম Hartmann, আমি ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে এসেছি—আমার কাছে একটা খুব ভাল ওষুধের এজেন্সী আছে। যুদ্ধের পর আমাদের দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে জান তো ? একটা ফ্যাক্টরী ভেঙ্গে চারখানা হয়েছে, বাপ-মা থাকছেন রাশিয়ান-দের আওতায়, ছেলেমেয়েরা থাকছে আমেরিকানদের আওতায়। আমি আমেরিকান জোন-এ ছিলাম। ওষুধের ফ্যাক্টরীর এক সাহেব যুদ্ধের আগে তোমাদের দেশে ছিলেন—তাঁরই এক পূর্বতন ভারতীয় কর্মচারীর কাছে তিনি একখানা চিঠি লিখে দিয়েছেন—আমাকে একটু বাতলে দাও তার আপিসটা কোথায়।

আমি বললাম, সাহেব, যে-ঠিকানা নিয়ে এসেছ, সে-ঠিকানায় চার শ পঞ্চাশটি আপিস রয়েছে, তার ভেতর থেকে ধীরেন বোসকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়—আর তা ছাড়া বোস এখন বেঁচে না মরে, তারই বা ঠিক কি আছে!

হার্টমান রুমাল বের করে চোখ মুছে বললেন, তা হলে উপায়? আমি তো কাউকে চিনি না— তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও না? ওর চোখে মুখে একটা হতাশার ছাপ।

হঠাৎ ক্লাইভ স্ট্রীটের বাতাসটা এই মুহূর্তে এমন হালকা লাগছে কেন—আড়াই বছর বাদে কি তাহলে ছলনাময়ী আমার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে? কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে যেন লাখ-টাকার স্বপ্নের একটা আভাষ পেলাম! একটা বিরাট আপিস—আলমারীগুলিতে সাজানো রয়েছে নানারকমের জার্মানীর তৈরী ওষুধ—আমি যেন রিভলভিং চেয়ারে বসে ডাকছি—'বেয়ারা'! স্বপ্ন কি এত তাড়াতাড়ি সফল হয়? হয় বৈকি? যদি ছলনাময়ী ইচ্ছে করে আজকের স্বপ্ন আজই সফল হতে পারে! হার্টমান-এর ঠিকানা নিলাম। ওকে হোটেলে ফিরে যেতে বলে একটা কিছু ব্যবস্থার আশ্বাস দিলাম।

সাহেবকে বিদায় দিয়ে তক্ষুনি চলে গেলাম, হ্যারিসন রোডের একটা হোটেলে। দাদার এক কনট্রাক্টর বন্ধু দিলীপ দত্ত তখন এই হোটেলে রয়েছেন। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট বকেয়া ইন্‌কাম ট্যাক্সের জন্যে ওঁর বিরুদ্ধে সমন জারী করেছিল, তাই দেশ ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে এসেছেন। সুবিধে মত বাড়ি না পাওয়ায় হোটেলেই আছেন। দিলীপদাকে গিয়ে সব কথা বললাম। দিলীপদা বিছনার ওপর কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। জার্মানীর ওষুধ আর সাহেবের কথা শুনে তড়াক করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন—কত টাকা লাগবে পৃথ্বীশ?

আমি বললাম, একটু ভেবে চিন্তে দেখুন—হঠাৎ একটা কিছু না করাই ভাল। ওষুধের ব্যবসা সম্বন্ধে আমিও কিছুই জানি

না, আপনিও কিছু জানেন না। বরং যাঁরা জানেন এমন কারুর কাছে একটু জেনে শুনে নিলে ভাল হত।

দিলীপদা বললেন, খবরদার! কারুর কাছে কিছু বলবে না। জার্মানীর ওষুধের ব্যবসা—ও ভাল হতে বাধ্য। কত টাকা লাগবে বল শুনি?

আমি বললাম, হার্টমান সাহেবের মতে গোড়ায় অন্ততঃ লাখ দুই টাকার অর্ডার দিলে এজেন্সিটা পাওয়া যেতে পারে।

—ঠিক আছে, কালই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ঠিক কর—তিন দিনের মধ্যে কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করে ফেলব।

আমি বললাম, কোম্পানীটা কি পার্টনারশিপ হবে না লিমিটেড হবে?

—দাঁড়াও, দিলীপদা বললেন, আগে লাভটা খতিয়ে দেখে নি। দু-লাখ টাকার মাল আনলে ৩০%, মানে মোট ষাট হাজার টাকা Gross লাভ হবে—খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ধর পঁচিশ হাজার টাকা তো থাকবেই? শোন, একটা কাজ কর—আমি হব ফাইন্যান্সিয়র পার্টনার বা সিনিয়র পার্টনার। তুমি আর সাহেব হবে ওয়ার্কিং পার্টনার। ফাইন্যান্সের জন্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আমি পাব। আর পঞ্চাশ ভাগকে তিন ভাগে ভাগ করব—আমি, তুমি আর সাহেব!

আমি বললাম, আপনি তো এমনিতেই ৫০% লাভ নিলেন, আবার তিন ভাগ করা কেন?

—বা! দিলীপদা বললেন, ওটা তো গেল ফাইন্যান্সিং-এর জন্যে প্রাপ্য। আমিও তো আপিসের কাজকর্ম দেখব! তার জন্যে ওয়ার্কিং পার্টনারদের একটা শেয়ার আমার থাকবে বৈ কি?

আমি তর্ক বাড়ালাম না। দিলীপদা যুদ্ধের বাজারে বড়লোক। হয়তো লালসার অন্ত নেই। এখন কথা বাড়ালে ব্যবসাটাই হয়ত মাটি হয়ে যেতে পারে। এখন সাহেব রাজী হলে হয়।

হার্টমান-এর সঙ্গে পরের দিন সকালে গিয়ে দেখা করলাম। পার্টনারশিপ-এর প্রস্তাব শুনে তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন,

উপায় নেই, যাদের কাছে টাকা থাকে তারা সব সময়েই terms dictate করে থাকে। কিন্তু তুমি মিঃ দত্তর কাছে ভাল করে একটা কথা শুনে এসো, ভবিষ্যতে আরও কোন দাবী-দাওয়া তিনি করবেন কি না? বুঝতে পারলাম, হার্টমান বিচক্ষণ ব্যবসায়ী।

সাতদিনের মধ্যে কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হয়ে গেল—ক্লাইভ স্ট্রীটে সুদৃশ্য আপিস নেওয়া হল—চেয়ার, টেবিল, আলমারী, বয়, বেয়ারা, ক্লার্ক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট কিছুরই অভাব নেই। এইবার ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স-এর পালা। অনেক চেষ্টা কসরৎ করে আড়াই লাখ টাকার লাইসেন্সও পাওয়া গেল। জার্মানীতে মালের অর্ডার গেল। তখন ক্লাইভ স্ট্রীটে গট্‌মট করে হাঁটি। আমিও একজন হবু লাখপতি। ছলনাময়ী আমার বাদাম চিবিয়ে দিন গুজরানো আর সহ্য করতে পারছিল না—তাই একটা ঠাঁই করে দিল। অনিশ্চয়তার দিনগুলি কেটে গেছে। এখন ভয়ানক কর্মব্যস্ততা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার সময় পাইনে। সবাই বলে পৃথ্বীশের হল কি? আঙুল ফুলে কলাগাছ হল নাকি? মনে মনে আমিও কিন্তু ভাবছিলাম তাই। মাসে পাঁচশো টাকা অ্যালাউন্স পাচ্ছি—লভ্যাংশ থেকে কাটা হবে বছরের শেষে। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরি! কম কথা নয়! অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখি, দোলানো চেয়ারে বসে প্রাণের আনন্দে দোল খাই!

সেদিন বিকেলবেলা উমা হঠাৎ ঝড়ের বেগে আপিস ঘরে ঢুকে পড়েই বলল—পৃথ্বীশ, কাল আমার বিয়ে, তুমি যেয়ো—বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি জোর করে ওর হাত ধরে টেনে চেয়ারের ওপর বসালাম। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, কালকে বিয়ে কি হে? কোথায় কাকে খুঁজে পেতে বের করলে, একটু বলই না।

—বলবার কিছু নেই—I came, I saw, I Conquered.

—এত তাড়াতাড়ি Conquered তো নেপোলিয়ানের সময় হত—অবিশ্যি এখনও যে হয় না তা নয়, তবে তার জন্যে ফ্লুইড

ড্রাইভ একখানা নতুন গাড়ী তো অন্ততঃ চাই। তোমার তো তা নেই জানি।

উমা বলল, জান তো সেবা ঘোষের সঙ্গে বিয়েটা ফস্‌কে গেল! তার জন্যে অবিশ্যি ওর দাদারা দায়ী। পাঁচ বছর আগে যখন সেবার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করি, তখন আমার ওপর ওদের অনেক আস্থা ছিল, ক্লাইভ স্ট্রীটে আপিস নিয়েছি—হবু লক্ষপতি। তারপরে যখন ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে বিদেয় হলাম, ওরা বুঝতে পারল যে আমার হাতে বোনের ভার তুলে দেওয়া হয়তো বেজায় রিস্কি। তাই শেষ পর্যন্ত সেবার বিয়ে হল বড়লোকের ছেলের সঙ্গে।

আমি বললাম, সেবার দাদাদের কথা ছেড়ে দাও, ওর নিজের মনের খোঁজ রেখেছ কি? সেবা কি বলল?

উমা আম্‌তা আম্‌তা করছিল—ঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। রূঢ় সত্যকে অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়—উমাও এড়িয়ে যেতে চাইছিল। বেশি নিরীক্ষণ করলে যদি এই সত্যটাই প্রকট হ'য়ে ওঠে যে ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে ফিরতি-আসা উমাশঙ্কর চৌধুরীকে স্বামীত্বে বরণ করবার অনিচ্ছা সেবারই ছিল বেশি। খুব কম পুরুষমানুষ আছে, যে এই রকম একটা বাস্তব অথচ করুণ সত্যকে সহজভাবে নিতে পারে কারণ ওটা পৌরুষের ওপর আঘাত—যে সে কথা নয়। হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উমা বলল—অত খতিয়ে দেখি নি, তবে মনে হয় সেবার কোনও অনিচ্ছা ছিল না।

—মনকে ঠকিয়ে লাভ কি উমা? আমি বললাম, সেবা ঘোষ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নয়—দাদাদের অমতে বিয়ে করবার ক্ষমতাও ওর সব সময়েই ছিল। প্রয়োজন বোধ করলে সে তোমাকে বিয়ে করতে পারতো, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে কি?

—তুমি ওর দোষ দিও না পৃথ্বীশ, হয়তো ওর কোনও দোষ নেই। উমার চোখ ছলছল।

—Nonsense, আমি বললাম, আমাদের বয়স অনেক হ'ল—লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছি—আমাদের ন্যাকামী করা পোষায় না। স্বীকার করতে দোষ কি যে প্রেম, ভালবাসা সবই সামাজিক পটভূমিতে সৃষ্ট হয়—ও-গুলির চিরন্তনী কোনও মূল্য নেই। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতায় কথাগুলি হাজারবার রং পাল্‌টেছে। ১৯৫২ সালের পৃথিবীতে সেবা ঘোষ উমাশঙ্করকে বিয়ে করবে না, এটা তো একটা ধ্রুব সত্য।—যাক্‌গে সে সব কথা—এখন তোমার এই নতুন প্রিয়ার নাম কি বল—একটুখানি পরিচয়ও দাও, শুনি!

—শুনেছি, লরেটো থেকে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছে—নাম শর্বরী—বাপ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

—ইংরেজী accent কি রকম—হাসলে দাঁত কতটুকু বেরোয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—ভাল করে দেখি নি—দূর থেকে দেখেছিলাম। হাসতেও দেখি নি, কাঁদতেও দেখি নি। তবে মনে হোল খুব স্মার্ট।

—ঠোঁটের রং এর প্রলেপ ক ইঞ্চি পুরু?

—জানি না, অত বিচার করবার আমার সময় নেই—সেবার বিয়ে হবার পরই আমি স্থির করলাম যা হোক ক'রে একটা বিয়ে আমাকেও করতে হবে। এক আত্মীয় রাস্তায় মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন পছন্দ হয় কি না। দূর থেকে দেখেই স্থির করলাম বিয়ে করব।

—ভালই করেছ, আমি বললাম, তোমার জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক্।

তারপর দুজনে বসে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলাপ করলাম। উমা বলল, একটা ভাল চাকরির জন্যে এহেন জায়গা নেই, চেষ্টা না করেছি। কিন্তু জানাশুনা না থাকলে আজকের ক্লাইভ স্ট্রীটে কোথাও কোনও চান্সই পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে একে বলে 'পুল'।

আমি বললাম—কেন ? কাগজে ডক্টর বিদেশী বন্ধুর বক্তৃতা পড়ো নি ?—ভারতবর্ষের প্রথম প্ল্যান-এ কত লক্ষ বেকার চাকরি পাবে ? ভাবছ কেন ?

উমা বলল, হয়তো অঙ্কের দিক থেকে তথ্যগুলো নির্ভুল। একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ নতুন চাকরির সৃষ্টি হয়েছে, আবার অন্যদিকে তেমনি লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে বেরিয়ে আসছে। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই দেখ না—তুমি না হয় হালে একটা কিছু করছ—আর তো সবাই দেখছি ক্লাইভ স্ট্রীট পরিক্রমা করে চলেছে।

সত্যিই তাই—এত বেকার বহুকাল দেখা যায় নি। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা আসায় সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ১৯৫০-৫১ সালে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসেছে—তাদের এখনও কোনও ব্যবস্থা হয় নি। যেদিন তারা নিজেদের দেশের মাটি থেকে রাজনীতির চক্রান্তে সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল সেইদিন থেকে দুর্দৈব তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। ব্যাপারটা বড় সোজা নয়। আমরা বড় বড় লেকচার দিতে পারি, সদিচ্ছা পোষণ করতে পারি, ইলেকসনের সময় এলে দরদ ভরা কণ্ঠে আবেগময়ী বক্তৃতা করে রুমাল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে পারি। কিন্তু সমস্যাটা সবটাই অর্থনৈতিক নয়। এর ভিতরে কৃষ্টি আর মনস্তত্ত্বেরও অনেক সমস্যা রয়েছে। একটা বনলতাকে আশ্রয়চ্যুত করে অন্য জায়গায় লাগিয়ে দিলে, সেটা হয়তো বাঁচতে পারে, কিন্তু আগেকার মত প্রাণের স্পন্দন তার মধ্যে পাওয়া যায় কি ? নদী, নালা, খাল, বিল, উদার আকাশ বাতাস, অকৃপণ বসুন্ধরার দান ফেলে লক্ষ লক্ষ লোক সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে—এরা হয়তো বাঁচবে, কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে সবটাই নষ্ট হ'য়ে যাবে। একটা সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়ায় এসে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করা বড় সহজ কথা নয়। বড় কর্তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঢাল্‌ছেন এই সব উৎপাটিত মনুষ্যদের জন্যে,

কিন্তু তবুও তারা আর মাটিতে শেকড় প্রবেশ করাতে পারছে না—কোনও রকম করে কোথাও বা সরকারী ভিক্ষায়, কোথাও বা নিজেদের যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত বিত্ত দিয়ে তাদের নিজেদের দিন চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্লাইভ স্ট্রীটের ষড়যন্ত্রে এরা একদিন গৃহহীন হয়েছিল, সে-কথা এরা জানে না। যে-পঙ্কিল রাজনীতির লড়াইয়ে এরা দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহৃত হয়েছিল, সে-রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল ক্লাইভ স্টীট। আজও এদের জীবন নিয়ে যে-ছিনিমিনি চলছে, তারও উৎস সন্ধান করতে হলে ক্লাইভ স্টীটে আসতে হয়। লোহা আর চিনির পারমিট নিয়ে যেমন কানামাছি খেলা হচ্ছিল, ঠিক তেমনি খেলা হচ্ছিল, কোটি কোটি টাকা নিয়ে, শরণার্থীদের জীবন নিয়ে। রাতারাতি হাজার হাজার লোক গজিয়ে উঠল, যারা শরণার্থীদের লোন-এর টাকা পাস করিয়ে দিতে পারে, চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে।

আপনি শরণার্থী? সার্টিফিকেট কিংবা এফিডেভিট আছে? বেশ পাঁচ হাজার টাকার লোন বের করে দিচ্ছি—হাজার টাকা আমায় দিতে হবে। কে না দিতে চায়? ভিক্ষা করে যাদের জীবন চলছে, তাদের কাছে এক হাজার টাকা দিয়ে চার হাজার টাকা পাওয়াটা স্বপ্নেরও বাইরে। অনেকদিন অতগুলি টাকা একসঙ্গে দেখা হয় নি। কেউবা আবার সঙ্গের সব কিছু সম্বল বেচে প্রতিশ্রুতিমুখর দালালকে দুইশত টাকা আগাম দিয়ে দিল। বাবুরা সব ভদ্রলোক, এরা কি আর ভাঁওতা দেবে? সে যে কি নিদারুণ নিষ্ঠুর অনিশ্চিত দিনগুলি কেটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বড় কর্তাদের অনুগ্রহে যাওবা এদের থাকার ঠাঁই হল, চাকরি পাওয়া যাবে কোথায়? বিশ বছরের যুবক থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত চাকরি খুঁজছে। চাকরি খুঁজছে মধ্যবিত্ত ঘরের প্রবীণা বধূরা। পাঁচটি সন্তানের জননী ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া বিদ্যেটাকে একটু মেজে ঘসে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। স্বামী মাস্টার

ছিলেন। প্রাণভরা সম্মান, আর লাউ কুমড়ো গাছে ঘেরা ছোট্ট কুটীর প্রাঙ্গণের মমতাভরা আবহাওয়ায় এতকাল কেটেছে। স্বামীর চাকরি নেই—শরীরও ভাল নেই। তাই মধ্যবয়স্কা মাতা চাকরির খোঁজে বেরিয়েছেন—যদি কিছু করা যায়! আহা, কর্তা তো চিরকাল এমনটি ছিলেন না—দেশ-বিভাগের পরেই না এমনটি হয়েছেন! আমার কি কর্তব্য নয়, তাকে এই বিপদের দিনে সাহায্য করা!

কত যুবতী যে চৌরঙ্গীর হোটেলগুলিতে এসে ভীড় জমাতে লাগল, তার ঠিক নেই। পয়সা দিয়ে দালাল পাঠানো হতে লাগল জায়গায় জায়গায় যদি সস্তায় পাওয়া যায়, কিছু মেয়ে ধরে নিয়ে এস! এইসব ছিন্নমূল নারীদের দিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়া মন্দ কি? ধনকেন্দ্রিক সমাজের অন্তহীন লালসা এক-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অতি সহজ সরল পথে পয়সা কামানোর প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলল। যে-সমাজ ব্যবস্থায় অসিত সেন চাকরি পায় না, আর সূরজমল কিশোরীমল লক্ষপতি হয়, সেখানে কতকগুলি অসহায়া নারীকে নিয়ে বেচা কেনার পসরা চলবে; তাতে আর আশ্চর্য্য হবার আছে কি? এটাও একটা ব্যবসা! আপনি এই রকম একজন ব্যবসায়ীকে ধরে জিজ্ঞেস করুন—হ্যাঁ মশাই, এসব করছেন কি? সে বলবে—করব কি? খাব কি করে? আর এইসব হাজার হাজার দুঃস্থা মেয়েদেরই বা উপায় হবে কি?

একদিন লিণ্ডসে স্ট্রীটে বহুদিনের পরিচিত অমল মুখার্জীর সাথে দেখা হল। শুনেছিলাম সে মেসাজ ক্লিনিক খুলেছে। আমাকে দেখেই অমল অন্য ফুটপাথ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল—আমি প্রায় দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম।

—অমল, তোমার নামে সব শুনছি কি?

—চলো, অমল বলল, আজ সব কথা তোমায় খুলে বলব—তোমরা তো সবাই আমাকে বয়কট করেছ।

অমল আর আমি হেঁটে এসে ধর্মতলার মোড়ে একটা রেষ্টুরেণ্টে বসলাম। অমল মুখার্জী বলতে লাগল—হোম ইণ্টারন্ থেকে ছাড়া পাবার পর বেরুলাম চাকরির খোঁজে। তুমি তো জান, বিয়াল্লিশের আন্দোলনের ফলে বি, এ, পরীক্ষাটা দিতে পারলাম না। যখন ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা চাকরির জন্যে ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ একদিন বাবা মারা গেলেন। আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। চারটি অবিবাহিতা বোন, তিনটি ছোট ভাই আর বিধবা মা। বাবার সৎকার করবার পয়সা ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশীরা সাহায্য না করলে হিন্দু সৎকার সমিতিকে খবর দিতে হত। বাবার মৃত্যুর পরই শুরু হল আমার জীবনের চরম সংগ্রাম। ভাইবোনদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো ডাল, ভাত যোগাবার ব্যবস্থাও করতে পারছিলাম না। দারিদ্রের এই নিদারুণ কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে মা হঠাৎ মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর ঠিক আগে আমার পরের বোনটির একটা বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে পাত্রপক্ষ পিছিয়ে গেলেন। যেদিন খবরটি পাওয়া গেল, ঠিক তার পরের দিন অনীতা গলায় দড়ি দিল। বাড়ি-ওয়ালা মামলা করে বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিল।

বিচারের সময়ে জজ সাহেবের কাছে দুঃখের কথা সব খুলে বললাম। তিনি দয়ার অবতার। বললেন—আপনার অবস্থা সবই বুঝতে পারছি—কিন্তু আইনের পথ বড়ই কঠোর। বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেন নি বলে আপনার যে অন্যায় হয়েছে, আমি কেবলমাত্র তারই বিচার করতে পারি—কেন দিতে পারেন নি, সে কথা আমার বিচার্য্য নয়। আপনাকে পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। ডেসপারেট হয়ে কোর্টের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলাম—হুজুর, আমাকে একটা চাকরি ঠিক করে দিন—আমি আস্তে আস্তে সব টাকা পরিশোধ ক'রে দেবো। আদালতের আর্দালী এসে আমাকে টেনে বিচারালয় থেকে বের করে দিল। সেইদিন সন্ধ্যেবেলা বাবলা; মানে আমার আঠারো বছরের ভাইটা

কোথায় চলে গেল তার আর কোনও খোঁজ পেলাম না। আজও তার কোনও খোঁজ পাই নি। ভাইটা আমাকে বড় ভালবাসত—আমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছিল, তা আমি জানি। যদি বেঁচে থাকে তাহলে আবার সে ফিরে আসবে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তার পরের ইতিহাস আরও বেদনাদায়ক। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বাড়িতে এক-একটা ভাই বোনকে রেখে নিজে বেরোলাম ক্লাইভ স্ট্রীটের আপিসে আপিসে ধরনা দিতে। অমলের দু-চোখ দিয়ে তখন অঝোর ধারে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। আমিও আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, এই কি সেই দুর্দ্ধর্ষ অমল মুখার্জী যে বন্দুকধারী সশস্ত্র বাহিনী পরিবেষ্টিত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলেছিল—মানুষের বুকে গুলী মেরে কখনও দেখেছ সাহেব? এই কি সেই অমল মুখার্জী, যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা একটা পুকুরে লুকিয়ে ছিল? তার কাছে ছিল গোটা ছয়েক পিস্তল আর প্রায় দুশো রাউণ্ড গুলী! আজও কি অমলের ধমনীতে সেই উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে না? মানুষের কি এত দ্রুত কোনও পরিবর্তন হতে পারে?

অমল কেবল বলতে শুরু করেছে—এইবার মেসাজ ক্লিনিক-এর ইতিহাস তোমায় বলছি—আমি উঠে পড়লাম।

—আমাকে আর কিছু তোমার বলতে হবে না, অমল—আমি সব জানি, বুঝি, কিন্তু দোহাই তোমার এ-ব্যবসাটা তুমি ছেড়ে দাও!

সেই রেষ্টুরেন্টের মধ্যে অমল আমার হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল—তুই আমায় যে কোনও একটা চাকরি খুঁজে দে যাতে করে ছোট ভাইবোনদের আমি দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিতে পারি, আমাকে বাঁচতে দে। আমি দু'চোখ বুজে বসে রইলাম। কি উত্তর দেবো? ভাবলাম, আমার কোম্পানীতে যদি ওর একটা কিছু করে দিতে পারি। ওকি রিপ্রেজেনটেটিভ-এর চাকরি করতে পারবে?— দেখি কি করা যায়!

স্বাধীনোত্তর কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটে এমন বহু লোকের সাথে আপনার দেখা হবে, যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অসীম সাহস আর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন বৃদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে চলে-আসা একরকম বহুজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁরা কিন্তু পারমিট-যুগেও কিছু করতে পারলেন না। কেউ কেউ বসে বিড়ি ফুঁকছেন আর ভাবছেন পঁচিশ বছরের আত্মদান কি মাঠে মারা গেল? বড় কর্তাদের কাছে অনেক আবেদন গেল—এদের জন্যে কিছু করা দরকার। তাঁরা বেছে বেছে কাউকে কাউকে মাসিক পাঁচ, দশ টাকার পেন্সনের ব্যবস্থা করে দিলেন। চালের মণ যখন তিরিশ টাকা, তখন দশ টাকার পেন্সনের মত একটা জীবন্ত প্রহসনের কথা কেউ কল্পনা করতে পারে?

বটকৃষ্ণ ঘোষের কথাই ধরা যাক্। ১৯৩০-৩১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বটকৃষ্ণ ঘোষ 'বরিশালের বাঘ' বলে আখ্যা পেয়েছিলেন। নিজে ছিলেন প্রকাণ্ড বড় লাঠিয়াল। সেবাসমিতি নাম করে একটা স্বদেশী আখড়া গড়ে তুলেছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। বরিশাল সহরের তখনকার সমস্ত যুবক সেবাসমিতির সভ্য ছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় কম করেও বটকৃষ্ণ বাবু ষোলবার জেল খেটেছেন, সাঁইত্রিশটা লাঠি চার্জের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বহু চেষ্টা করে পুলিশ যখন তাকে কলকাতায় আসবার পথে স্টীমারের মধ্যে গ্রেপ্তার করল তখন বরিশালের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হোম সেক্রেটারীকে তার পাঠালেন—The tiger of Borishal arrested. দেশ বিভাগ হবার পরে বটকৃষ্ণবাবু বরিশালেই ছিলেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে রাণাঘাটের একটি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। এই সেই বটকৃষ্ণ ঘোষ? সমস্ত দেহের চামড়া ঝুলে গেছে—অনশনের ছাপ চোখে মুখে স্পষ্ট। আমি জিজ্ঞেস করলাম—বটকৃষ্ণবাবু, কেমন আছেন? তিনি

বললেন, বড়ই দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি ভাই, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, ছেলেপিলে নিয়ে বড়ই অসুবিধের মধ্যে আছি।

—কেন, একটা পেন্‌সনের ব্যবস্থা কি হয় নি?

—পেন্‌সন তো আমি চাই নি পৃথ্বীশবাবু। বয়স তিপান্ন বছর হল বটে, কিন্তু আমি তো অশক্ত হয়ে পড়ি নি। আমি কাজ করতে চাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি আমার ছেলেপিলেদের খাওয়াতে চাই।

—বড়কর্তাদের ধরুন না, একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—বলেছিলাম, কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করতে পারি নি বলে আমার জন্যে ওঁরা কিছু করতে পারলেন না।

বটকৃষ্ণবাবু যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁর চোখদুটো হিংস্র ব্যাঘ্রের মত জ্বলছিল। আমি ভাবলাম, বরিশালের বাঘ বড়কর্তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো? একটুখানি চুপ করে থেকে তিনি বললেন, পৃথ্বীশবাবু, এই স্বাধীনতার জন্যে কি আমরা যুদ্ধ করেছিলাম?

বটকৃষ্ণবাবু চলে গেলেন। আসল কথা ওঁরা কেউই আন্দোলনের সঠিক রূপ বুঝতে পারেন নি। ওঁদের মত হাজার হাজার বলিষ্ঠ যুবক স্বদেশমাতৃকার শৃংখল ভঙ্গ করবার জন্যে জীবন আহুতি দিয়েছেন—ওঁরা যে-আত্মত্যাগ করেছেন, তার তুলনা শুধু ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা আন্দোলনে খুঁজে পাওয়া ভার। ওঁদের আত্মত্যাগের ওপর স্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতার বেদী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে স্বাধীনতার ফল ওঁরা পান নি। পেয়েছেন সুরজমল কিশোরীমল আর রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল মুফৎলাল। এঁদের সঙ্গে আছেন ক্লাইভ স্ট্রীটের আরও অনেকে, যাঁরা স্বাধীনতা যুগের সৈনিকদের দেখলে এখন আর চিনতেও পারেন না।

* * *

আপিসে বসে আছি—শনিবারের শেষ বেলা, বন্ধুবর অসিত এসে উপস্থিত। একথা ওকথার পরে অসিত বলল, চাকরি আর পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না পৃথ্বীশ।

—ভাল কথা, তোমার সেই ইণ্টারভিউটার কি হ'ল ?

—সেইখান থেকেই তো এখন আসছি।

—ব্যাপারটা খুলেই বল না ?

অসিত বলল, ইণ্টারভিউ বোর্ডে নিডহ্যাম কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জন্‌সন্ এবং তাঁর নতুন পারসোনেল ম্যানেজার মিঃ রায়চৌধুরী ছিলেন। গোড়ার দিকে মনে হল যে দুজনই খুব খুশী হয়েছেন। মনে মনে ভাবছি, হয়তো বা অ্যাদ্দিনবাদে একটা হিল্লে হল। হঠাৎ পারসোনেল ম্যানেজার মিঃ রায়চৌধুরী আমাকে বললেন, মিঃ সেইন, আমাদের এখানে চাকরি করতে হলে আপনাকে স্যুট পরে বেরুতে হবে। ইণ্ডিয়ান ড্রেস আমরা পছন্দ করি না। সেইজন্যেই আমরা ইণ্ডিয়ান girls রাখি না। প্রায় সবাই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন পার্শী রয়েছে। আমি বললাম—মিঃ রায়চৌধুরী, আমাকে তো অফিসে বসে লেখাপড়ার কাজ করতে হবে, আমাকে আর স্যুট পরাতে চাচ্ছেন কেন ?

নিডহ্যাম কোম্পানীর বিলেত-ফেরতা পারসোনেল ম্যানেজার মিঃ রায়চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—আপনি যদি স্যুট পরতে না চান তাহলে আপনাকে আমরা appointment দিতে পারব না।

মিঃ জনসন্ কিন্তু নির্বিকার হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর মনের কথা বলবার জন্যে পোষমানা দু-হাজার টাকা মাইনের মিঃ রায়-চৌধুরী রয়েছেন। স্যুটের পরেই এল দাঁত। মিঃ রায়চৌধুরী আমার দাঁত দেখে বুঝতে পেরেছিলেন আমি পান খাই।

—হ্যাঁ, আর একটি কথা, এখানে চাকরি করতে হলে পান খেলে চলবে না, তিনি বললেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। পয়সার

অভাবে সেদিনও বাড়ি থেকে হেঁটে ক্লাইভ স্ট্রীটে এসেছিলাম—বিকেলের জলখাবার তো ভাল, রাত্তিরের খাবার জুটবে কিনা ঠিক নেই—তবুও সব জিনিসের একটা সীমা আছে। বলা বাহুল্য, মিঃ রায়চৌধুরীর মত সাহেবরা পান খাওয়াটাকে একটা অত্যন্ত rustic এবং nasty অভ্যেস বলে মনে করেন। বরং তুমি যদি কথায় কথায় সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে পার, কিংবা পার মাছের মত মদ্য পান করতে (drink like fish) তবে তোমার যোগ্যতার কিছুটা প্রমাণ তুমি দিতে পারবে।

অসিত যখন থামল তখন সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। একদিকে ক্ষুধার তাড়না অন্যদিকে আত্মসম্মান বিলুপ্তির ইঙ্গিত। আমি কিছু একটা বলতে যাব এমন সময় অসিত আমার টেবিলের উপরে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বলে উঠল—পৃথ্বীশ, but for my widow mother and young brothers, I would have shot that blinking idiot.

আমি বললাম, দেখ অসিত, এমন একদিন শিগ্‌গীরই আসছে যখন স্যুট ছাড়া দেশে কোন পোশাক থাকবে না, আর পান খাওয়াকে একটা অত্যন্ত গ্রাম্য অভ্যেস বলে মনে করা হবে। শিল্প সম্প্রসারণের যুগে বহু সামাজিক রীতিনীতি রূপ পালটাতে বাধ্য হয়। সত্যি কথা বলতে কি ধুতী, পাঞ্জাবী গ্রাম্য সভ্যতার প্রতীক। অবিশ্যি মিঃ রায়চৌধুরীর পক্ষে ওরকম ভারিক্কী মাতব্বরী চালে তোমার সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হয় নি, একথা একশোবার স্বীকার করব। আসল কথা কি জানো—এই সব ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেবরা অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

অসিতের রাগ তখনও পড়ে নি। সে আবার চেঁচিয়ে উঠে বলল, I want to shoot that Roychowdhury.

অসিত চলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, অসিত আদর্শ-বাদী—ওর চাকরি মেলা ভার। আমি যেন মনঃশ্চক্ষে দেখতে পেলাম একটি বিধবা মা আর তিনটি নাবালক ভাই-এর একটি

ছোট্ট পরিবার দিনের পর দিন অনশনে কাটাচ্ছে। কিন্তু কিছু-ক্ষণ পরেই আবার দেখতে পেলাম যে আজকের আদর্শবাদী অসিত সেন kolynos দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে স্যুট পরে এক সাহেবের অফিসে চাকরি করতে যাচ্ছে। উদর আর আদর্শের সংঘাতে আদর্শ প্রায় সব সময়ই মার খেয়েছে—অসিতের বেলায়ও হয়তো খাবে।

সেদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে যেতে হয়েছিল। এক দোকানদার পাঁচ শো টাকার মাল নিয়ে টাকা দেয় নি। কোম্পানী মামলা শুরু করেছে। সেদিন ছিল শুনানির তারিখ। কোর্ট কাছারির নাম শুনলে আমার গা ঘিন ঘিন করে—কেন যেন মনে হয় যে কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে এসব জায়গায় আসা উচিত নয়। টাকা মার যায়, তাও ভাল, তবুও যেন কোর্টে কারুর যেতে না হয়। কিন্তু খাস্ ব্যবসা জগতের লোকদের মনোবৃত্তিটা একটু আলাদা ধরনের। বড় বড় কোম্পানীর নিজেদের 'ল ডিপার্টমেণ্ট' রয়েছে; রোজ কোনও না কোনও কোর্টে একটা-আধটা মামলা লেগেই আছে—শুনানি যদি নাও থাকে, উকিল বাড়িতে consultation আছে। ছোটদের কথা আলাদা—মালিক বা ম্যানেজার নিজেরাই গিয়ে তদারক করেন। আদালত যত বেশী উঁচু হবে, সেখানে ততবেশী পয়সা ও সময় নষ্ট করতে হবে। টাকা, পয়সা, জমি-জায়গা সংক্রান্ত মামলা হলে তো কথাই নেই। আপনি ১৯৫২ সালে বিশ হাজার টাকার দায়ে মামলা রুজু করেছেন তো ১৯৬০ সাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে বসে থাকতে পারেন—তার আগে শুনানির কোন আশা নেই। ছোট কোর্টে হয়তো অত দেরি হয় না; কিন্তু একটা কথা আপনি ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিতে পারেন যে অপরপক্ষ আপনাকে সেরেফ তারিখ নিয়ে নিয়ে মাস ছয়েক ঘোরাবে। শেষ বারের তারিখ নেবার সময় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট

দাখিল হবে। সকাল দশটায় খেয়ে দেয়ে কোর্টে গিয়ে বসবেন আর পাঁচটায় ফিরবেন। হরেকরকম লোকজন দেখবেন, হরেক রকম মানব চরিত্রের বিকৃত প্রকাশ বসে বসে শুনতে থাকুন—দুদিন, চারদিন যেতে থাকুন, তারপর হঠাৎ একদিন আপনার নাম ডাকা হলো। প্রতিপক্ষের উকিল M.C. খানা দাখিল করে সময় চাইলেন। জজ সাহেব হাসলেন, এসব কায়দা কানুন তাঁর অজানা নেই—ইচ্ছা করলে তিনি M. C. নাকচ করেও দিতে পারেন, কিন্তু তা তিনি দেন না—কারণ যাদের নিয়ে তাঁর সংসার তাদের সব সময় উপেক্ষা করা যায় না। আর তা ছাড়া profession-এর লোকদের কতকগুলি খামখেয়ালীপনা মেনে না চললে প্রতিবাদ হবে—Legal profession-এর স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে—দেশে democracy নেই। তাই সব মামলাতেই দেরি হয়। বিবাদী, আসামী, জজ, উকিল, পেস্কার, কোর্টের চাপরাশী সবাই জানে দেরি হবে, চিরকাল এরকমটা হয়ে আসছে—হঠাৎ নতুন একটা কিছু করা সম্ভব নয়।

তাই আমিও রোজ যাচ্ছি। একদিন দুপুর বেলা টিফিনের সময়ে একটু বেরিয়েছিলাম। প্রচণ্ড রোদ। একটা কাজ সেরে কোর্টে ফিরলাম। হঠাৎ অতি দীন পরিচ্ছদে একজন উকিল আমার সামনে এসে বললেন—Affidavit আছে স্যার? কথা না বলে চলে যাচ্ছিলাম। ফিরে দাঁড়ালাম। চোখে চোখ পড়ল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি থাকায় চিনতে পারি নি। চোখে চশমা—আগে চশমা ছিল না, চেহারারও পরিবর্তন হয়েছে। আর তারপরে হয়েছে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন। একটি সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ শীর্ণপাণ্ডুর কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। শুধু গলার স্বরটি বদলায় নি। ডোভিন কেমিক্যালের দেবেনদা। বি. এ পাস করে 'ল' পাশ করেছিলেন। তাই মায়াবিনী ক্লাইভ স্ট্রীট যখন ওঁকে দাঙ্গার পরে উৎখাত করে দিল, তখনই উনি এসে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ভাগ্য-পরীক্ষায় নেমে গেলেন। কিন্তু ছলনাময়ী একবার যাকে আশ্রয়-

চ্যুত করেছে, তার পক্ষে আর কোথাও আশ্রয় লাভ করা খুবই দুরূহ। আমি দেবেনদার কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরলাম। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়েছিল প্রথম সম্ভাষণের পরেই—'affidavit আছে স্যার?' এখন আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। যে-দেবেনদা একদিন ক্লাইভ স্ট্রীটের ফ্যাসন-দুরস্ত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, আজ সেই দেবেনদার গায়ে অন্ততঃ পাঁচটি তালি দেওয়া একটি তেলচিটে কালো কোট। সাদা ফুলপ্যাণ্টটা কবে একবার রজকের স্নেহস্পর্শ পেয়েছিল, তার ঠিক নেই। মলিনতার ভারে সেটি প্রায় হাফ্প্যাণ্টের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। সেই দেবেনদা! বি.এ-তে ডিসটিঙ্কশন পাওয়া উচ্চাভিলাষী বাঙ্গালী যুবক ক্লাইভ স্ট্রীটে গিয়েছিলেন পয়সা রোজগার করতে—টিঁকতে পারেন নি। আসবার আগে সবার দেনা দিয়ে এসেছিলেন—কিন্তু নিজের পাওনা একটি পয়সাও আদায় করতে পারেন নি। আজও মনে আছে, যেদিন ডোভিন কেমিক্যালের আপিস ছেড়ে চলে আসবেন ঠিক করলেন, সেদিন আমাকে আর উমাকে ডেকে বলেছিলেন—সব টাকাটা দিতে পারলাম না, যা পারলাম দিয়ে গেলাম। পরে রোজগার করে বাকীটা শোধ করে দেব। দেবেনদাকে ছেড়ে হঠাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম।

আমি ইতিহাসের ছাত্র এবং ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট আমার মানস-প্রিয়া। দেবেনদার জীবনের ইতিহাস আমি অঙ্কের ছকে ফেলে বলে দিতে পারি। কিন্তু কাছে দাঁড়িয়ে নিজের কানে সে-ইতিহাস শোনবার মত আমার মানসিক শক্তি তখন ছিল না।

ছ'মাস উমার বিয়ে হয়েছে। আজকাল ওর সঙ্গে দেখাশুনো বড় একটা হয় না। বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনি, ও নাকি বেশ বড় রকম কতকগুলি এক্সপোর্টের ব্যবসা করবার চেষ্টা করছে। উমা আমার বাল্যবন্ধু। সব সময়ই ওর শুভ কামনা করি। অনেকদিন ওকে

না দেখলে মন খারাপ হয়; একদিন ওর বাড়ি গেলাম সন্ধ্যের পর। ও বাড়িতেই ছিল। কলিং বেল বাজাতে ও নিজেই এসে দরজা খুলে দিল। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার মনের গোপন কোনও তন্ত্রীতে যেন একটুখানি তাল কেটে গেল। ওর বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম।

—তোমার শরীর ভাল নেই, উমা ?

—আমার শরীর ভাল থাকে না—কখনও শুনেছ ?

—তবুও বলা তো যায় না, মানুষের দেহে অসুখবিসুখ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

—না, শরীর ভালই আছে।

—তবে কি তোমার মন খারাপ ?

—মন খারাপ করে লাভ কিছু আছে, বলতে পার ?

—বলই না ব্যাপারখানা কি ? তোমার স্ত্রী কোথায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—এখনও আপিস থেকে ফেরেন নি।

—তোমার স্ত্রী চাকরি করছেন না কি ? কই বল নি তো ?

—এতে আর বলবার আছে কি ? এখন তো সবাই চাকরি করছে।

তারপর শুনলাম মিসেস চৌধুরী একটা ভাল বিলিতী কোম্পানীতে সেক্রেটারীর চাকরি করছেন—প্রায় ছশো টাকা মাইনে পান।

—তা তুমি কি বউ-এর চাকরি করা পছন্দ করছ না ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আমার পছন্দ-অপছন্দের উপর উনি গুরুত্ব খুবই কম দিয়ে থাকেন। একটু চুপ করে থেকে উমা বলতে লাগল—তুমি তো জান পৃথ্বীশ, আমি কাব্য সাহিত্য খুব ভালবাসতাম। মনে চিরকালই একটা ইচ্ছে ছিল যে যদি বিয়ে করি তাহলে কাব্যদরদী একটি

মেয়েকে বিয়ে করব। শর্বরী সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল যে ইংরেজী অনার্সের ছাত্রী, হয়তো কাব্যবোধ বেশ তীক্ষ্ণ। সেদিন রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে মনটা বেশ ভাল লাগছিল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার লেক এভিনিউকে বড় কাব্যময় মনে হল। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে শর্বরীর মুখে পড়েছে। আমি ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলাম—

কালি মধুযামিনীতে, জ্যোৎস্না নিশীথে···

আমার ইংরেজী অনার্স পড়া বউ বলে উঠলেন—will you stop that nonsense ! For heaven's sake let me sleep. I am a dead bit.

বলতে পার পৃথ্বীশ, স্বপ্ন ভাঙ্গা আর কাকে বলে ? ভাবছি···

—কি ভাবছ উমা ? তুমি ভেবেছ রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে Shelley, Keats আওড়ালে তোমার স্ত্রীর অনুভূতি আলোড়িত হত ! মোটেই তা নয় ! আসল্ কথা কি জান ? একটি অনাত্মীয় ভাষাকে আত্মীয় করবার প্রচণ্ড প্রয়াসে শর্বরী দেবী তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে হারিয়ে ফেলেছেন। বলতে গেলে, খাওয়া, পড়া, আর কতকগুলি জৈবিক প্রক্রিয়া ছাড়া, ওঁর মধ্যে আর কোনও অনুভূতিই বেঁচে নেই। তোমার জন্যে কষ্ট হয়; তোমার জীবনে এত বড় ভুল বোধ হয় আর কখনও হয় নি। মুশকিল হচ্ছে, you went, you saw, you conquered কিনা তাই ? অতি সহজে জয়লাভ করতে গেলে তার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়। আরও একটু দেখেশুনে জয় করলে ভাল হত।

চা খেয়ে উমার বাড়ি থেকে চলে এলাম। মন ভারাক্রান্ত— উমা জীবনে ভয়ানক অসুখী হয়েছে। যত দিন যাবে, তত শর্বরীর মানসিক বিকৃতি উমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু উপায় কিছু নেই। আচার-ব্যবহার বা অন্য কোনও ব্যবহারিক জগতের কিছু হ'লে হয়তো বা চেষ্টা করে তাকে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যখন অনুভূতির জগৎ

একেবারে ভোঁতা হয়ে যায়, তাকে শান দিয়ে ধারালো করে নেওয়া মানুষের প্রায় সাধ্যের বাইরে। বেচারা উমা!

পরের দিন আপিসে গিয়ে দেখি মহা হৈ চৈ ব্যাপার। জার্মানী থেকে লাখ তিনেক টাকার একটা Draft এসেছে; সাতদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে হবে। আমাদের financier বা সিনিয়র পার্টনার শ্রীদিলীপ কুমার দত্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছেন। হার্টমান সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তার পর, আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি সিনিয়র পার্টনার-এর অবস্থা কাহিল; তার পক্ষে হঠাৎ অতগুলি টাকার ব্যবস্থা করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়েছে। ইন্‌কামট্যাক্সকে নিজের অর্জিত এবং সঞ্চিত অর্থের যে-হিসাব দাখিল করা হয়েছে, তাতে ক'রে দিলীপদার পক্ষে তখন নূতন করে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকার বেশী বের করা সম্ভব নয়। টাকা রয়েছে অনেক, কিন্তু খাতা-পত্রে দেখানো সম্ভব নয়। এটাকেই ব্যবসার বাজারে বলা হয় 'ব্ল্যাক মানি।' দিলীপদা আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকলেন—ভাবটা এই—এখন কি করে মুখ বাঁচানো যায়। আমি তার দু-চারজন শাঁসাল বন্ধুবান্ধবের নাম করলাম যাদের কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে, এবং দিলীপদা চাইলেই পাবেন।

দিলীপদা বললেন, সাবধান! একথা যেন কেউ জানতে না পারে! আমার টাকা নেই, একথা স্বীকার করতে আমি রাজী নই। আর তা ছাড়া আমার টাকা তো রয়েছে। স্ত্রী আর বাবার নামে লাখ তিনেক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। মুশকিল হচ্ছে তাদের কাছ থেকে টাকা বের করা এখন প্রায় অসম্ভব। এমনিতেই তোমার সাথে ব্যবসায় নামবার আগে হাজার পঞ্চাশেক টাকা নষ্ট হয়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু সে তো আপনার নিজের টাকা।

—হলে কি হবে ভাই, আমার এখন হাত পা বাঁধা।

হার্টম্যান সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, ব্যাঙ্কের draft যদি dishonoured হয় তাহলে এজেন্সি চলে যাবে। এর মধ্যেই বহুলোক এজেন্সিটার পেছনে লেগেছে। Say whatever you like—your Senior Partner has let me down very badly.

আমি বললাম—সাহেব, আমি খুব দুঃখিত। শত হলেও আমিই তো সিনিয়র পার্টনার ঠিক করেছিলাম।

সাহেব বললেন, তোমার কোনও দোষ নেই। Our fat partner is hell of a talker. যাই হোক চেষ্টা করে দেখ, অন্য একজন টাকাওয়ালা লোক পাওয়া যায় কি না।

আবার আমার ক্লাইভ স্ট্রীট পরিক্রমা শুরু হল। মায়াবিনী কি সত্যিই আমাকে ছলনা করল? তবে এবারকার পরিক্রমাটা একটু ভদ্র রকমের, অর্থাৎ হাতে একটা মূল্যবান পসরা রয়েছে, যার টাকা আছে—এসে সাথে যোগদান করতে পার। দিলীপদা বলে দিয়েছিলেন, ওয়ার্কিং পার্টনারসিপ-এর যে-অংশটা ওর ছিল, তার বিনিময়ে একজন নতুন ফিনেনসিয়ার পার্টনার যদি পাওয়া যায়! আমি আমার পসরা মাথায় করে ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বাঙ্গালী, গুজরাটী, ভাটিয়া, সাহেব কাউকে বাদ দিলাম না। সবারই টাকা দেবার আগ্রহ প্রবল, কিন্তু প্রধান শর্ত হচ্ছে, কোম্পানীটাকে লিমিটেড করে নিয়ে ম্যানেজিং এজেন্সি তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। দিলীপদা ডিরেক্টর থাকবেন—তার টাকার আন্দাজ শেয়ার থাকবে—আমরা দুজনে দুটি qualification শেয়ার নিয়ে ডাইরেক্টার থাকব। যদি এ শর্ত গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে যত টাকা চাই পাওয়া যাবে।

মিস্টার হার্টম্যান তক্ষুনি রাজি হলেন। তার তখন গত্যন্তর ছিল না। My prestige is at stake, তিনি বললেন। Draft যদি dishonoured হয়ে যায় তাহলে তিনি জার্মানীতে মুখ

দেখাতে পারবেন না। কিন্তু সিনিয়র পার্টনার দিলীপ দত্ত সহজে রাজী হবার নন্। এমন শাঁসালো ব্যবসা। একজন ব্যবসায়ীকে তিনি অফার দিলেন, তাঁর নিয়োজিত সব টাকার সাথে আরও এক লাখ টাকার গুড উইল পেলে তিনি কোম্পানী ছাড়তে রাজী আছেন। কিন্তু তাতে সে ব্যবসায়ী রাজী হল না। কারণ তখন সবাই বুঝতে পেরে গেছে যে আমাদের টাকার বড়ই প্রয়োজন।

বহু নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করার পর শেষকালে বিঠলদাস বলে এক লক্ষপতি ধনী ব্যবসায়ী আমাদের কোম্পানীতে এলেন। বলতে গেলে দিলীপদা হেরে গেলেন। বিঠলদাস কোম্পানীটাকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করে নিজে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হলেন। দিলীপদা আর আমরা দুজন ডাইরেক্টার হলাম। দিলীপদার এক লক্ষ টাকার শেয়ার থাকল—কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার। বিঠলদাসেরও একলক্ষ টাকার শেয়ার থাকল কিন্তু সবটাই অর্ডিনারী শেয়ার। দিলীপদার বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা বিঠলদাস ফেরত দিয়ে দিলেন। অর্ডিনারী শেয়ার বেশী থাকায় বিঠল দাসের হাতে কোম্পানী চলে গেল—দিলীপদা অবশ্য পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার-এর জন্য শতকরা আট টাকা হারে সুদ পাবার আশ্বাস পেলেন। বিঠলদাস অঙ্গীকার করলেন, প্রয়োজন হলে তিনি কোম্পানীকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার দিতে পারেন। তবে ধারের শর্ত সময়মত ঠিক করা হবে। দিলীপদা তাঁর অবস্থা বুঝতে পারলেন—কিন্তু উপায় ছিল না। ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীটের মনে দয়ামায়ার লেশ মাত্র নেই। আমি আর মিস্টার হার্টমান নাম্‌কা ওয়াস্তে ডিরেক্টার রইলাম, তবে ঠিক হল যে নেট আয়ের ১০% করে আমরা পাব। মন্দ কি? আমি ভাবলাম ব্যবসার যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে করে ছ'মাস পর থেকে মাসে দেড় দু' হাজার টাকা রোজগার হতে পারে।

ফ্যাক্টরী-র draft ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিয়ে খালাস করা হল—অফিসটাকে আরও বড় করা হল—দিন দিন ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে

লাগল। ছলনাময়ীর উদ্দেশ্য কি? ওকি আমাকে সত্যিই ভালবাসে—না মাঝে মাঝে আলো আঁধারের খেলা দেখিয়ে আমাকে ছলনার মায়াময় পথে টেনে নিয়ে যেতে চায়!

১৯৫১ সালে দেশের প্রথম ইলেকশন্ এল। প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে! যার যা অস্ত্র আছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ছাড়া হতে লাগল। প্রতিপক্ষ রোজ স্নান করে কিনা, কি তেল মাখে, কি দিয়ে ভাত খায়, তা জনসাধারণের এতদিনে জানা হয়ে গেছে। আমি অনেক সময় ভেবেছি, পাঁচ বছর পর পর যে নির্বাচন হবে, তাতে করে আর কিছু হোক না হোক, কয়েক হাজার বিশিষ্ট লোকের জীবন ইতিহাস দেশের লোকের কাছে জানা হয়ে যাবে। কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা যে ব্যয় হতে লাগল, তার ঠিকানা পাওয়া মুশকিল। আর কথা মাপবার যদি কোনো যন্ত্র থাকতো তো দেখা যেত যে যত কথা বলা হচ্ছিল, সেগুলি একটার পর একটা সাজিয়ে রাখলে পৃথিবী থেকে আকাশের যে কোন গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত গিয়ে ঠেকতো। কিন্তু তবুও স্বাধীন ভারতের প্রথম গণভোটের নির্বাচন। আড়াই শ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমরা সবাই বুক ঠুকে বলতে পারছি যে আমরা স্বাধীন—আমাদের চিন্তার, বাক্যের এবং কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। নির্বাচনের ফল বেরুতেই দেখা গেল অনেক সর্বনাশা ব্যাপার ঘটেছে। ঝড়ে কখনও মহীরুহ উৎপাটিত হতে দেখেছেন? বেশ বড় বড় দু'চারজন জাতীয় জীবনের মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হ'য়ে শেকড় আর ডাল পাতা নিয়ে চিত হয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগল। মনে হলো, বেশ কিছুদিন হলো তাদের শেকড়গুলো মাটি থেকে আলগা হয়ে এসেছিল, কিন্তু কেউই তা বুঝতে পারে নি, এমনকি তারা নিজেরাও না। আর তাদের বদলে যারা জয়লাভ করে মাটিতে নতুন করে শেকড় প্রসার করল, তাদের

অনেককেই দেশের লোক জানে না—তারা কেষ্টু বিষ্টু কেউ নয়—আমার আপনার মত সাধারণ ছা'পোষা লোক। কোনও রকম করে দিন আমে দিন খায়। দিকে দিকে হাহাকার শুরু হল—একি সর্বনাশ। এই যে সব রহুকালের অচলায়তন ভেঙ্গে পড়ছে এর পরিণাম কি? এর শেষ কোথায়?

অচলায়তন ভেঙ্গে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে—বাজারে চাকরি নেই। বিশেষ করে কলকাতায় বাঙ্গালী যুবকরা বেকারত্বের চাপে নুইয়ে পড়েছে। পণ্য ব্যবসায়ী মহলের অবস্থাটা একটু ভাল চলছিল—কারণ তখন কোরিয়ায় যুদ্ধ চলছে। কোথায় চার হাজার মাইল দূরে দু'দলে বিবাদ হচ্ছে, আপনার পাড়ার ষ্টেশনারী দোকানে দাড়ি কামাবার ব্লেডের দাম দু'পয়সা বেড়ে গেল। বাজারে যা কিনতে যাবেন তারই দাম চড়া। বিদেশ থেকে আসে নি এমন জিনিসের দামও চতুর্গুণ হয়েছে। কোরিয়ায় যেহেতু যুদ্ধ চলেছে, সেই হেতু ক্লাইভ স্ট্রীটের ব্যবসায়ীদের মালের দাম চড়ানোর জন্মগত অধিকার রয়েছে। আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, কারণ কি? কারণ কিছু নয়—কারণ হচ্ছে, কোরিয়া থেকে যাদুমন্ত্রবলে যুদ্ধটা ক্লাইভ স্ট্রীট পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারে তো? আর তা যদি নাও বা এল, তা হলেও যুদ্ধ-বিগ্রহের আবহাওয়ার মধ্যেই তো দু-পয়সা বেশী কামাবার মওকা মেলে। সব সময়েই তো ব্যবসায়ে লাভ হয় না! মাঝে মাঝে দু-একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ, মড়ক না লাগলে ব্যবসায়ে লাভ হবে কোত্থেকে? আপনাদের ধারণা ব্যবসায়ীরা সব সময়েই লাভ করছে; তা নয়—পয়সা দু-চারটে যা কামানো যায়, তা যুদ্ধের সময়ে—মানুষের যখন চরম দুর্দ্দিন। তখন তাকে আরও ঠকাও, আরও প্রতারণা কর—তার মৃত দেহের ওপর তোমার স্বর্ণসোপান তৈরী কর। ভারতবর্ষে যদি ধনীদের বিত্তের সন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে পঞ্চাশ বছর ধরে যে ব্যবসায়ী পাঁচ লাখ টাকা কামাতে পারে নি, একটা যুদ্ধের দুই

বছরের মধ্যে তার দশগুণ অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখ টাকা কামিয়েছে। তাই, যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যবসায়ী সমাজের একটা বড় প্রার্থিত জিনিস। কোরিয়ায় যেদিন যুদ্ধ লাগল সেদিন আমি আপনি হয়তো দুশ্চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লাম—কেন আবার সেই অর্থহীন জীবন নিয়ে খেলা—কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের চিড়িয়াখানায় সেদিন শেয়ারের দাম শেয়ার প্রতি দশ টাকা বেড়ে গেল। সেই চিড়িয়াখানার অধিবাসীদের মুখে লালসার হাসি—কিছু কামানো যাবে! আপিসে আপিসে সাজ সাজ রব। যেখানে যে-মাল আছে সরিয়ে রাখ। সাতদিন মাল বেচবে না—দেখা যাক্ ব্যাপার কি রকম দাঁড়ায়—যে হরলিকস্ বা মিল্ক পাউডার এতদিন পাঁচ টাকায় কিনেছেন, তারই দাম রাতারাতি সাত টাকা হয়ে গেল। ইকনমিস্টরা বলেছেন, ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাই দিয়ে জিনিসের দাম স্থির হয়—কিন্তু গত পঁচিশ বছরের মধ্যে একথার সত্যতা কখনও প্রমাণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই যদি হতো তা'হলে কোরিয়ায় যুদ্ধ লাগার পরের দিন সকালে ব্লেডের দাম প্রতি ডজনে এক আনা বাড়ল কি করে? পৃথিবীর কোনো পরিসংখ্যানবিদ বলতে পারেন কি, যে দশ ঘণ্টার মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত নাবালকরা এমন দাড়ি গজিয়ে বসে থাকল যে যার জন্য ব্লেডের চাহিদা হু হু করে বেড়ে গেল? ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা জানিনে, কিন্তু বাংলাদেশে গত বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে যত সব দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার সবগুলোই কৃত্রিম, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। চালের দাম বিশ টাকার জায়গায় বত্রিশ টাকা দিন, কত চাল চাই আপনার? এমন ঘটনা একটাও শুনি নি যে কেউ টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরছে অথচ চাল কিনতে পারছে না। এ হতে পারে না। পাওয়া সবই যায় এবং যাবেও—তবে কথা হচ্ছে কত দামে পাওয়া যাবে। সমাজ জীবনের স্তরে স্তরে classical economistদের demand and supply-এর theory মরে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও আমাদের পাঠ্য পুস্তকে এ theory রয়েছে। এবং

আমাদের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতায় এর নির্ভুলতা সম্বন্ধে দশ-বিশ পৃষ্ঠা লিখতে হচ্ছে।

পুরো আড়াইটে বছর জিনিসের অগ্নিমূল্যতা দেশের লোককে একটা মর্ম্মান্তিক অথচ সত্য বাস্তবমুখী চিন্তাধারার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল—জিনিসের দাম কি কমবে? ইনফ্লেশনের ভূতকে ভয় দেখাবার জন্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। হারমোনিয়ামের reed খারাপ হলে যেমন একটা ধরে চাপলে আর একটাতে শব্দ হতে থাকে, ঠিক সেই রকম রামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো তো শ্যাম দাঁড়িয়ে উঠে বলল—ঘাবড়াও ম্যাৎ, হাম হ্যায়। বড় কর্তারা কিছু কিছু রাঙা চোখ দেখাচ্ছেন সন্দেহ নেই—নইলে সাধারণ লোকেরা বড্ড চেঁচামেচি করে, মিছিল করে, আবেদন পত্র পাঠায়, কাগজে লেখে। ডেমোক্র্যাসির পক্ষে এগুলি খুব স্বাস্থ্যকর ব্যাপার নয়। নির্বাচনে মহীরুহ উৎপাটিত হবার পেছনে আসলে রয়েছে দেশের জন-সাধারণের দুর্দ্দশা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃসহ বেকারত্ব, আর তারই পাশাপাশি কতকগুলি লোকের অস্বাভাবিকভাবে ফেঁপে ফুলে ওঠা। চোখ বন্ধ করে মানুষ কতদিন থাকতে পারে? আপনি যত কায়দা করেই পূঁতিগন্ধময় সমাজ ব্যবস্থাকে ডিসটেম্পার করে সুদৃশ্য করে তোলার চেষ্টা করুন না কেন, সব কিছু ভেদ করে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবেই। কিন্তু তবুও বড়কর্তাদের হুঁস নেই—যারা অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলেতে লাগল তাদের অত্যন্ত কুৎসিৎ, কদর্য্য বলে গালাগালি দেওয়া হল। বলা হল ওদের ঐতিহ্য নেই, জীবন-দর্শন নেই—ওরা শুধু চীৎকার করে কতকগুলি লোককে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন অনেক লোক একসঙ্গে ভুল করে বসে, তখন সেটা ভুল থাকে না—সেটা হয় একটা নতুন মানসিকতা বা চিন্তাধারা।

* * *

আমাদের কোম্পানীও কোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করল। যে সমস্ত ওষুধ বা রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ থেকে এসেছিল, সে গুলির দাম বাড়িয়ে দিয়ে লাভ হল প্রচুর। কিন্তু লাভ হলে কি হবে? বছর শেষে যখন আমি আর হার্টমান সাহেব ভাবছি যে হাজার কয়েক টাকা পাওয়া যাবে, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিঠলদাস একটা ব্যালেন্স সীট বের করে দেখালেন, কোম্পানীর প্রথম বছরেই আঠার হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। হার্টমান হঠাৎ খেপে উঠে বললেন—I am fed up—its a continental mess—it's impossible. বিকেলে আপিস ছুটি হবার পর accountant মিঃ দাশগুপ্তকে ডেকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম। দাশগুপ্ত বললেন—লোকসান তো হবেই স্যার—সাহেবের পুরো বিলেত ঘোরবার খরচটা যে load করা হয়েছে।

—সেটা কত টাকা হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দাশগুপ্ত বললেন—তা প্রায় দশ হাজার টাকা হবে।

—এই রকম আর কি কি খরচ করা হয়েছে বলুন তো?

—একটা ভাঙ্গা এয়ার কনডিসন মেশিন কেনা হয়েছে সাত হাজার টাকা দিয়ে।

—তার মানে?

মেসিনটা সাহেবের বাড়িতে পড়ে ছিল। সাহেব সেটা আপিসকে বেচে সেই টাকা নিয়ে নিজের বাড়ির জন্য আর একটা নতুন মেসিন কিনে নিয়েছেন।

—এয়ার কনডিশন মেসিন কেনা হল কেন?

—ড্রাগস কনট্রোল থেকে লোক এসে বলে গিয়েছিল অনেকগুলি ওষুধ কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হবে।

—এই তো গেল সতের হাজার—আর বাকীটা?

—বাকীটা stamp খরচার খাতে ব্যয় হয়েছে।

—সে তো হবেই—আমি বললাম।

—তা নয় স্যার—দাশগুপ্ত বললেন—সাহেবের বাপ, বোন এবং আত্মীয়স্বজনদের কলকাতার প্রায় সব বাড়ির চিঠি আপিস থেকে পোষ্ট করা হয়। সে বড় কম চিঠি নয়—রোজ পনের ষোল খানা করে হবে'খন—আর তাছাড়া সবগুলিই বিলেতের ডাক।

ব্যালান্স শীটটা রাত্রিবেলা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। বিলেত ঘোরবার খরচটা ধরা হয়েছে বেটারমেণ্ট অফ্ বিজনেস্-এর খাতে। মন্দ নয়! বিঠলদাস নতুন-বিয়ে-করা বউ নিয়ে প্যারিস-লণ্ডন আর রোমে Honeymoon করে এলেন—খরচটা বয়ে মরল কোম্পানী। দোষ কাটাবার জন্য অবিশ্যি একবার প্রিন্সিপালদের ফ্রাঙ্কফুর্ট অফিসে ঘুরে আসা হয়েছে। এয়ার কনডিসনিং-এর যে মেসিনটা কেনা হয়েছে তা বেচলে একশ' টাকাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। রাত্রিতে ঘুমুতে পারলাম না। এত কষ্ট আর পরিশ্রম করে যে-ব্যবসাকে অপত্য স্নেহে লালন পালন করে বড় করে তুলেছি সেখানে আমার অবস্থা সৎমায়ের চেয়েও করুণ। আমি আর মিঃ হার্টমান দু-শেয়ারওয়ালা ডাইরেক্টর—কোম্পানীতে আমাদের আইনগত অবস্থা যাই হোক না কেন, আসলে যে আমরা চিরকালের জন্য প্রোলেটারিয়েট সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই। শেয়ারের জোরে ভোট হয়—আমরা ব্যবস্থাপনার মধ্যে দাঁত ফোটাতে কখনই পারব না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। দিলীপদার সঙ্গে দেখা করতে হবে—ওঁর মত কি? লোকসান তো ওঁরই বেশী হবে।

পরের দিন দিলীপদার হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শুনলাম তিনিও ব্যালান্স শীট দেখেছেন। কিছু বুঝিয়ে বলবার পর কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন—পৃথ্বীশ, বিঠলদাসকে বলো, আমার শেয়ারগুলো ও কিনে নিক্—আমার এখন টাকার বড় প্রয়োজন। আর তা ছাড়া আমি ওর সঙ্গে চালাকি করে পারব না। ও কোম্পানী ম্যানেজমেণ্টে একটি আস্ত ঘুঘু। ও শেষ পর্যন্ত আমাকে পথে বসাবে। আসল কথা, দিলীপদার বিঠলদাসের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সময় নেই। তিনি সেই শ্রেণীর বাঙ্গালী

ব্যবসায়ী—যারা আজও মিলিটারী কনট্রাক্টরীর স্বপ্ন দেখে। ওষুধের ব্যবসায় যত লাভই হোক্ না কেন রাতারাতি বড়লোক হবার কোনও সুযোগ নেই। কলকাতায় এসে অবধি তিনি এমন একটি ব্যবসা খুঁজছিলেন, হয়তো যাতে করে বছরে দু'চার লাখ টাকা আসে। ওষুধের ব্যবসাটা করতে রাজী হয়েছিলেন খানদানী ব্যবসায়ী মহলে একটুখানি জায়গা করে নেবার জন্যে। শুনতে পেলাম দিলীপদা এর মধ্যেই ফ্লিম প্রোডাকশনের কাজে লেগে গেছেন। বাবা ও স্ত্রীর নামে যে টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট ছিল, তার থেকে ওভারড্রাফট্ নিয়ে তিনি নেমে পড়েছেন।

তাঁর নতুন ব্যবসা নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলেন যে বিঠল-দাস যে তাঁর লাখ টাকা পয়জার করে দেবার চেষ্টায় আছেন সে-সম্বন্ধে ভাববার তাঁর সময় ছিল না। একটা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত, অত্যন্ত উচ্চস্তরের নিশ্চিত ব্যবসা ছেড়ে তিনি জুয়া খেলায় লেগে গেছেন। যারা তাঁকে এ-ব্যবসায় টেনে নামিয়েছেন তারা বুঝিয়েছে যে একখানা হিট পিক্‌চার হলে ছ' সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ হতে পারে। সরোজবাবুর কথাই ধরুন না—মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে প্রোডাকশন শুরু করে আজ দু' চার লাখ টাকার মালিক। অনায়াসে বা অতি আয়াসে বড়লোক হবার এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া দিলীপদার পক্ষে সম্ভব নয়। ওষুধের ব্যবসার জন্যে তিনি ওভারড্রাফট্ নিয়ে টাকা যোগাড় করতে পারলেন না বলেই বিঠলদাসকে খুঁজে বের করতে হয়েছিল। অথচ ফ্লিম প্রোডাকশনের ব্যবসাতে সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি করে ফেলতে পেরেছেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা লাখ টাকার আশা দিয়ে তাঁকে ছলনা করছে—কিন্তু তারা একটা কথা বেমালুম চেপে গেছে যে মরীচিকার পেছনে ছুটে দিলীপদার মত বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। Studio-র নেশা একবার পেয়ে বসলে তার থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুশকিল। ফ্লাড লাইটের সঙ্গে নারীকণ্ঠের কাকলীধ্বনী মিলিয়ে টালীগঞ্জের রাত্রিগুলি বড়ই মায়াময় হয়ে ওঠে।

মিঃ হার্টমান এবং আমার সঙ্গে ঘনঘন কনফারেন্স হতে লাগল। দিলীপদার মনোভাব সাহেবের কাছে বলতে তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন—He was the only weapon in our hands। সেদিনও বিকেলবেলা অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গী দিয়ে যাচ্ছিলাম। দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে বিঠলদাসের ভবিষ্যৎ প্ল্যান আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। বিঠলদাস লোকসান দেখিয়ে দেখিয়ে বছর তিনেক বাদে মিঃ দত্তর লাখ টাকার শেয়ার পঁচিশ হাজার টাকায় কিনে নেবেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ওষুধের ব্যবসার ভবিষ্যৎ সমূহ উজ্জ্বল।

স্বাধীনোত্তর বছরগুলিতে বড়কর্তারা এমন প্রাণ খুলে ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স ছেড়েছেন যে পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে বিলেতের স্টারলিং ব্যালান্স এর ভাণ্ডার নিঃশেষিত প্রায়। দিল্লীতে হায়-হায় রব উঠল—এখন উপায়? এ যা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে করে তো অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও বিদেশ থেকে আর আনা যাবে না। অমনি অর্ডার হল, ছুরি-কাঁচি চালিয়ে সব ইমপোর্ট লাইসেন্স কেটে দাও! এক লাখ টাকার লাইসেন্সকে কেটে বিশ হাজার টাকায় নামিয়ে আন। ক্লাইভ স্ট্রীটের আপিস-গুলিতে তখন কি করুণ আর্তনাদ। বড় কর্তাদের কাছে হাজার হাজার দরখাস্ত আসতে লাগল—ইমপোর্ট লাইসেন্স এমন করে কেটে দিলে অনেক আপিস বন্ধ হয়ে যাবে, অনেকের চাকরি যাবে। বিঠলদাস এই সুযোগ খুঁজছিলেন—একবার কোটা সিস্টেম হলেই হয়—নতুন ফার্মগুলি আমদানী করতে না পারলেই হয়! আড়াই লাখ টাকার মাল আমদানী করে যা লাভ করা যায় নি এবার পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল এনে তার চতুর্গুণ লাভ হবে! এমন মওকা জীবনে কবারই বা আসে? মিঃ দত্তর শেয়ারগুলি কিনে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি তাঁর কাজ গোছাতে পারেন।

হার্টমান সাহেব মনমরা হয়ে গেলেন। ওঁকে আমি কিছুতেই আর বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না। আর বোঝাবই বা কি করে? দু-দুটো চান্স নিলাম—দুটোই ভেস্তে গেল। একদিন আপিসে এসেই হার্টমান বললেন—Well Ghosh, I have decided to fly back home.

অনেক করে বুঝিয়ে বললাম। কোনও লাভ হল না। ওদের দেশের লোকরা সারা জীবন এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হার্টমান সাহেব দেশে ফিরে গেলেন। ওকে যেদিন দমদমে see off করে দিলাম—সেই দিনই কোনও এক অনাগত দুর্দিনের ছায়া আমার সামনে দেখা দিল। ওঁর জন্যে মনটা খুবই খারাপ হল—ক্লাইভ স্ট্রীটে হঠাৎ-দেখা একজন বিদেশী যুবককে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলাম—আর চেয়েছিলাম কেন—বেঁধেও ছিলাম। কিন্তু ব্যবসার জগতে আমাদের মত নির্ধনী লোকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। সেরেফ্ দাবার ঘুঁটির মত চালনেওয়ালার ইচ্ছেমত চালিত হচ্ছি। তাই হার্টমান-এর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে পারলাম না। দূরের জন আবার দূরেই চলে গেল। তবে মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে পরকে আপন করার কোন চেষ্টারই কসুর করি নি।

হার্টমান চলে যাবার পর বিঠলদাসের সঙ্গে আর বড় একটা দেখাশুনা হয় না। আপিসে যাই, কাজ করি, চলে আসি। কিন্তু এমন করে লুকিয়ে চলব ক'দিন? ব্যালান্স শীটটা সম্বন্ধে আলাপ করতেই হবে। তাই একদিন বাধ্য হয়ে বিঠলদাসকে বললাম—ব্যবসার বেচাকেনা, লাভ লোকসান সবতো আমাদের হাত দিয়েই হয়েছে—আঠারো হাজার টাকার লোকসান কি করে হল? বিঠলদাস নানাপ্রকার উদ্ভট উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল—সেটা হচ্ছে যে দু'শেয়ারওয়ালা ওয়ার্কিং ডিরেক্টর-এর কোম্পানীর ভেতরকার খবর জানবার কোনও অধিকার নেই।

আমি বললাম—বিঠলদাসবাবু, কোম্পানীতে আমারও তো স্বার্থ রয়েছে—লাভের শতকরা দশভাগ আমার পাওনা রয়েছে।

বিঠলদাস বললেন—ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মাইনে এবং অন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে যা থাকবে তার দশ ভাগ আপনার প্রাপ্য। তারপর একটু মুচকি হাসলেন।

হাসির অর্থটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে—এ-জীবনে সে দশ ভাগ লাভের মুখ তুমি চোখে দেখবে না বাছাধন!

আমিও যে তা বুঝতে পারছিলাম না তা নয়—ভাঙ্গা Air conditioning machine-এর দাম, বিলেতে হানিমুন করবার খরচা আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এর মাসিক চার হাজার টাকা ভাতা বাদ দিলে কোম্পানীর আর থাকবে কি?

অনেকদিন উমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। বন্ধু-বান্ধব মহলে ওর সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুনছিলাম। কথাগুলি খুব ভাল নয়। কেউ বলছিল—উমা বাজারে লাখ টাকা ধার করেছে, কেউ বা বলছিল—উমার স্ত্রী গ্রেট ইষ্টার্ন, গ্র্যাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। সুধীন চ্যাটার্জী একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল—উমার খবর রাখ?

আমি বললাম—না, তবে শুনছি অনেক কথা।

উত্তেজিত ভাবে সুধীন বলল—চারশ' বিশ হয়ে গেছে—একটা letter of credit দেখিয়ে পাঁচজন লোকের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। পঁচাত্তর টাকার বাড়ি ছেড়ে চারশ টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, গাড়িও একটা কিনেছে। Really, he is a disgrace. একদিন গিয়ে ওকে একটু সমঝে দিয়ে এসো—তোমার তো ছোটবেলাকার বন্ধু। ওর বউ-এর খবর জান না বোধ হয়—শর্বরী দেবী এখন উড়ছেন গো!

উমার ব্যক্তিগত জীবনের কোনও ক্লেদাক্ত ঘটনা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি বললাম—সুধীন, যা শোন তার

সবটাই সত্যি নাও হতে পারে—অমন করে মানুষের নামে দোষারোপ করো না।

সুধীন চলে গেল। কিন্তু আমি তখন ভাবনা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। যে-সমস্ত ঘটনার কথা শুনতে পেলাম তার যে কোনও একটা সত্যি হলেই আমাকে বুঝতে হবে যে উমার জীবনে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে।

আর দেরি করতে না পেরে সেদিন সন্ধ্যেবেলাই উমার বাড়িতে গেলাম। পেল্লায় এক বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। দু' দুটো ড্রইং-রুম। সামনের ঘরটাতে তিনটে বইয়ের আলমারী। সোফা দিয়ে দুটো ঘরই সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। উমা বাড়ি ছিল না—শর্বরী দেবীও নন। মিনিট কয়েক বসতেই উমা গাড়ি চেপে এসে উপস্থিত হল। ভাল করে ওর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—পোশাক-আসাকে অসাধারণ পারিপাট্য কিন্তু মনের আরশি মুখটা যেন অসম্ভব রকমের পাণ্ডুর আর নিস্তেজ। আমাকে দেখেই মুচকি হেসে বলল—মনে পড়েছে অ্যাদ্দিন পরে?

—মনে তো তোমারও পড়তে পারত, উমা—তাছাড়া এখন তো গাড়ি কিনেছ, ভাববার কি আছে। যখন তখনই তো আমাদের মনে করতে পার।

গাড়ির কথাটা বলতেই উমার মুখটা যেন অস্বাভাবিকভাবে গম্ভীর হয়ে উঠল। ও আমার কাছ ঘেঁসে বসল। আমার হাতের ওপর হাতখানা রেখে চুপ করে চোখ বুজল—যেন আমাকে কিছু বলতে চায়—কিন্তু বলতে পারছে না। আমি ওর হাতের ভাষা বুঝলাম। ওর প্রতিটি শিরায় শিরায়—তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে সঙ্গীত তখন বাজছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। সে সংগীত আবেগময় ক্রন্দনের, ভাষাহীন দুঃখের।

আমি বললাম—উমা, একটা গভীর ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

—ঠিক বলেছ পৃথ্বীশ, আমাকে ক্ষয় রোগে ধরেছে।

—তা তো ধরবেই, যার এক পয়সা আয় নেই, তাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই অদ্ভুত বিলাস সজ্জার খরচা চালাতে গেলে ক্ষয়রোগের কবলে পড়তে হবে,-এ তো খুব স্বাভাবিক কথা।

—আমি বড্ড ক্লান্ত, উমা বলল।

ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলাম। ততক্ষণে উমার দু-চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমি বললাম—উমা, ঘুষ দিয়ে স্ত্রীর ভালবাসা কিনতে চেষ্টা করছো?

—উপায় নেই ভাই, উমা বলল, শর্বরীকে আমি আজও পাই নি।

—তাকে তুমি কখনও পাবে না। তুমি যতই নিজেকে নিঃশেষ ক'রে তাকে দিতে চাইবে, ততই সে ভাববে তুমি দুর্বল। ওদের ভাষায় বলবে How Silly!

—তুমি কি বলতে চাও, চিরকাল ওর আর আমার মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান থাকবে?

—না, আমি বললাম, যখন ওর যৌবন ফুরিয়ে যাবে, ওদের সোসাইটিতে যখন ওর প্রবেশাধিকার থাকবে না তখন তুমি ওকে পাবে—তার আগে নয়।

—তা হলে আমার জীবনটা কি এমনি ব্যর্থ হয়ে যাবে, পৃথ্বীশ, উমা করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—জীবনটা ব্যর্থ হবে বলতে পার না, তবে যৌবনটা ব্যর্থ হলো তাতে সন্দেহ নেই। তুমি এখন থেকেই মালা গাঁথতে থাকো আর অপেক্ষা কর সেই দিনের জন্য যেদিন বিগতযৌবনা শর্বরী দেবী তোমার কোলে আশ্রয় নিতে আসবেন—বলতে গেলে সেই দিনই তোমার জীবনের প্রথম মধু-চন্দ্রিকা যাপন করা হবে।

উমা মাথা নীচু করে আমার কথা শুনছিল। হঠাৎ আমাকে কিছু না বলে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

শর্বরীর সঙ্গে উমার দুস্তর মানসিক ব্যবধান রয়েছে। উমা স্বচ্ছ সরস, প্রাণবন্ত আর শর্বরী ধোঁয়াটে, বক্র এবং ক্ষীণজীবি। দুজনের গতিপথ ভিন্ন। একজন সুস্থ, সবল পথ ধরে জীবন পরিক্রমা

করতে চায় আর একজন অস্বাস্থ্যকর মনের হাজার রকম বিকৃতি নিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। জীবন কি—এর পরিণতি কি, তাই শর্বরী দেবী জানেন না। তিনি শুধু শিখেছেন নিজেকে শতরূপে বিকাশ করতে, দেহসৌষ্ঠবকে হাজার জনের কাছে হাজার ভাবে তুলে ধরতে। হাততালি পাবার প্রবল আকাঙ্খার স্রোতে আর সব কিছু তলিয়ে গেছে। বিয়ের অব্যবহিত পরেই উমা এই অসঙ্গতি টের পেলো। ও কিন্তু শর্বরীকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছিল, ভেবেছিল সুখে দুঃখে শর্বরী ওর প্রকৃত সহচরী হবে। যখন তা হল না তখনই উমার মনে এলো বিকৃতি—যে-মন এতদিন কাঁচের মত স্বচ্ছ ছিল সেই মনে নানা প্রকারের সন্দেহ আর ভুল বোঝা বুঝি প্রবেশ করল। শর্বরী বড় বাড়ি পছন্দ করেন, চারশো টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল ; শর্বরী সাজানো ড্রইংরুম আর গাড়ি ভালবাসেন—এলো ড্রইং রুম সাজানোর হাজার উপকরণ আর একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি। অথচ উমার রোজগার বলতে তখন কিছুই নেই। কেরোসিন তেলের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে ; একটা ষ্টেশনারী দোকান দিয়েছিল তারও অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—কোনও রকমে মাসে দু' তিনশো টাকা রোজগার হচ্ছে। শর্বরী দেবীর আয় মাসিক তিন শ' টাকা—দু'জনের আয় মিলিয়ে তাদের ছোট্ট সংসারে সুখের অভাব হবার কথা নয়। শর্বরী হয়তো একেবারে হৃদয়হীনা নন—সব কিছু খুলে বললে তিনি নিশ্চয়ই উমাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু সন্দেহ এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা উমার মনে তখন স্বাভাবিক সুন্দর চিন্তাধারা মরে গেছে। ওর ভালবাসা তখনই বিকৃত রূপ ধারণ করল—কি করে শর্বরীর মনের গহনে প্রবেশ করা যায়—কি করে তার হৃদয় জয় করা যায়।

বুঝতে পারছিলাম ওর সম্বন্ধে সুধীন চ্যাটার্জী সেদিন যে-সমস্ত নালিশ জানিয়েছিল তা সবই সত্যি—অর্থাৎ অবস্থার হেরফেরে একজন অতি সুস্থ, সবল উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ এই উমাকেই নিজের ব্যবসাকে

পঙ্গু করে ফেলে বিপদগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধবকে হাজার হাজার টাকা সাহায্য করতে দেখেছি। কারুর বিপদ দেখলে ও স্থির থাকতে পারত না। সেই উমাকে দেখলে আজ বন্ধু-বান্ধবেরা নাক সিঁটকোয়—অপমানজমক উক্তি করে।

আসল কথা উমা ভুল পথে যাচ্ছিল। অর্থ আর লালসার সামগ্রী জুগিয়ে নারীর দেহ হয়তো পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মন পাওয়া যায় না। উমাকে বহুদিন আমি একথা বলেছি কিন্তু কোনও লাভ হয় নি। মুখে পৃথিবীর সব যুক্তিকেই ও মেনে নেয়, চাই কি আমি যা বলব তা ও নিজেই আগে বলে ফেলে অথচ কাজের বেলায় ঠিক উলটো।

যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের জোয়ার আসে, আবার ঠিক যুদ্ধোত্তর কালে আসে ভাঁটা—সে-ভাঁটার টান অনেকেই সহ্য করতে পারে না। যাদের প্রচুর অর্থ থাকে না, তাদের তখন নিদারুণ দুর্দিন আসে। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি কোরিয়ার যুদ্ধ যখন থেমে গেল, ক্লাইভ স্ট্রীট ভাঁটার টানে পড়ে গেল। বহু আশা করে ব্যবসায়ীরা যেসব মাল কিনে গুদামজাত করে রেখেছিল, তার দাম পড়তে শুরু করল। লাভ করা তো দূরের কথা, যে-মাল পাঁচ টাকা পাউণ্ডে কেনা হয়েছিল তা বাজারে তিন টাকা পাউণ্ডে বিক্রী হ'তে লাগল। ডিম্যাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর থিওরী অচল, তাই কার কাছে কত মাল আছে, আর শেষ পর্যন্ত দাম কতদূর পর্যন্ত পড়বে কিছুই জানবার উপায় নেই। বাজারে রব উঠল—বাজার পড়ছে। যেই না রব ওঠা আর কথা নেই, যে যার মাল বেচা শুরু করল। বহু ছোট ছোট বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান এই ধাক্কা আর সামলাতে পারল না। লোহা-লক্কড় থেকে শুরু করে চুলের পিন পর্যন্ত সব কিছুরই দাম পড়তে লাগল। মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে

একদিন রাস্তায় দেখা—হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন—ভাই, যা পাঁচ দশ হাজার টাকা কামিয়েছিলাম সব তো গেছেই—আরও ঘর থেকে কিছু যাবার মুখে। কি সর্বনাশা ব্যাপার বলুন তো! আমি বললাম—অত মাল কিনে মাথায় ক'রে রেখেছিলেন কেন বলুন তো? লাহিড়ী বললেন—আরে মশাই, চড়তি বাজার যে কখনও পড়তি হবে তা কি আমাদের খেয়াল থাকে? সবাই কিনছে আমিও কিনলাম।

এ অবস্থারও তারতম্য আছে। যখন বেশীর ভাগ লোক মাল বেচে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তখন ক্লাইভ স্ট্রীটের এখানে-ওখানে দু-চারজন মিলে মালগুলি সব কিনে ফেলতে শুরু করল। এই তো চাই! এই রকম দু'একটা সুযোগ-সুবিধা না পেলে পয়সা রোজগার হবে কোত্থেকে? মাল কিনতে কিনতে এরা গুদাম ভরে ফেলল। এমন কি বে-পাড়ায় দু'চারটে গুদামও ভাড়া করে ফেলল। যখন বেচবার মরশুম শেষ হল, তখন বাজারের অবস্থা বর্ষা শেষের স্রোতস্বিনী নদীর মতো। কিন্তু যারা এই বাজারে মাল কিনল তারা যে কোনো মুহূর্তে সাগর-সঙ্গম থেকে আসা প্রবল জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যে মাল তিন টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে তার দাম পাঁচ টাকা হ'ল বলে—দু'টো মাস সবুর কর। এই সবুর করতে না পেরেই ক্লাইভ স্ট্রীটের হাজার হাজার ছোট ব্যবসায়ী পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হল।

বিকেলের দিকে কিশোরীমল সুরজমলের সঙ্গে দেখা। তার মুখে নেই বিকশিত হাসি যার উৎস প্রচুর লাভ। লাভ না হলে এবং খুব ভালভাবে লাভ না হলে কিশোরীমল হাসেন না। আমি বললাম, কিশোরীবাবু, বাজার তো বড় খারাপ, আপনার ব্যবসার খবর কি? কিশোরীবাবু বললেন, বাবুজী, এখন হচ্ছে মাল কেনবার বাজার, যত পারো শুধু মাল কিনে যাও। দু'তিনটে মাস যেতে দিন, যখন লোকের ধারণা হবে বাজারে মালপত্র কিছু

নেই তখন আস্তে আস্তে মাল ছাড়ো। এই বলে কিশোরীমল আমাকে বেচাকেনার দর্শন বোঝাতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি দর্শনটা যে জীবনের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে, তা ক্লাইভ স্ট্রীটে আসবার আগে বুঝতে পারি নি। জীবনের প্রতিটি কাজে দর্শন শাস্ত্রের এমন প্রয়োগ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। কিশোরীমলের বক্তৃতার বেশীর ভাগ অংশ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না। তবে বেশ বুঝতে পারলাম যে ভদ্র-লোক এই পড়তির বাজারে লাখ লাখ টাকার মাল কিনে চড়তি বাজারের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমাদের কোম্পানীর অবস্থাও গুরুতর। অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট-এর কাছ থেকে যা খবর পেলাম, তাতে করে বুঝলাম যে-সব শেয়ার স্ক্রিপ্ট ব্যাঙ্কে রেখে বিঠলদাস ওভারড্রাফট নিয়েছিলেন, কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক ভাবে পড়ে যাওয়ায় বহু টাকার মাল পড়তির বাজারে বেচে ফেলতে হয়েছে। আগের বছরের ব্যালান্স শীট-এ আঠারো হাজার টাকার লোকসান দেখানো হয়েছে, পরের বছরের অবস্থাটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

দিলীপ দত্তও বুঝতে পারলেন যে তাঁর লাখ টাকার শেয়ারের দাম এখন বড়জোর ত্রিশ হাজার টাকা। আরও দশ মাস পরে ওটা বিশ হাজারেও এসে দাঁড়াতে পারে। একদিন তিনি বিঠলদাসকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁর শেয়ার বিক্রী করতে চান। কোম্পানীর নিয়মাবলীতে লেখা আছে—বাইরের লোকের কাছে শেয়ার বেচা চলবে না—কাজেই বিঠলদাসই একমাত্র খদ্দের। তিনি দাম দিলেন ছাব্বিশ হাজার টাকা। এক লাখ টাকার মূল্য তের মাসে ছাব্বিশ হাজার হয়েছে—আরও তের মাস পরে ছ' হাজার টাকাও তো হতে পারে। বিঠলদাস কোম্পানীর আইন খুব ভাল জানেন—বলতে কি Indian Companies Act-টা তাঁর মুখস্থ। দিলীপদার nervous breakdown হল। রক্ষা

সন্ধ্যের পর টালিগঞ্জের স্টুডিওতে একটা অবিস্মরণীয় আকর্ষণ রয়েছে—নয়তো অ্যাদ্দিনে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হত। আমাকে ডাকিয়ে তিনি আমার মতামত জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম—বিঠলদাসের এসব জোচ্চুরির বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদ করা উচিত—এক লক্ষ টাকার শেয়ারের দাম তিনি ছাব্বিশ হাজার দিচ্ছেন কোন সাহসে। কোম্পানীর আইনে আপনারও তো অধিকার কম নয়?

বৃথাই দিলীপদার হৃদয়ে সাহস যোগাবার চেষ্টা করছিলাম। টালীগঞ্জের স্টুডিও ওঁর মনে আমেজ এনেছে। যে করে হোক, যে দামেই হোক বিঠলদাসের কাছে শেয়ার বেচে দেওয়াই তিনি স্থির করলেন। আমার মনে যদিও সাহসের অভাব নেই, তবুও আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে দিলীপদা চলে যাওয়ার পর আমি একা বিঠলদাসের চাতুর্য্যময় নীচতার সঙ্গে লড়াই করে পারব না। মানুষ ঠকানো যার ব্যবসা তার কাছে জীবনের আর সব জিনিসই মূল্যহীন। আমি বিঠলদাসকে খুঁজে বের করেছি—কিন্তু প্রয়োজন বোধে সে তার বিষাক্ত ফণা দিয়ে আমাকেই প্রথম আঘাত হানবে, এ কথা আমি জানতাম।

বহু চেষ্টা করে বন্ধুবর অসিত সেন একটা বড় বিলিতী পাটের অফিসে করেস্‌পণ্ডেন্স ক্লার্ক-এর চাকরি পেয়েছে। মন্দ নয় চাকরিটা—শ' চারেক টাকা মাইনে। আমি ভাবলাম, যা হক অসিতের শেষ পর্যন্ত একটা গতি হল। বেচারা বিধবা মা আর ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে কি মুশকিলেই না পড়েছিল! চাকরি পাবার পর একদিন আমার আপিসে এসে দেখাও করে গেছে।

সেদিন আমি ওর আপিসে গেলাম। বিরাট আপিস—বহু লোক কাজ করছে। বসে বসে একটা কথা ভাবছিলাম· অদ্ভুত এই ক্লাইভ স্ট্রীটের আপিসগুলি। কবে সেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের

সময় এদের ব্যবসা শুরু হয়েছিল, আজও চলেছে—অনন্তকাল ধরে হয়তো চলবে। কবে কোন এক ইংরেজ বণিক এসে দু'জন বাঙ্গালী বাবু সঙ্গে নিয়ে ব্যবসার পত্তন করেছিল—আজ তার প্রপৌত্র কোম্পানীর মালিক। যারা প্রথম বাবু হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিল হয়তো বা তাদেরও প্রপৌত্র আজ চাকরিতে বহাল রয়েছে। যারা এখানে কাজ করে তারা আপিসটাকে নিজেদের বাড়িঘরের মত করে নিয়েছে। আর তা তো হবেই। এই যে ষাট বছরের বৃদ্ধ বড়বাবু ফণী মজুমদার ওখানে বসে রয়েছেন, তিনি ক' ঘণ্টা নিজের বাড়িতে কাটিয়েছেন, আর ক' ঘণ্টা কাটিয়েছেন ওয়াড্রোব কোম্পানীর আপিসে? নিজের বাড়ির কোথায় কি আছে, কোথায় কোন পেরেকটায় জং ধরেছে তিনি বলতে পারবেন না নিশ্চয়ই—আপিসে ঢুকেই কোন ফার্ণিচার-এ একটু দাগ লেগেছে, কোন ফাইলের ওপর একটু ধুলো জমেছে, তা তাঁর নজর এড়ায় না। আর নজরে পড়লেই হাঁক দেন—বৃন্দাবন! বৃন্দাবনের বয়স ষাট বছর—ফণীবাবু পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম আপিসে ঢুকেছিলেন, বৃন্দাবনও প্রায় তখনই বেয়ারা হয়ে ঢুকেছিল। সে তার বাপ-কাকার চরিত্র যা না জানত, তার চেয়ে বেশী জানত ফণীবাবুর চরিত্র। তিনি কখন কি বলবেন, কখন কি চাইবেন, মাথা ধরলে ভেরামন না স্যারিডন আনতে বলবেন তা তার নখদর্পণে। এদের মধ্যে একটা অদ্ভুত আত্মীয়তার সম্পর্ক। বৃন্দাবন বলে হাঁক দিলেই, বৃদ্ধ বেয়ারা একটা ঝাড়ন কাঁধে করে এসে আশপাশের চেয়ার-টেবিল, ফাইলগুলি ঝেড়ে দিয়ে যায়।

আপিসের জুনিয়র ক্লার্ক সত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য নতুন বিয়ে করেছে। শ্বশুরবাড়িতে কি তত্ত্ব যাবে, শালাদের কাছে কি লিখতে হবে, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে কি খাওয়াতে হবে সব কিছু ব্রিফিং করে দিচ্ছেন ফণীবাবু। সত্যানন্দ উচ্চশিক্ষিত হাল ফ্যাশানের যুবক, কিন্তু ফণীবাবুর আদেশ নিজের পিতার আদেশের মত গণ্য করে। সব কথাই মেনে চলে। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় ওয়াড্রোব

কোম্পানীর কেরানীকুল যেন এক পরিবারভুক্ত। অমুকের ছেলের অসুখ—চিকিৎসার পয়সা নেই, অমনি সবাই মিলে পাঁচশো টাকা চাঁদা তুলে দিল; ছেলের চিকিৎসায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়। টাকার জন্যে চিন্তা নেই। অসিত এই পরিবারের একজন নতুন সভ্য। বিদ্বান বলে তার খাতির বেশী—ফণীবাবু সব সময়ে বলতেন—আপনার কিন্তু অসিতবাবু এ-লাইনে আসা ঠিক হয় নি। প্রফেসরী লাইনে যাওয়াই উচিত ছিল।

ওয়াড্রোব কোম্পানীর পরিবারে একজন নতুন সভ্যা এল—নবনিযুক্তা ষ্টেনোগ্রাফার—শীলা মজুমদার। এর আগে মেমসাহেব ছাড়া ও-চাকরিতে কাউকে নেওয়া হত না। তাই মিস্ মজুমদারই প্রথম ইণ্ডিয়ান ষ্টেনোগ্রাফার। মেমসাহেবরা ফণীবাবুর সংসারের কেউ ছিল না। তাদের আলাদা সমাজ ছিল—সাহেবদের বাড়ির আনাচে-কানাচে তারা বাস করত। শীলা মজুমদারেরও সেই সমাজেই যাওয়ার কথা, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, সে এসে গেল ফণীবাবুর বাঙ্গালী পরিবারে। শীলা ইংরেজী স্কুল থেকে সিনিয়র কেমব্রীজ পাস করে বছর পাঁচেক চাকরি করেছে। মাইনে বেশী পাওয়ায় অন্য একটা সাহেবী কোম্পানী ছেড়ে ওয়াড্রোব কোম্পানীতে এসেছে। চেহারাটি ছিম্‌ছাম্—ইংরেজীতে থাকে বলে ট্রিম্‌ড। দেখতে দোহারা—যৌবনোদ্ধত দেহের উপর নীল রং-এর শাড়ীখানা যেন পল্লবিনী লতার মত জড়িয়ে আছে। মুখে সর্বক্ষণ মৃদু হাসি। ইংরেজী উচ্চারণ ভাল। ঠোঁটে, গালে রং-এর ছোপ থাকলেও ততটা বিসদৃশ নয়। এক কথায় মিস্ শীলা মজুমদার ক্লাইভ স্ট্রীটের আধুনিকা এবং শিক্ষিতা লেডী ষ্টেনোগ্রাফার।

শীলা মজুমদারের সঙ্গে অসিত সেনের ঘনিষ্ঠতা হল। হবার কথাও বটে। অসিতের চেহারার মধ্যে এমন একটা বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে, যে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের পক্ষে তাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়—আর একবার যদি তার গণ্ডীর মধ্যে কেউ চলে এল

তো, তার বিস্তার বহর দেখে মন আপনিই দুর্বল হয়ে পড়ল। বাংলাদেশের যে কোনও ছেলেমেয়েই ভাববে "এই রত্ন পাটের অফিসের ক্লার্ক ?" শীলার মধ্যে অসিতের মত গভীরতা নেই, কিন্তু বাইরের চমকানি আছে—শ্রাবণের আকাশের বিদ্যুতের মত—এক ঝলক চোখে লাগলেই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। দুজনের মধ্যে প্রথমে আলাপ হোলো তারপরে হোলো ঘনিষ্ঠতা। দিনের পর দিন কাছে ব'সে শীলার সান্নিধ্য লাভ করে, অসিত দুর্বল হ'য়ে পড়ল। ও অনেকটা উমার মত—সহজ সরল পথে চলতে চায়—স্বচ্ছ ভাব ধারায় মনের কথা প্রকাশ করতে চায়। সঙ্গোপনে অলিগলি বেয়ে মনের গোপন রহস্য ভেদ করবার মত ধৈর্য্য এবং সাহস কোনটাই ওর নেই।

কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হবার পরই একদিন শীলা অসিতকে বলল, বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ, কিন্তু কেন ? কেন তোমরা সবাই আমাকে এত ভালবাস ? আমি বাবা ওসব কিছু বুঝি নে। অসিত কথা বলে না, চুপ ক'রে থাকে। এ এমন একটা ব্যাপার, যেখানে চুপ করে থাকা ছাড়া অনেক সময়ে গত্যন্তর থাকে না।

অসিত একদিন আপিসে না এলে শীলা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ফণীবাবুর অফিস-সংসারের লোকেরা মৃদুস্বরে আলাপ করে—এধার-ওধার থেকে চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। ছুটীর পরে শীলা বৃন্দাবনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, অসিতের বাড়ির ঠিকানা জানা আছে কি না। একটা টাকা হাতে দিয়ে বলে, দেখে এসো তো অসিতবাবু আপিসে এলেন না কেন ? বৃন্দাবন খবর এনে দেয়, অসিতবাবুর ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছে—দুদিন বাদে আসবেন। সারা আপিসে কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে যায়। পরিবারের যুবক সভ্যরা অসিত সেনকে ঈর্ষা করে, প্রৌঢ়রা প্রমাদ গনে—মিস্ মজুমদার অসিতের মত একটা ভাল ছেলেকে ডুবিয়ে দেবে না ত ? দুদিন বাদে অসিত আপিসে আসতেই শীলার শত সহস্র প্রশ্ন—শরীর কেমন, আজ কি

খেয়েছ, ওষুধ খাওয়া হয়েছে কিনা—আজ আর বেশীক্ষণ কাজ করো না—দাও না তোমার statistics এর return টা আমি করে দিচ্ছি।

শীলার মধ্যে সবই আছে, স্নেহ আছে, মমতা আছে, ভালবাসা আছে, কিন্তু ভালবাসার বাহ্যিক প্রকাশ নেই। আর এ শুধু শীলার মধ্যে নেই, তা নয়। ক্লাইভ স্ট্রীটে এক নতুন শ্রেণীর নারীর আবির্ভাব হয়েছে। তারা সবাই শীলার সমগোত্রীয়া। ছোট বেলা থেকে career-এর স্বপ্ন দেখে দেখে, এদের দেহের অনেকগুলি স্নায়ুতন্ত্রীর রূপান্তর ঘটেছে। এরা ছেলে বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। সিনেমায় যায়, ক্লাবেও যায়, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। যতদূর পর্যন্ত গেলে নারী পুরুষের কাছে ধরা দেয়, ততদূর পর্যন্ত এরা যেতে পারে না। যদি কেউ এদের কাউকে জিজ্ঞেস করে, ওমুকের জীবনটা নষ্ট করে দিলে কেন? তা এরা হাত নেড়ে চোখ উল্‌টে বলবে—আই ক্যান নট হেল্‌প ইট।

সত্যি তাই। ধনকেন্দ্রিক সমাজে, যেখানে অর্থই মানুষের চিন্তা ও জীবনধারার কেন্দ্র, সেখানে অর্থ রোজগারের ধাঁধায় অনেক মেয়ে ঠিক শীলার মত অ্যাবনরম্যাল হ'য়ে গেছে। আর শুধু কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এরা আছে। নারীর স্বাভাবিক কোমলতা বা দুর্বলতা বজায় রাখলে পুরুষদের মত career গঠন করা সম্ভব নয়—তাই প্রথম যৌবনে সেই সব প্রবৃত্তিগুলিকে এরা টুঁটি চেপে হত্যা করে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে মেরে ফেললেই তারা মরে না—কতকগুলি হাত ফসকে বেরিয়ে আসে। সবগুলি প্রবৃত্তি মরে গেলে এদের নিয়ে কোনও মুশকিল হত না—ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু যেহেতু কিছু প্রবৃত্তি বেঁচে থাকে, সেইগুলিকে নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত হয়। যদি শীলা মজুমদারের হৃদয়ে দয়ামায়া বলে কিছুই না থাকতো, তাহ'লে ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী অসিত সেন তার চিঠি পেত না—আর স্তিমিত গোধূলির আলোকে মনকে রঞ্জিত ক'রে ভাবতো না—হয়তো বা শীলা ওকে ভালবাসে, না হলে এত দরদ কিসের?

আমি আরও অনেক শীলা মজুমদারকে দেখেছি—সেরেফ careerist। এদের চরিত্র বিচার করে দেখেছি—এরা অ্যাবনরম্যাল। ইংরেজীতে এদের a-sexual বা de-sexed বলা চলে—বাংলায় বলা যায় অমাতৃক। কল্পনা করতে পারেন এদের জীবনের ট্র্যাজেডী কত গভীর! নারী যদি মাতৃত্বের দায় এড়াতে চায়, ফুল যদি তার সুগন্ধ হারিয়ে ফেলে, সমুদ্র যদি তার উদ্বেলতা প্রত্যাখ্যান করে, পাহাড় যদি তার উত্তুঙ্গ শির মাটিতে নুইয়ে ফেলে, তাহলে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে? কিন্তু সমাজের অদ্ভুত কাঠামোতে সবই সম্ভব! বিঠলদাস যদি দিলীপ দত্তর লাখ টাকার শেয়ারের দাম দিতে পারে ছাব্বিশ হাজার, কিশোরীমলরা যদি বাজারের সব হরলিক্স কিনে নিয়ে গুদামজাত করে দেশের শিশুদের বঞ্চিত করতে পারে, ধর্মের ধ্বজাবাহকেরা যদি মহম্মদ সৈফুদ্দিনকে অকারণে হত্যা করতে পারে, তাহলে শীলা মজুমদাররা অসিত সেনদের পথভ্রষ্ট করে দিতে পারবে না কেন? লালসার গর্ভে যে পশু প্রবৃত্তিগুলি জন্মায়, তাদের ধারা সবই এক, একই পথে তারা চলে। যারা অপ্রকৃত জীবনধারার এই বিকৃত প্রকাশকে ভাল করে পরখ করেছে, তারা শীলা মজুমদারের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারে। মুশকিল হচ্ছে বাস্তব সত্যকে সব সময়ে সহজভাবে গ্রহণ করা যায় না; তাই অসিত সেন বুঝতে পারছে না যে, শীলা তাকে ভালবাসলেও কখনও ধরা দেবে না। আর ধরা যদি কখনও দেয়ও তো তার জন্যে যে সাধ্যসাধনা আর ধৈর্যের প্রয়োজন, তা কোনও অসিত সেনেরই নেই।

সেদিন অসিতের আপিসে গিয়ে বসতেই মিস্ মজুমদার এল। অসিত আলাপ করিয়ে দিল। নমস্কার বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলাম, আমার বন্ধুটিকে কেমন লাগছে? শীলা বলল, খুব ভাল—এত ভাল যে কষ্ট হয়—কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, বড্ড সেন্টিমেণ্টাল্।

—আপনার বুঝি সেন্টিমেণ্ট নেই?

—ও সব বালাই আমার নেই, পৃথ্বীশবাবু। সোস্যাল এডুকেশনের একটা কোর্স নিচ্ছি—পাস করতে পারলে, বিলেত যাব। একটা ডিগ্রী নিয়ে এলে এই কোম্পানীতেই হাজার টাকা মাইনের চাকরি হবে।

—এরকম করে আর কদিন চলবে—বাসা বাঁধবেন তো ?

—ইচ্ছে নেই—বাঁধলে, আগেই বাঁধতাম—জানেন পৃথ্বীশবাবু, ইউনেস্কোতে কতকগুলি চমৎকার চাকরি আছে—বলুন না আপনার বন্ধুকে ; ও তো একটু চেষ্টা করলেই একটা চাকরি পেতে পারে।

আমি চুপ করলাম। বুঝতে পারলাম, শীলা মজুমদারের কাছে স্বাভাবিক জীবনের কোনও রূপই ধরা দেয় না। ভাল চাকরি ছাড়া জীবনে সে কিছু বোঝে না, বুঝতে পারবে না কোনও দিন।

মিস্ মজুমদার চলে যেতে আমি অসিতকে বললাম, বন্ধু, আমি জানি, তোমার মনে রং লেগেছে—কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এখানে কিছু হবে না।

—কিন্তু জান, পৃথ্বীশ, আমার জন্যে ওর ভাববার অন্ত নেই—যেন—

আমি বললাম, যেন কতকাল থেকে পরিচিতি আর ঘনিষ্ঠতার একটা ধারা নেমে এসেছে, না ?

অসিত চুপ করে থাকল। আমি আবার বললাম, যে-দুঃখ তোমাকে পেতে হবে, তার জন্যে তৈরী হয়ে নাও—দুঃখ কিন্তু তোমাকে পেতেই হবে।

বাড়ি ফিরে আসবার পথে ভাবতে লাগলাম, অসিত কি আমার কথা শুনবে, না একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে হাত পা ভেঙ্গে জবুথুবু হয়ে বসে পড়বে ?

দিলীপদা শেষ পর্যন্ত বিঠলদাসের কাছে এক লাখ টাকার শেয়ার ছাব্বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করা স্থির করলেন। আমি অনেক

চেষ্টা করলাম, যাতে করে তিনি একাজটি না করেন। কিন্তু বিঠলদাসের ওপর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আর টালিগঞ্জ-এর মোহ মিলিয়ে দিলীপদা তিন দিনে মনের ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছেন। সম্মোহিত হয়ে মানুষ যেমন পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে সম্মোহন-কারীর হাতে তুলে দেয়, তেমনি ফ্লাড লাইট, মেক্ আপ আর ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ দিলীপদাকে এমন সম্মোহিত করে ফেলেছিল যে নিতান্ত জীবনরক্ষার জন্য যতটুকু সংগ্রামের প্রয়োজন, ততটুকু সংগ্রামের ক্ষমতাও তখন ওঁর ছিল না। যেদিন শেয়ার ট্রান্সফার হল, সেদিন বিঠলদাসকে অস্বাভাবিক রকম হাসিখুশী দেখলাম। অকারণে সবাইকে চা খাওয়াচ্ছেন, বয় বেয়ারাগুলোর পিঠে মাঝে মাঝে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর অ্যাকাউণ্ট্যা-ণ্টকে ডেকে ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সমাচার জিজ্ঞেস করছেন—মিঃ দত্তকে ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে তো? মিঃ দত্তর অবস্থা তখন এমন শোচনীয় যে একবারে তো ভাল, চার দফায় ছাব্বিশ হাজার টাকা পেলেও তাঁর আপত্তি নেই! তাই পুরো টাকার চেক্‌টা পকেটে ফেলে দিলীপদা বিঠলদাসকে নমস্কার করে ফেললেন। বয় বেয়ারা, কেরানী, সেল্‌সম্যান সবাই এসে তাঁকে অভিবাদন করল—তিনিও সবাইকে হাত জোড় করে অভিনন্দন জানালেন। আমি আমার চেয়ারে বসে ছিলাম। আমার কাছে এসে বললেন—পৃথ্বীশ, আমি চললাম, আমার বাসায় গিয়ে দেখা কবো। তারপর দিলীপদা দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেলেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখতে পেলাম, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দিলীপদাকে নিয়ে প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিলাম। মনে বেদনা অনুভব করলাম না এমন নয়, কিন্তু আবার ভাবলাম—কাপুরুষরা বহুবার মৃত্যুর আগেই মরে—দিলীপদার আজ একবার মৃত্যু হল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার সঙ্গেও বিঠলদাসের বোঝাপড়া আসন্ন। ওয়ার্কিং ডাইরেক্টর-এর আইনগত ক্ষমতা এবং অধিকার কিছুই যে নেই তা জানতাম, কিন্তু তবুও আমি ছেড়ে কথা কইবার

পাত্র নই। একবার ভাবলাম, উকিলের সাথে পরামর্শ করে ব্যালান্স শীট্‌টার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ জানাই। আবার ভাবলাম, কি হবে বিঠলদাসের মত লোভী আর নীতিহীন্ ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে? একদিকে সত্যের জন্য লড়াই-এর প্রবল আগ্রহ, আর একদিকে অপরিসীম ঘৃণার থেকে উদ্ভূত মানসিক অবসন্নতা। দু'দিন রাত্তিরে ঘুম হল না। টাকা পয়সারও প্রয়োজন আছে—বিশেষ করে মেজদার চাকরি নেই, বিরাট সংসার—ছেলেপিলে নিয়ে কষ্টে আছেন। আমার দেওয়া মাসিক পাঁচশো টাকা না পেলে, তাঁর পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব। তখন মনের একটা অদ্ভুত অবস্থা। মিঃ হার্টমান ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেছেন। দিলীপদা প্রতারিত হয়ে চলে গেলেন। এমনি করে বিঠলদাসকে স্টীম রোলার চালিয়ে যেতে দেওয়া কি উচিত? কিন্তু বাধা দিতে গেলেই আমাকে কোম্পানী ছাড়তে হবে—চট্ করে আর একটা কিছু করা যাবে, এমন সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। অসিত সেনকে চার বছর ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। উমাও আজ দু-বছর কিছুই করতে পারছে না—আর কেই বা কি করতে পেরেছে! বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনশ্চক্ষে বিঠলদাসের সঙ্গে লড়াই-এর পরিণাম দেখতে পারছিলাম। শুধু মেজদার সংসারের কথাটাই বার বার মনে হতে লাগল। হ্যাণ্ডিকাপ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মধ্যে বাহাদুরি থাকতে পারে কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় মেলে না। কিন্তু আবার ভাবলাম, বুদ্ধির পরিচয় দেবার অবকাশ খুঁজতে থাকলে হয়তো বা লড়াই করা আর হয়ে উঠবে না। পরের দিন আপিসে যেতেই বিঠলদাস ডেকে পাঠালেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি—মাত্র কিছুক্ষণ আগে একবাটি দুধ চুরি করে খাওয়া বেড়ালের মুখের হাসি দেখেছেন তো? বিঠলদাসের মুখে ঠিক সেই হাসি! কাছে যেতেই তিনি বললেন, বসুন মিঃ ঘোষ। আপনার সাথে কথা আছে। আমি ভাবলাম, এই সুযোগ। বিঠলদাস কিছু বলার আগেই আমি বলা শুরু করলাম।—কাজটা ভাল করলেন না বিঠলদাসবাবু।

—কি কাজের কথা বলছেন—

—এই যে মিঃ দত্তকে ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিলেন।

—আমি কি করব মিঃ ঘোষ—উনি তো নিজেই চলে যেতে চাইলেন।

—তার জন্যে আপনি দায়ী।

—মানে!

—মানে হচ্ছে এই যে আপনি ম্যানিপুলেশান্ করে ব্যালান্স শীট্-এ আঠার হাজার টাকা লোকসান দেখিয়েছেন।

—মিঃ ঘোষ, আপনি বিগ বিজনেস-এর ব্যাপার কিছুই জানেন না। ক্লাইভ স্ট্রীটে যত বড় বড় ব্যবসা দেখেছেন, সবই চলছে ম্যানিপুলেশান্ দিয়ে। আপনি ভাবছেন, শতকরা তিন টাকা লাভ করে তেরো বছরের উইক্স্টেড কোং বার তলা বাড়ি তৈরী করতে পেরেছে? আমিও যদি ম্যানিপুলেশান্ করে থাকি, অন্যায় করলাম কোথায়? মিঃ দত্তও তো একজন ডাইরেক্টর ছিলেন—তিনিও তো ম্যানিপুলেশান্ করতে পারতেন—পারলেন কোথায়? It is the survival of the fittest.

—সে তো বটেই, আমি বললাম, আপনি আপিসটাকে সুন্দরবন করে ছেড়েছেন। এরপরে যারা এখানে কাজ করবে, তাদের তিন ইঞ্চি লম্বা নখ রাখতে হবে, আর দাঁতগুলোকে স্টেইন্‌লেস্ ষ্টীলের ফাইল দিয়ে ধার করে নিতে হবে।

বিঠলদাস হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—মিঃ ঘোষ, মন দিয়ে কাজ করুন, আপনাকে তিনশো টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট দিয়ে দিচ্ছি আগামী মাস থেকে—এছাড়া দশ পার্সেণ্ট লাভ তো রয়েছেই।

আমি বললাম, ওঃ বুঝেছি—এখন সবগুলি শেয়ার-ই যখন আপনার, তখন লাভ হতে কোনও বাধা নেই—এই তো?

বিঠলদাস মাথা নেড়ে সায় দিলেন—এবং একটা হিসেব দিলেন,

যাতে করে আগামী বছর কোরিয়া যুদ্ধশেষের ক্ষতি ধরে নিয়েও, পঞ্চাশ হাজার টাকা নীট লাভ হবে।

আমার পক্ষে আর সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমি বললাম, বিঠলদাসবাবু, আপনি না করতে পারেন এমন কোনও কাজ নেই—আপনার ওপর আমার কোনও আস্থা নেই।

বিঠলদাসের মুখ লাল হয়ে উঠল—তিনি স্বভাবতঃই অপমানিত বোধ করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, দত্তবাবুর জন্যে আপনার খুব দরদ দেখতে পাই—ও কি আপনার কোনও রিস্তাদার? বিঠলদাস আমার ওপর খেপে গেলেও, আমাকে অত তাড়াতাড়ি হারাতে রাজী ছিলেন না। ম্যানেজার হিসেবে আমার দক্ষতা তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন না। বিলেতের আপিসও আমাকে লম্বা সার্টিফিকেট দিয়েছে। কিন্তু তখন আমার রক্তে যুদ্ধের মৌতাত লেগেছে। দিলীপদার প্রতি যে-ব্যবহার করা হয়েছে, তারপর সেইখানে বসে মাসের শেষে আমি মনিব্যাগ ভর্তি করে টাকা নিয়ে যাব, এ আমার পক্ষে অসহ্য মনে হল। অথচ অনেক বন্ধু-বান্ধব বলেছে,—দিলীপ দত্ত চলে গিয়েছেন, তাতে তোমার কি? তুমি পাঁচ বছরের জন্যে কণ্ট্রাক্ট চাকরি করে নাও—আরামসে থাকো। আমি ওদের বোঝাতে পারলাম না, যে দিলীপদার জন্যে আমার কোনও সহানুভূতি নেই—আমার সহানুভূতি তাদের জন্যে যারা ক্লাইভ স্ট্রীটে এসে বিঠলদাসের মত লোকদের দ্বারা রোজ প্রতারিত হচ্ছে—যারা সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরী হয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই কি সব? বীরত্বের ব্যঞ্জনা আসুক আমার হৃদয়ে—আমার মনোবীণাতে রুদ্রতান ঝঙ্কৃত হয়ে উঠুক।

—বিঠলদাসবাবু, আমি আজই চাকরি ছেড়ে দেব।

বিঠলদাস চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন—একি বলছেন, মিঃ ঘোষ, আমি আপনার সঙ্গে কি এমন খারাপ ব্যবহার করেছি?

—না, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার সত্যিই কিছু করেন নি—তবুও আমার এখানে পোষাবে না।

বিঠলদাস স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। অতবড় হীনপ্রবৃত্তি কুচক্রী মানুষটাও কেমন যেন লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে গেলেন। হয়তো তিনি ভাবলেন, মিঃ দত্তর শেয়ারের টাকার ব্যাপারে এ-লোকটা এমন খেপে গেল কেন? আর তাছাড়া মনের কোনও সূক্ষ্ম গোপন তন্ত্রীতে হয়তো একটা করুণার সুর বেজে উঠল—শত হলেও মানুষ তো? যে লোকটা তাকে এতবড় একটা ব্যবসায় এনে বসিয়েছে, সে আজ সব ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছে, এ আবার কেমন কথা? আরও হয়তো ভাবলেন, ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন না তো? পাপ হবে না তো? সত্যি তখন বিঠলদাস থর থর করে কাঁপছিলেন। আমার জন্যে যে তাঁর করুণা হয়েছিল তা নয়, তাঁর নিজের পাপপুণ্যের বিচারে তিনি মনের কাছে পরাজিত হচ্ছিলেন। তাঁর মুখেচোখে একটা অদ্ভুত অসহায়তার ছাপ। আমি ওঁর টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে ছিলাম। হঠাৎ উঠে এসে আমার হাত ধরে বললেন, ভাই, যা হবার হয়ে গেছে, আপনি কাজ করুন। আপনার মাইনে ডবল করে দিচ্ছি—আমার ছোট গাড়িখানাও দিয়ে দিচ্ছি।

বিঠলদাসের কোন কথায় আমি কর্ণপাত করলাম না। একখানা লেটারহেড টেনে নিয়ে resignation লেটার লিখলাম। অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মিঃ দাশগুপ্তকে ডেকে একখানা শেয়ার ট্রানস্‌ফার ফর্ম চাইলাম। দাশগুপ্ত আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। এক এক করে বয়, পিওন, দারোয়ান, স্টেনোগ্রাফার, জমাদার, সেলস্‌-ম্যান সবাই সেই ঘরে জমায়েত হল। প্রৌঢ় অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট আমার হাত চেপে ধরে বললেন, সাবাস্‌ ইয়ংম্যান! আপনার মত একজন দুঃসাহসী লোকের সংস্পর্শে জীবনে একবারও আসতে পেরেছিলাম তার জন্যে নিজেকে গর্বিত বোধ করি এবং আজীবন করব। জীবন বলে যে ছেলেটা চা ক'রে দিত, সে হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠল, হুজুর, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান, আমরা এখানে কাজ করতে পারব না। ওর দেখাদেখি সবাই কাঁদতে শুরু করল। চম্পা সিং

পা জড়িয়ে ধরল, হুজুর, হাম্‌লোককা ক্যায়া হোগা? দাশগুপ্ত রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। এমন কি sales representative ডাঃ দাসের গলার স্বরও থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। আশ্চর্য, অমন স্যুট, টাই-পরা ডাক্তার সাহেব, তিনি আমাকে এমন ভালবাসতেন, জানতাম না তো? রোরুদ্যমান ব্যূহ পরিবেষ্টিত হ'য়ে আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠল। আমি সবাইকে উদ্দেশ করে বল্‌লাম—যদি আমি নিজে একটা বড় আপিস করতে পারি, তবে আপনাদের সবাইকে নিয়ে যাবো। আপনাদের সঙ্গে তিন বছরের পরিচয়—সুখে-দুঃখে সবাই একসঙ্গে ছিলাম। আপনাদের জন্যে মন আমার সত্যি খুঁব খারাপ লাগছে, কিন্তু উপায় নেই। এ-অবস্থায় চাকরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপরে ছুটে বেরিয়ে চলে এলাম। এসে দেখি বিঠলদাস আপিস ছেড়ে চলে গেছেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিলাম,—দিলীপদার সেদিনকার চলে যাওয়ার কথা। তিনিও এই সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলেন—আজ আমিও নামছি। আরও অনেকে এমনি করে নেমে যাবে হয়তো। কিন্তু বিঠলদাস নামবে না—শুধু উঠবে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেই ক্লাইভ স্ট্রীটে পড়লাম। হে ছলনাময়ী, আবার আমি তোমার আশ্রয়ে এলাম। তোমার প্রেম যে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন করে বেঁধে ফেলেছে, তা আগে বুঝতে পারি নি। তুমি যাদের ভালবাস, তাদের এমনি করে সবহারানোর সুরে গান গাইতে বল—। আমি আবার সব হারালাম—কিন্তু তবুও আমার কোনও দুঃখ নেই, আপশোষ নেই। নাই বা আমার থাকলো কিছু—নাই বা আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠল—কিন্তু তুমি তো আছ!

*　　　*　　　*　　　*

উমাশঙ্করের সম্বন্ধে কেচ্ছা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে ও একটা পুরোদস্তুর ৪২০ হয়ে গেছে। ওর সত্যি কোনও উপায় নেই। ভালবাসা পাবার উগ্র কামনা ওকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে দিয়েছে। আশ্চর্য! যে-প্রেম মানুষকে মহান করে তোলে, যে-প্রেম অনুর্বর মনুষ্যহৃদয়কে উর্বরতা দান করে, তাকে ফুলে ফলে ভরে দেয়, সেই প্রেমই উমাকে অমানুষ করে তুলেছে। সব সময়ে ওর কথা ভাবি। একজন বন্ধুর কাছে শুনলাম, ও নাকি ছ' মাসের বাড়ি ভাড়া দিতে পারে নি বলে বাড়িওয়ালা ওর নামে কেস করে দিয়েছে। এই উমাই একবার আমার মেসের তিন মাসের চার্জ নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিল। আজ আমি যদি ওর ছ' মাসের ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আসতে পারতাম! হয়তো কোম্পানী না ছেড়ে এলে, বিঠলদাসের কাছ থেকে ধার করে টাকাটা দিতে পারতাম—কিন্তু আজ তো আমি একেবারেই নিঃস্ব। দু' মাস হলো বিঠলদাসের সংস্পর্শ ছেড়েছি—আজ প্রথম একটুখানি অনুশোচনা হল—উমাকে সাহায্য করতে পারলাম না! তবে কথা হচ্ছে ওকে একটু আধটু সাহায্য করেই বা লাভ কি? ও যে-পথে চলেছে; তাতে করে কোন সাহায্যই ওর কোনও কাজে লাগবে না। ও এখন জীবনের সব রকম আদর্শের পাহাড় থেকে উৎরাই-এর পথে নামছে—ওকে ঠেলে আবার ওপরের দিকে চড়াই-এর পথে পাঠানো প্রায় অসম্ভব। পারেন শুধু একজন—তিনি হচ্ছেন শর্বরী দেবী। তিনি যদি একটুখানি কোমলতা আর ভালবাসার ছোঁয়াচ দিয়ে ওকে হাত বুলিয়ে দেন, তাহলে ও আবার চড়াই-এর পথে যাবে—তা না হলে সত্যিই ওর এ-জীবনে আর কোনদিন সে-পথে যাওয়া হবে না।

অসিত সেনের অবস্থাটাও প্রায় তদ্রূপ। উমা মহাজনদের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে টাকা ধার করছে, আর অসিত ফ্রয়েড, ম্যারি স্টোপস্-এর কাছ থেকে সেক্স সাইকোলজি-র শিক্ষাগুলি ধার করে চলেছে, শীলা মজুমদারকে বোঝবার জন্য। দু'জনারই

হিসাবের খাতায় লাল কালির দাগ। ব্যালান্স কারুরই নেই আর থাকবেও না।

যত দিন যাচ্ছে, ততই শীলা অসিতের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আশ্চর্য—এত স্নেহ, মমতা, দরদ, অথচ সহজ সরল স্বাভাবিক পথে নারী পুরুষের সম্বন্ধ যে ভাবে যায়, সেদিকে শীলা মজুমদারের কোনও আগ্রহ নেই। সব পুরুষই মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার একটা পরিণতি দেখতে চায়—যে-পরিণতি উদ্বেল হৃদয়কে একটা শান্ত, ধীরস্থির সুন্দর পথে নিয়ে যায়। শীলা যখনই বুঝতে পারল, অসিত পরিচিতি আর আলাপের পথ ছেড়ে ঘনিষ্ঠতার পথে পা বাড়াতে চায়, তখনি সে সাবধান হয়ে উঠল।—যেন সে জানত না ঘনিষ্ঠতার এইটেই একমাত্র স্বাভাবিক পরিণতি। একদিন সে অসিতকে বলল—তুমি আমার কাছে কি চাও বলো তো ?

অসিত বলল, যা সব পুরুষ মেয়েদের কাছে চায়, তাই—তার বেশী কিছু নয়।

—আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়—আমি তোমার সাথে বন্ধুর মত থাকতে চাই—তার বেশী কিছু নয়—শীলা উত্তর দিল।

অসিতের তখন প্রায় ফেটে পড়বার উপক্রম। শীলারও চোখ ফেটে জল বেরোবার অবস্থা। অসিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—অসিত, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না—আমি ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না—কিন্তু আমি অপারগ। তুমি রাগ কোরো না।

অসিতের মুখে তখনও কোনও কথা নেই—শুধু দীর্ঘ এক বছরের ছোটখাট ঘটনাগুলি ওর মনে পড়তে লাগল। একটা দিন আপিসে না গেলে শীলার কি অবস্থা হোত—রোজ টিফিনের সময়ে নিজের পয়সা দিয়ে কিনে এনে এক প্লেট খাবার সাজিয়ে অসিতের টেবিলে রেখে যেত—ভাল কোন ছবি এলে নিজেই টিকিট কিনে এনে অসিতকে ছুটির পরে নিয়ে যেত। একবার

দিন পনেরো ছুটি নিয়ে শীলা দার্জিলিং-এ দাদার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল—গিয়েই প্রথম চিঠিতে লিখেছিল—তোমাকে দেখতে পাই না—আমার দার্জিলিং ভ্রমণের.সমস্ত আনন্দ নষ্ট হয়ে গেছে—ভাবছি কেন এলাম……।

অসিতের মনে টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা, আর কথাবার্তাগুলি সব পর্দার উপরে ছবির মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। সব কিছুর পরেও শীলা ধরা দিতে রাজী নয়—আশ্চর্য।

শেষ পর্যন্ত ও ঠিক করল, যত কষ্টই হোক না কেন, শীলার সঙ্গে আর মিশ্‌বে না। আর তাছাড়া সেদিন যে চূড়ান্ত কথা-বার্তা হোল, তারপরে শীলাও নিশ্চয়ই দূরে সরে থাকবে। কিন্তু ব্যাপারটা হোল ঠিক তার উলটো। আপিসে যেতেই শীলা এসে অসিতের হাতের উপর হাতটা রেখে বলল—অসিত, তোমাকে কাল খুব দুঃখ দিয়েছি না? জান, কাল সারারাত্রি ঘুমুতে পারি নি আমি। তুমি রাগ করো নি তো?

অসিতও ঠিক এমনি একটা কথা শোনবার জন্যে মনে মনে আশা করছিল—আপিসে আসবার সময়ে শুধু ও ভাবছিল, শীলা এসে যদি নিজেই সেধে কথা কয়? আর তাছাড়া এমন পাষণ্ড কে কোথায় আছে যে প্রার্থিত-প্রিয়তমার কাছ থেকে ওরকম কথা শুনলে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে পারে? অসিতও পারল না—একমুহূর্তে ওর সমস্ত গাম্ভীর্য কোথায় যেন উবে গেল—বলল—না রাগের কি আছে—তবে কথা কি জান শীলা, তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে, এ আমি আজও কল্পনা করতে পারি না। শীলা বলল—আমিও না।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্লাইভ স্ট্রীটের ওয়াড্রোব কোম্পানীর চারতলার একটা ঘরে আলো-ছায়ার খেলা চল্‌তে লাগল।

*　　*　　*　　*

আমি আবার ক্লাইভ স্ট্রীট পরিক্রমা শুরু করেছি। আমার বন্ধুবান্ধবদের মুখে আবার হাসি ফুটেছে—আমি বেকার হলেই ওরা খুশী; তার কারণ আমি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ওরা আমাকে পায় না। মেজদার পরিবারকে সাহায্য করবার জন্যে গুটি তিনেক টিউশন নিলাম। ভোর ছ'টায় বেরিয়ে এগার, বারোটার মধ্যে ছাত্রদের পড়িয়ে বাড়ি ফিরতাম। তারপর স্নানাহার সেরে ক্লাইভ স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াতাম। এই হয়ে উঠ্‌ল আমার দৈনন্দিন রুটীন। যে করেই হোক সাড়ে বারোটার মধ্যে আমাকে ক্লাইভ স্ট্রীটে যেতেই হবে। বালিগঞ্জ থেকে আসা অনেক ট্রামের প্যাসেঞ্জার ভাবত, আমার বোধহয় নিজের আপিস আছে, তাই খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে একটু দেরিতে বেরোই।

অসিতের আপিসে প্রায়ই যাচ্ছি আজকাল। এত ঘন ঘন যাবার ছুটো কারণ—এক কারণ, হাতে কাজকর্ম নেই, আর এক কারণ, অসিতের জন্য মনের গোপন কোণে সব সময়ই কেন যেন একটা আশঙ্কা পোষণ করছিলাম। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট এবং ভদ্র ছেলে অসিত—জীবনের বক্র কুটিল গতি সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণাই নেই; আমি জানতাম শীলা মজুমদারের সঙ্গে একদিন ওর ছাড়াছাড়িই হবেই—তাই আমার ভাবনার অন্ত ছিল না।

এর মধ্যে উমার বাড়ি একদিন যেতে হল—ও চিঠি লিখেছে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য—জরুরী কথা আছে। সেদিন উমার সঙ্গে ব্যবসা সম্বন্ধে ছু' একটা কথা হল। ওর ড্রইং রুমের সোফাগুলি সংস্কারের অভাবে ভেলচিটে হয়ে গিয়েছে—ঘরের ডিসটেম্পার ফিকে হয়ে কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছিল। শুনলাম, চাকরবাকর একটিও নেই, শুধু মাত্র একটি ঝি—সেই রান্নাবান্না করে। শর্বরী দেবী রান্না জানেন না—জানবেন কোত্থেকে, মা কখনও শেখালে তো! প্রকাণ্ড বাড়িটার মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

উমা বলল, পৃথ্বীশ, একটা কিছু করা দরকার।

—কেন, তুমি শুনলাম বড় বড় কয়েকটা ব্যবসা পাকড়াও করেছ?

—করেছিলাম, পয়সার অভাবে কিছুই করতে পারলাম না।

—লাখ টাকা ধার করে করলে কি.?

—তুমি ওসব বুঝতে পারবে না—বড় ব্যবসা ধরতে গেলে বাইরের ঠাঁট চাই; আমার কিছু নেই, এ একবার বাজারে জানা-জানি হলে আমার পোজিশন ঢিলে হয়ে যাবে।

—কিন্তু যে অবস্থা করে এনেছ, তাতে তো তোমার বাজারে পোজিশন কিছু আর আছে বলে মনে হয় না। আর তা ছাড়া তোমাকে বড়লোক হতেই হবে—এমন কথা কে বলেছে? তার চেয়ে ছোটখাট একটা ব্যবসা-বাণিজ্য-করবার চেষ্টা কর, যাতে করে নির্বিবাদে সংসারটা চলে যায়। তোমার স্ত্রীও তো মাস-কাবারে তিন শ' টাকা মাইনে পাচ্ছেন। তোমাদের অভাব কিসের আমি তো বুঝতে পারছি না।

—স্ত্রীর টাকা দিয়ে সংসার চালানোর মত বিড়ম্বনা আর কিছু আছে বলতে পারো?

—তোমার ক্ষেত্রে হয়তো তাই,—কিন্তু স্ত্রী যদি বন্ধু হয়, তখন এ-প্রশ্ন ওঠে না। এ-সংসার তোমারও যতটুকু, তারও ততটুকু। বরং একটু বেশী। উমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বসে বসে অনেকক্ষণ তার বড়লোক হওয়ার কায়দাকানুন-গুলি সব শুনলাম। আমার কাছে এ সব ব্যাপার রূপকথার মত মনে হয়। হিসেব করে দেখলাম উমা গত দু'বছরে শুধু হোটেলে পার্টি দিয়েই ছত্রিশ হাজার টাকা খরচ করেছে। কে এসেছে পাকিস্থান থেকে পাথর কিনবে বলে, কে এসেছে জাপান থেকে আয়রন স্ক্র্যাপ কিনবে বলে, কে এসেছে মার্কিন মুলুক থেকে ভাঙ্গা এরোপ্লেনের পার্টস কিনবে,—তাদের হোটেলের সব খরচা, এমন কি মদের বিল পর্যন্ত ওকে দিতে হয়েছে।

আমি বললাম, লাভ হল কি, এত টাকা খরচা করে?

—হতেও তো পারত? ব্যবসাগুলি আমি পাই নি, কিন্তু অন্য

কেউ পেয়েছে তো? সে তো বড়লোক হয়ে গেছে। ধর যদি আমার ভাগ্যে একটা শিঁকেও ছিঁড়তো!

—তুমি দেখছি theory of probability-র ওপর ভিত্তি করে ব্যবসার স্বপ্ন দেখছ।

—শুধু আমি নই, ক্লাইভ স্ট্রীটের যত ব্যবসা দেখছ, সবগুলির ভিত্তিই chance আর probability। ঠিক সুনিশ্চিত বলে ব্যবসাতে কিছু হতে পারে না। ব্যবসা করলেই যে লাভ হবে, তারও কোনও গ্যারান্টি নেই। মোটামুটি সবটাই ঘোড়দৌড়।

আমি কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা। আমি ভাবছিলাম, আজ উমাশঙ্করকে আমরা দোষারোপ করছি; কিন্তু যদি সে একটা দাঁও মারতে পারতো, তো সবাই বলতাম, সাবাস্ উমা চৌধুরী, বাহবা উমা চৌধুরী।

উমা বলল, চল শিল্পোন্নয়ন বিভাগে একবার দেখা করি—কাগজে দেখলাম, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বড় শিল্পগুলি যাতে করে ছোট শিল্পগুলিকে গিলে ফেলতে না পারে, তার জন্যে বড় কর্তারা মজবুত ব্যবস্থা করছেন। যে যাচ্ছে সেই টাকা পাচ্ছে। তুই তো এখন কিছু করছিস না। চেষ্টা করে দেখি, যদি দুজনায় মিলে একটা ব্যবস্থা স্থির করতে পারি।

পরের দিন শিল্পোন্নয়ন বিভাগের বড় কর্তার সঙ্গে আমি আর উমা দেখা করলাম। তিনি বললেন—বাঃ এই তো চাই—শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা ব্যবসা করবে—এই তো আমরা সব চাই—পাচ্ছি কোথায়? বলতে কি বাঙালী যুবকরা সব উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে। এই দেখুন আজ পর্যন্ত মোট হাজার তিনেক দরখাস্ত পড়েছে। তার মধ্যে বাঙালীদের দরখাস্ত মোট দুশো খানার বেশী নয়। আপনারা ব্যবসা করতে চান শুনে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা কি ব্যবসা করতে চাই ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, লেবরেটরী কেমিক্যাল তৈরী করব।

ভদ্রলোক একটা ফর্ম হাতে দিয়ে বললেন—নিন্, এটা ভর্তি করে সঙ্গে একটা ফ্যাক্টরী প্ল্যান দিয়ে পাঠিয়ে দিন। আপনারা জমি কিনেছেন ?

—আজ্ঞে না তো ?

—মেসিনারী কিছু কিনেছেন নিশ্চয়ই ?

—আজ্ঞে না—টাকা পাবো কোথায় ?

—এই গ্যাখো, তা'হলে আমরা টাকা দেব কোত্থেকে ? আমরা তো আর হাওয়ার উপর basis করে টাকা দিতে পারি না ?

উমা বলল, যদি জমি কিনে, ফ্যাক্টরী তৈরী করে মেসিনই বসাতে পারব, তবে আর আপনাদের কাছে আসব কি করতে ?

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের এমন কোনও গ্যারাণ্টর আছেন—যাঁর কোলকাতায় অন্ততঃ একখানা বাড়ি আছে, নয়তো নিদেন পক্ষে হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি ?

—আজ্ঞে না, আমি বললাম, আমাদের সঙ্গে এমন লোকের চেনাজানাই নেই আর যাও বা আছে, তারা আমাদের জন্যে গ্যারাণ্টর দাঁড়াতে যাবেন কেন ?

ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের দেখছি সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই—আপনাদের টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না।

আমি বললাম, দয়া করে এরকম স্কিম কাগজে অ্যাডভার্টাইস করবেন না। আমি হলপ্ করে বলতে পারি, একজন মধ্যবিত্ত বাঙালীও আপনাদের শর্তে রাজী হতে পারবে না।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি আর উমা নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। বড়কর্তার ঘরের বাইরে আসতেই দেখি কিশোরীমল সুরজমল কার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে দেখেই কিশোরীমল বললেন—আরে বাবূজী, আপনি এখানে কি করতে এসেছিলেন ?

আমি উমাকে দেখিয়ে বললাম—এই বন্ধুর একটা কাজে এসেছিলাম। আর আপনি কি মনে করে?

কিশোরীমল বললেন যে তিনি স্মল ইন্‌ডাসষ্ট্রী স্কিম-এ পাঁচটা নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। উন্নয়ন বিভাগ থেকে মোট দশ লাখ টাকা যোগাড় হয়েছে। টাকা sanction হ'য়ে এসেছে। এখন চেকগুলি পেতে যা দেরি।

আমি অবাক বিস্ময়ে কিশোরীমলের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বিশ, পঁচিশ লাখ টাকার মালিক কিশোরীমল গুটি কতক ছোট শিল্পও করায়ত্ত করেছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিজস্ব টাকা কত লাগিয়েছেন?

—লাখ পাঁচেক।

—আমার এ বন্ধু তো কোন সুবিধেই করতে পারলেন না—ওর তো নিজের টাকা পয়সা নেই কি না।

কিশোরীমল বললেন, টাকা না থাকলে টাকা আসবে কোত্থেকে বাবুজী! প্রথমে তো আপনি কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা লাগান, তবে তুই এক লাখ টাকা আসবে!

এমন সময়ে বড় কর্তার বেয়ারা এসে কিশোরীমলকে সেলাম ঠুকে বলল—'সাব সেলাম দিয়া।' কিশোরীমল চলে গেলেন। আমি উমাকে বললাম, দেখেছ তো স্মল ইনডাসষ্ট্রী-র ব্যাপারখানা? উমা কথা বলল না। আমি নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

উপকরণ সবই আছে—টাকা আছে, Experts আছে; যন্ত্রপাতি আছে, এক কথায় বলতে গেলে ছোট শিল্পকে সাহায্য করবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা রয়েছে বড়কর্তাদের হাতে; কিন্তু কথা হ'চ্ছে ব্যবস্থাগুলি কাদের জন্যে? আমার আর উমার মত নিঃস্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের জন্যে, না কিশোরীমল সুরজমলদের জন্যে—যারা সিকিউরিটি দিতে পারবে—যারা পাঁচ লাখ টাকা চাইতে গিয়ে এক লাখ টাকা গাঁট থেকে বের করে দিতে পারবে?

সেইদিনই উমা ফিরে গিয়ে এক ইংরেজী দৈনিকের Letters to the editor column-এ ছাপবার জন্যে একখানা চিঠি লিখল—"This shameless farce"। উমা, আমরা সবাই চিঠি লিখতে পারি, রেফারেন্স বই-এর নাম বলতে পারি,—কিন্তু আমরা সিকিউরিটি বা গ্যারাণ্টর দিতে পারি না। সমাজে আমাদের credit worthiness বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের মত লোকদেরও বাঁচতে হয়। সেই বাঁচবার পথে আমরা সব সময়ে নিজেদের ব্যালান্স ঠিক রাখতে পারি না। শর্বরী দেবীর মত একটি বউ ঘাড়ে এসে চাপলে, নিজেদের নিঃস্ব করে ফেলি। অথচ সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে নিঃস্ব এবং সহায়হীন অবস্থায় আছি। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করতে হয়, জন্মদিনের উপহার পাঠাতে হয়, রিটার্ন ভিজিট দিতে গিয়ে ট্যাক্সী ভাড়া দিতে হয়, ছেলেকে ইংরেজী ইস্কুলে পাঠাতে হয়, মেয়েকে গীটার বাজনা শেখাতে হয়, গিন্নীকে দুই একবার শিলং বা দার্জিলিং-এ পাঠাতে হয়। আমাদের প্রেষ্টিজ বড্ড হালকা—হঠাৎ যে কোনও ছিদ্রপথ দিয়ে এই তরল পদার্থটি সট্‌কে যেতে পারে।

এই ছিদ্রপথ বন্ধ করবার জন্যে আমাদের অনেক সময়ে শঠতার আশ্রয় নিতে হয়। উপায় নেই—আমাদের দৃষ্টি পাশের বাড়ির লক্ষপতি ব্যবসায়ী রাখাল ব্যানার্জী কিংবা বুধনদাস আগর-ওয়ালার দিকে—যাদের বাড়িতে রেডিওগ্রাম আছে, রেফ্রিজারেটর আছে, নতুন তিনখানা গাড়ি আছে—যাদের ছেলেরা দেরাদুন পাব্‌লিক স্কুল-এ পড়ে। যারা দিন আনে দিন খায়, যাদের জীবনে অ্যাম্‌বিশন বলে কিছু নেই, তারা আমাদের চেয়ে অনেক সুখী। আর যাই হোক না কেন, আমাদের মত তাদের হৃদয়ে সব সময়ে একটা না-পাওয়ার আগুন জ্বলে না—তাদের ছেলেরা গ্যাবার্ডিন-এর স্যুট পরবার জন্যে বায়না ধরে না—তাদের স্ত্রীরা মাসে সতরটি নেমন্তন্ন রক্ষা করবার জন্যে আয়ের অর্দ্ধেক টাকা

খরচ করে ফেলে না। তারা প্রেম ভালবাসা নিয়ে চুলচেরা তর্ক করে না—অধিকার অনধিকার নিয়ে খাবার টেবিলে বসে কথার ঝড় বইয়ে দেয় না।. সন্তান-সন্ততির জন্য তারা নিজেদের জীবনের বহু প্রয়োজনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

তাইতো ভাবি, উমার এ-অধঃপতন কেন। বহুবার ভেবে দেখেছি। যুদ্ধোত্তর ক্লাইভ স্ট্রীটের কপটতা ও শঠতাপূর্ণ কৃষ্টি প্রবেশ করেছে আমাদের গৃহে। শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠেছে—যে করেই হোক, সেই সংস্কৃতি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে—না পারলে শর্বরী দেবীরা ভ্রূ কুঁচ্‌কে বলবেন—Rustic!

যাদের মনের জোর আছে, তারা সব কিছুকে উপেক্ষা করে নিজেদের পথে চলে যায়—পেছনে ফিরে তাকায় না। তাদের বাড়িতে কিংবা সমাজে সুনাম নেই। তাদের স্ত্রীরা ক্লাবে, পার্টিতে গিয়ে বয় ফ্রেণ্ডদের কাছে নালিশ জানায়। কখনও কখনও তাদের কোলে মাথা রেখে Sob করে, আর বলে—জান, আমার লাইফটা মিজারবেল হয়ে উঠেছে—oh! that brute of a husband.

আর যারা উমার মত ভদ্রলোক, তাদেরও দুর্গতির অন্ত নেই—নিজেদের তারা নিঃশেষ করে ফেলে—তবুও যদি গিন্নীর মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়। শর্বরী দেবীরাও Boy friend-দের কাছে কমপ্লেন করে—কিন্তু সেটা একটু অন্য ধরনের—I pity that man—really he is so sincere and devoted.

উমা আর আমি এস্‌প্ল্যানেড থেকে যার যার রাস্তা ধরলাম। যাবার আগে ও আমাকে বলল—পৃথ্বীশ, কি করব, বলতে পারিস্? তোকে বলব কি, আমার নামে ছ'টা সিভিল কেস্ আর তিনটে ক্রিমিন্যাল কেস্ ঝুলছে—মাঝে মাঝে মনে হয় একদিকে পালিয়ে যাই।

কিন্তু সত্যিই কি পালান যায়? সংসারে কেউই পালাতে চায় না। বাঁচবার জন্যে আগ্রহ সবারই সমান। তাই উমাও বাঁচবার পথ খুঁজতে লাগল। আসল কথা হচ্ছে, ওকে ক্লাইভ স্ট্রীটের

সেই মারাত্মক রোগে ধরেছে—হঠাৎ বড়লোক হবার রোগ। আমি জানতাম এই রোগটি না সারলে, ও সুস্থ সবল জীবন যাপন করতে পারবে না।

অসিত সেনও বাঁচতে চাইছে। ও যখন বুঝতে পারল যে শীলা সব কিছু সত্ত্বেও, ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতির পথে যেতে রাজী নয়, তখন ওর মন স্বাভাবিক নিয়মে অন্য পথে যেতে চাইল। ও পেতে চাইল একটি নরম মনের সংস্পর্শ যেখানে তর্ক নেই, অস্বাভাবিকতা নেই, careerism নেই—আছে ভালবাসার শিশির-ধোয়া ছোঁয়াচ; যেখানে সামান্য কিছু দিলে, হাজার গুণ ফিরে পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, শীলার মনের গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে অসিত বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শীলাকে সরাসরি জানতে দেওয়া লজ্জাজনক—হ্যাঁ, আজ আর হয়তো বেদনাদায়ক নয়। বেদনা যখন ঝরে পড়া ফুলের পাপড়ির মত শুকিয়ে যায়, তখন লজ্জাটাই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। অসিত বেশ বুঝতে পারছিল, সে শীলার কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ খবর পেলাম, অসিত সেন ওয়াড্রোব কোম্পানীর চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। কি সাংঘাতিক খবর! এত কষ্টের পর, একটা চারশ' টাকা মাইনের চাকরি জুটলো— তাও ও ছেড়ে দিল; কিন্তু এখন ওর উপায় হবে কি? আবার সপরিবারে অনশন! আমারও তো কোন আয় নেই যে দু-চার পয়সা ওকে সাহায্য করব! কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, অসিত শীলা মজুমদারকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যেই চাকরি ছেড়েছে! অত কাছাকাছি থেকে কাউকে ভোলা যায় না। আর তা ছাড়া ব্যর্থতার গ্লানিও রয়েছে। একদিন অসিতের সঙ্গে দেখাও করলাম। আমার আকুল প্রশ্নের জবাবে ও বলল—

ভাই, চাকরি তো ছাড়লাম—এখন শীলাকে কি বোঝাই বল তো? চাকরি ছাড়বার পর তার সঙ্গে দেখা করি নি। কাল ওর একখানা চিঠি পেয়েছি। পড়ে দেখ।

চিঠিখানা খুলে পড়লাম—

বৈকুণ্ঠ মল্লিক লেন
কলকাতা

প্রিয় অসিত,

তুমি কেন চাকরি ছেড়েছ, আমি জানি। আমি তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছি। কিন্তু কথাটা আমাকে বললেই পারতে—আমিই চাকরি ছাড়তাম। আমার চেয়ে তোমার টাকার প্রয়োজন অনেক বেশী। তোমার জন্যে আমার ভাববার অন্ত নেই! কেন তুমি এ কাজ করলে? আমি তো এমনিতেই আগামী মাসে লীড্‌স্‌ ইউনিভার্সিটিতে social education course পড়তে যাচ্ছি! তোমার সাথে বহুকাল দেখা হবে না! আমার দিন কাটবে কেমন করে তাই ভাবছি। এখানে থাকলে তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অন্ততঃ তোমার খোঁজখবরটা পেতাম।

শোন, লক্ষ্মীটি—আমার সেভিং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট থেকে দু-হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক তোমাকে পাঠালাম। টাকাটা তুলে রেখো এবং প্রয়োজন বোধে খরচ করো—আমাকে যদি সহ্য করতে না পার, তো তুমি এ-টাকায় হাত দিও না—ছোট ভাইবোন আর মার জন্যে খরচ করো। ইতি—

তোমার
শীলা

পুনশ্চ—চাকরি পেলে টাকাটা ফেরত দিও। তোমাকে কিছু দেবার মত সৎসাহস আমার নেই।

আমি শীলা মজুমদারের চিঠিটা বার কয়েক পড়লাম। অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—চেক্‌টা ফেরত দিয়ে দিই, কি বল? আমি বললাম—ফেরত দেবার কোন দরকার নেই—যদি চাও তো ওটা ভাঙ্গিও না। ফেরত দিলে মিস্‌ মজুমদার বড্ড শক্‌ পাবে।

রাস্তায় আসতে আসতে ভাবছিলাম, অসিত যেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে বাঁচতে চাইছে, ঠিক শীলাও তেমনি একটা অহেতুক গ্লানিময় অস্তিত্বের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে। অসিতের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধটাও সে ভেঙ্গে দিতে রাজী নয়। চেক্ দেওয়াটা তারই একটা নিদর্শন মাত্র।

এর মধ্যে একদিন এক বন্ধুর আপিসে যেতেই সে একটা চাকরির খোঁজ দিল। একটা বড় আপিসে পাবলিক রিলেশান্স ডিপার্টমেণ্টে চাকরি—ভাল মাইনে—প্রায় আটশো টাকা। বহুদিন পরে মনে একটু আনন্দ হল। টাকার বড় প্রয়োজন। বন্ধুর কাছ থেকে একটা introduction চিঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ভারতীয় কোম্পানী ; কিন্তু আপিস খুব বড়, বহু লোক কাজকর্ম করে। চিঠিখানা বেয়ারার কাছে দিতেই, এক ছোট ভারতীয় সাহেব ডেকে পাঠালেন। এ সাহেব বাঙালী নন—পাঞ্জাবী। বেশ চমৎকার চেহারা—ইংরেজী উচ্চারণও খুব ভাল। আমাকে দেখে তিনি বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লেন। আমার বন্ধুর চিঠি পড়ে তিনি আমাকে যেরকমটি দেখতে চেয়েছিলেন, সত্যিকারের আমাকে তা দেখতে পেলেন না বলেই বোধ হয়। বসতে বলেই জিজ্ঞেস করলেন—পাব লিক রিলেশান্স কাকে বলে জানেন তো ?

আমি যদ্দুর জানি, উত্তর দিলাম।

পাঞ্জাবী সাহেব আমার পোশাক-আসাক দেখে যতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তার চেয়ে কম অসন্তুষ্ট হলেন উত্তরটা পেয়ে।

তারপরই তিনি চলে এলেন কোম্পানীর স্ট্রাইক-এর ব্যাপারে। দু-মাস হল স্ট্রাইক চলছে। ইউনিয়ন খুব শক্তিশালী। একটা কাউণ্টার ইউনিয়ন দাঁড় করবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এখনও কোনও ফল হয় নি।

তারপর তিনি চলে এলেন তাঁর সোজা প্রস্তাবে—দেখুন, পাব্লিক

রিলেশান্স ডিপার্টমেণ্টকে স্ট্রাইক ভাঙ্গার কাজে লাগানো হয়েছে। আপনি তো ইকনমিক্স-এর ভাল ছাত্র ছিলেন—statistics দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের কোম্পানী যা মাইনে দেয়, তা Working class living index-এর তুলনায় ঢের বেশী—যারা স্ট্রাইক করবার হুজুগ জুটিয়েছে, তারা ওয়ার্কারস-দের শত্রু—আর সঙ্গে সঙ্গে loyal workers-দের দিয়ে একটা পাল্টা ইউনিয়ন গড়তে হবে—যদি রাজী থাকেন, তাহ'লে আপনাকে আজই appointment দিচ্ছি—We shall straightaway put you on our covenanted scale.

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। চাল থেকে তেল, নুন, চিনি, কাপড় সব জিনিসের দাম বেড়েছে। এটা অস্বীকার করব কি করে বলুন তো? Statistics-কে তো আর উল্টে কোম্পানীর সুবিধে মত বসিয়ে দেওয়া যাবে না?

মিঃ সিং ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন—We have already been paying higher wages—আপনি বুঝতে পারছেন না।

আমি বললাম, ইউনিয়ন-এর লোকদের ডেকে সেই কথাটা বুঝিয়ে দিন না কেন? উল্টোপাল্টা statistics জুড়ে দিয়ে লাভ কি হবে খামকা? মিঃ সিং বললেন—It's a question of prestige. আমরা ওদের সঙ্গে কথা কইতে রাজী নই। মাইনে বাড়িয়ে দিতে রাজী আছি—বোনাস্ দু-মাসের জায়গায় চার মাসের দিতেও রাজী আছি; কিন্তু ইউনিয়ন ভেঙ্গে দিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—You know, even our government have been helping the workers—that's the trouble.

মিঃ সিং-এর সাথে আরও কিছুক্ষণ আলাপ হল। বুঝতে পারলাম, শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে কোম্পানীর বিশেষ কোনও আপত্তি নেই। এমন কি Tribunal-এ গেলেও শ্রমিকরাই হয়তো

জিতবে।—কিন্তু ইউনিয়ন-এর দুই-তিন জন পাণ্ডাকে যে করেই হোক চাকরি থেকে বিদেয় করতে পারাটাই আসল উদ্দেশ্য। বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম, Public Relation Department-এর সব কর্মচারী এবং অফিসারদের ইউনিয়ন ভাঙ্গার কাজে লাগানো হয়েছে। কথা বলতে বলতে মিঃ সিং দু-এক সময়ে কিন্তু একটু নরম হয়ে আসছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে কোম্পানীর অ্যাটিটিউড সবটাই ভাল নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, আর কোথায় গেলে মাসে দু-হাজার টাকা মাইনে, গাড়ি এবং সাহেবী পাড়ায় চমৎকার কোয়ার্টার পাওয়া যাবে? একবার তিনি দুঃখ করে বলেও ফেললেন—I often feel damn tired of this bloody job—but what to do?

কাপ দুই কফি আর মিঃ সিং-এর গোটা পাঁচেক সিগারেট ধ্বংস করে যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। ঝুটা স্ট্যাটিসটিক্স তৈরী করতে পারব না তাও ঠিক, ইউনিয়ন ভাঙ্গার কাজ করতে পারব না তাও ঠিক, কিন্তু টাকার বড়ই প্রয়োজন। মেজদার এখনও চাকরি হয় নি—বেচারার পরিবারটা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু সে সত্য যত রূঢ়ই হোক না কেন, যা খারাপ, যা অন্যায় তার কাছে মাথা হেঁট করতে কখনও শিখি নি। হে মস্তক তুমি উদ্ধতই থাকো—মায়াবিনী ক্লাইভ স্ট্রীটের ছলনার খেলায় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলো না।

জি, পি, ও-র কাছে আসতেই কিশোরীমল সুরজমলের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক খুবই ব্যস্ত। Small Industry-র scheme-এ পাঁচ-পাঁচটা নতুন কারখানা শুরু করে দিয়েছেন। আমার চাকরি নেই—তিনি জানতেন। তাই আমার জন্য একটা চাকরির প্রস্তাবনা করলেন। বললেন—বাবুজী, আমাদের গাল্লা অ্যাসোসিয়েশনের জন্যে একজন সেক্রেটারি চাই। বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ। তারপর শুনলাম, একটা বাজার আছে ক্লাইভ স্ট্রীটের খুব কাছাকাছি। সেখানে ডাল, কলাই, সরষে, তিসী, গম প্রভৃতি

কেনাবেচা হয়। একটা ছোট্ট আপিস আছে। তিন শ' টাকা মাইনে পাওয়া যাবে—মাত্র দু', ঘণ্টার কাজ। মন্দ কি—আমি ভাবলাম—দু-ঘণ্টা কাজ করে তিন শ' টাকা রোজগার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসিত সেনের কথা মনে পড়ল। ' বেচারার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। আর তার ওপর শীলা মজুমদারের ঘটনা ওকে বড্ড বেশী আঘাত দিয়েছে। এই সময়ে যদি ওকে একটা কিছু জুটিয়ে না দেওয়া যায়, ওর যা অবস্থা হবে তা কল্পনাতীত। আমি কিশোরীমলকে সোজাসুজি বন্ধুর কথা বললাম। তিনি রাজী হয়ে গেলেন—যদিও আমি চাকরিটা নিলে তিনি সবচেয়ে খুশী হতেন। অসিতকে খবর দিলাম—আর খবর দিলাম কি,—পরের দিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে এলাম।

কয়েকদিন বাদে আবার অসিতের ওখানে অর্থাৎ গাল্লা অ্যাসোসিয়েশনে গেলাম চাকরিটা সম্বন্ধে তদারক করতে। নিজের যখন কাজকর্ম থাকে না তখন অন্যের কাজকর্মের তদারক করে বেড়ানো আমার ছোটবেলাকার একটা স্বভাব।

বাজারটার ভেতর ঢুকতেই গা বমি বমি করতে লাগল। কয়েক শ' লোক প্রচণ্ড হৈ-হল্লা করছে। মালপত্রের দেখা নেই, শুধু কতকগুলি লোকের হাতে কাগজের ঠোঙ্গা। মনে হল, ওর ভেতরে সব জিনিসের স্যাম্পল রয়েছে। এখানে-ওখানে পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে। জায়গাটা দেখে মনে হয়, গত দু-এক শতাব্দী ধরে সেখানে ঝাড়পোছের বালাই নেই। পাখির বিষ্ঠা আর ডাল কলাইয়ের গন্ধ মিলে একটা অদ্ভুত গা ঘিন্ ঘিন্ করা পরিবেশ। এপ্রিল মাস হবে—কলকাতার আকাশে আগুনের ঝলক। লক্ষ লক্ষ লোক এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে চাতক নয়নে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমি এক আকাশ মেঘ মাথায় করে অসিতের আপিসে ঢুকলাম। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আকাশ ভেঙ্গে জল নামল। যেই না দু-ফোঁটা জল পড়া অমনি বাজারের মধ্যে এক দানবীয় চীৎকার শুরু হল—নিজের কানে না শুনলে সে গগন-

বিদারী আর্তনাদ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। বহুদিন পরে মানুষ দেখলে মানুষ-খেকো জন্তুগুলিও বোধহয় অমন চেঁচিয়ে ওঠে না। ব্যাপার কি? অসিতের সঙ্গে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সারা বাজারে দৌড়াদৌড়ি, হুটোপুটি। শুনলাম, জনা দশেক লোক দাঁত বের করে চেঁচাচ্ছে—পানী গিরা—সরষো কা ভাও তিরিশ ছে। আমি অসিতের দিকে তাকাতেই ও বলল—সরষের দাম বত্রিশ তেত্রিশ টাকায় নেমে গিয়েছিল। এর মধ্যেই পশ্চিমের মোকামে সার্কুলার চলে গেছে—বাজার খারাপ, মালপত্র যেন বেশী পাঠান না হয়। যারা ছোট ছোট মহাজন, তাদের ব্যাঙ্কের দাদন নেই—তারা তবুও মাল পাঠিয়ে চলেছে—আর বড় বড় মহাজনেরা মাল আটকে দিয়েছে—যদি তবুও কলকাতায় মালের দাম খানিকটা চড়ে যায়।

আমি কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই বললাম—কিন্তু বৃষ্টি পড়েছে তার জন্যে সরষের দাম চার টাকা বেড়ে গেল কেন?

অসিত বলল, ওদের হিসেব হচ্ছে যে, বৃষ্টি পড়লে লোকের মন ভাল হবে। গ্রামে গ্রামে চাষীরা অ্যাদ্দিন জলাভাবে চাষবাস করতে পারছিল না। তাদের মন ছিল খারাপ, তারা হাট-বাজারে যাচ্ছিল না—তেলও তাই কম কাটতি হচ্ছিল। তেল কম কাটতি হলে সরষেরও কাটতি কম হবে।

—ও! আমি বললাম, বুঝতে পেরেছি আর কিছুই বলতে হবে না। প্রকৃতির সাথে মানুষের মনের যে-গভীর সংযোগ রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে সরষের দাম চড়ে গেল, এই তো! এক কথায় বলতে পার Agropsychological basis of Economics. উলটো দিক থেকে বিচার করলে আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল-র ইতিহাস এসে দাঁড়াবে। কিন্তু ব্যবসা এবং অর্থ নৈতিক দিকটা ছেড়ে দিলেও এদের চিন্তাশক্তির প্রসারতার বাহবা দিতে হয় বৈকি! এরা কাব্যচর্চা করলে যে খুব বড় কবি হতে পারত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কি বল? কোথায়

হাপুরের বাজারে মহাজনের গুদোমে মাল রইল, আর কোথায় রইল বর্দ্ধমান জেলার রসুলপুর গ্রামের আলিজান মোল্লা—এক ফোঁটা আকাশ-ঝরা জলবিন্দু দু'জনকে এক সোনার রাখী দিয়ে বেঁধে দিল। চিন্তাশক্তির কি বিরাট স্থিতিস্থাপকতা!'

অসিতের সঙ্গে আলাপ করছি, হঠাৎ কিশোরীমল সুরজমল আপিসে ঝড়ের বেগে ঢুকে ক্যাশিয়ারের সঙ্গে মৃদুস্বরে কি আলাপ করলেন, তারপর হাজার তিনেক টাকা গুনে পকেটস্থ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অসিত ক্যাশিয়ারকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল—টাকাটা কিশোরীবাবু একদিনের জন্যে ধার নিলেন, ওঘরে বাজির টাকা দিতে হবে। অসিত আর আমি দুজনেই এক সঙ্গে ঘুরে বসলাম; মুনিবজী বললেন—হ্যাঁ বাবুজী, ওঘরে আজ জল হবে কি হবে না, তাই নিয়ে সবাই মিলে ফাটকা খেলছিল। কিশোরীবাবু হেরে গেছেন—এখনই টাকাটা তাঁকে মিটিয়ে দিতে হবে।

ক্লাইভ স্ট্রীটে ফাটকা হয় না এ হেন চীজ নেই। চাল, ডাল, চিনি, তেল, কোম্পানীর শেয়ার, এ সব তো আছেই—বৃষ্টি, ফুটবল ও ক্রীকেট খেলা, এগুলিও বাদ যায় না। কিছুক্ষণ পরে কিশোরী-বাবু আবার আপিস ঘরে ঢুকে নিজেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে খুলে বললেন। তাঁর মোট বক্তব্য হচ্ছে যে রেসের ঘোড়াকে যেমন খাইয়ে দাইয়ে প্রস্তুত রাখতে হয়, ফিল্ম অ্যাক্‌ট্রেসকে যেমন স্কীপিং করে শরীর ফিট রাখতে হয়, বড় বড় ব্যবসায়ীদের ঠিক তেমনি করে সব সময়ে একটা ফাটকার আবহাওয়ায় নিজেদের জীইয়ে রাখতে হয়—না হলে স্পেকুলেশনের স্পিরিটটা নষ্ট হয়ে যায়।

আমি বললাম, বৃষ্টি হবে কি না হবে, জানলেন কি করে? আপনি কি ওয়েদার স্পেসালিস্ট?

কিশোরীবাবু মৃদু হেসে বললেন, ধরেছেন ঠিকই, আমাদের কাছে রোজকার আবহাওয়ার খবর এসে যায়—আমরা খবর পাবার বার ঘণ্টা পরে আপনারা কাগজে সেই সব খবর পেয়ে থাকেন।

—সে কি কিশোরীবাবু? আমি বললাম।

—আমাদের কাছে দুনিয়ার সব খবর পাবেন। আপনি রাত একটার সময়ে আমার বাড়িতে যান তো দেখতে পাবেন আমি দুটো টেলিফোনে কান লাগিয়ে বসে আছি। দিল্লীর চাঁদির বাজার আর হাপুরের গাল্লার বাজারের খবর রাত দুটোর মধ্যে রোজ পাওয়া চাই-ই, নইলে পরের দিনকার প্ল্যান সব ভেস্তে যাবে।

সত্যিই কি অসীম ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়! আমি চোখ বুজে দেখতে পেলাম, কিশোরীমল যেন ল্যাবরেটরীতে ব'সে রিসার্চ করছেন—মাইক্রোস্কোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। হ'তে পারতেন বই কি কিশোরীমল রিসার্চ স্কলার! আজ তিনি হয়তো বাইওকেমিষ্ট্রী বা Astro-physics এর নাম শোনেন নি—কিন্তু পয়সা রোজগার বলে ক্লাইভ স্ট্রীটে যে সাবজেক্ট রয়েছে, তাতে তিনি ডক্টরেট পেয়ে গেছেন বহু কাল।

ভাবছিলাম, এমন সমাজ ব্যবস্থা কি হ'তে পারে না যেখানে বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ কিশোরীমলরা সবাই জুয়ো না খেলে সত্যিই রিসার্চ-এর কাজে নেমে পড়বে? নিশ্চয়ই হতে পারে! ধর্মসংস্থাপনার জন্য যে সব অবতাররা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের কর্ম নয়, দুচারজন টিকিনাড়া পণ্ডিতদেরও কর্ম নয়—আমি, আপনি আর আমাদের মত লক্ষ লক্ষ লোক যেদিন চাইবে, সেইদিন গাল্লা বাজারের ফাটকা বন্ধ হবে—বন্ধ হবে বৃষ্টি আর ফুটবলের ওপর ফাটকা! আর হয়তো বা কিশোরীমলের মত পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী লোকরা ল্যাবরেটরীতে রিসার্চ করা শুরু করবে!

অসিতের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা। ওর কাছে শুনলাম, শীলা মজুমদার প্রায় দুমাস হ'লো লীড্‌স্ ইউনিভার্সিটি-তে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। ওয়াড্রোব কোম্পানীই ওর সব খরচা বহন করবে—ফিরে এলে ওইখানেই বেশী মাইনেতে চাকরি হবে। খবরটা

ভাল। অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—আশ্চর্য! খবরটা পরিবেশন করতে গিয়ে ওর মুখে এতটুকু বেদনার ছায়া পড়ে নি। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে হলেও শীলার কথা বলতে গিয়ে ওর অনুভূতির আতিশয্য যে কোনও লোকের কাছে ধরা পড়ে যেত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শীলা চিঠি লিখেছে?

—অনেকগুলি লিখেছে—

—কি লিখেছে—সব মামুলি কথা বুঝি?

—না একটাও মামুলি কথা নয়, আসল কথাটা কি জান পৃথ্বীশ?

—বল

—আসল কথাটা হচ্ছে, আমার জন্যে ওর অসম্ভব চিন্তা।

—হয়তো তাই, বোধহয় তোমাকে হারাবার ভয় আছে বলে।

—কিন্তু তুমি ত জানো, আমাকে ও হারিয়ে বসে আছে।

—বড্ড তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাওয়া হল না কি?

—হয় তো হবে তাই—কিন্তু পৃথ্বীশ, আমাকে বাঁচতে হবে ত? তুমি কি আমাকে আলেয়ার পেছনে ছুটতে বলছ?

—সবই বুঝি, আমি বললাম, কিন্তু তবুও যদ্দিন মিস্ মজুমদার তোমাকে না হারিয়ে থাকতে পারে!

দুজনে একটা রেষ্টুরেণ্টে বসে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। মিনিট দুই চুপ করে থেকে অসিত বলল, পৃথ্বীশ, আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি। অন্য কেউ হ'লে হয়তো লাফিয়ে উঠে অসিতকে ড্যাম ফুল বলে গালাগালি করত। কিন্তু আমার কাছে অসিতের এই মনোভাব মোটেই অস্বাভাবিক ব'লে মনে হল না। আমি বলতে পারি, সেই মুহূর্তে আর শুধু সেই মুহূর্তে কেন জীবনের যে কোন মুহূর্তে অসিতের কাছে শীলার মূল্য সবচেয়ে বেশী থাকবে—কিন্তু দেহ, মন আর পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে স্বাভাবিক মানুষ একটা কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারে না। আর তাছাড়া যা হলে ভাল হত, তা না হ'য়ে অসিতের মনে যে একটা

অস্বাভাবিক বেদনার ছায়া পড়েছিল, সেটাকে মুছে ফেলতে হলেও তখন চট্ করে আর একটি মেয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াই ওর পক্ষে সমস্যা সমাধানের সব থেকে সহজ পথ।

আমি শুধু বললাম, শীলা কষ্ট পাবে না তো ?

—পেলে পাবে, অসিত বলল, আমার কি করবার আছে। আমি আমার মনের কাছে নির্দোষ—তাকে আমি ঠকাই নি। এখন যা কিছু হবে তার দায়িত্ব শীলার, আমার নয়!

আমি আর কোনও কথা বললাম না। উমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখেছিলাম। সেবা ঘোষের যখন অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল, উমা তার একমাসের মধ্যে শর্বরী দেবীকে বিয়ে করে ফেলেছিল। জিনিসটার মধ্যে ব্যর্থতা ঢাকবার প্রয়াসটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। উমা ছ-মাস বাদে বিয়ে করলেও পারত, অসিত বিয়ে করবার ডিসিশান্টা দু-চার মাস বাদে নিলেও পারত, কিন্তু ব্যর্থতার পরিহাস এত কুটিল ও ক্রূর যে অনেক সময়ে অনেকের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না—অবিশ্যি উত্তেজনার মুহূর্তে সংঘটিত অন্য কাজটির ফলাফলও যে ভাল হয় তাও নয়। উমার হঠকারিতার ফল হাতে হাতে পেয়েছে—এখন বন্ধুবর অসিত সেনের ভাগ্যে কি আছে, কে জানে ?

দুঃসহ বেকারত্ব মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে তুলছিল। মাঝে মাঝে মনের কাঁটা-তার দেওয়া বেড়া ডিঙিয়ে পাবলিক রিলেশান্স অফিস-এর সেই চাকরির কথা কেন যেন মনে হয়। ছোট্ট একখানা গাড়ি—প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ি—মাস গেলে প্রায় হাজার টাকা মাইনে। মেজদার মেয়েটার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারায়, এবার তার পরীক্ষা দেওয়া হল না। সেদিন ও খুব কাঁদছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রী আর তার মায়ের চোখের জল আমার মনটাকে মাঝে মাঝে কেমন যেন দুর্বল করে দেয়।

আর যখনই দুর্বলতা আসে, তখনই চোখ বুঁজে সমুদ্রের মাঝখানে ঢেউ-এর মার খাওয়া একটা পাহাড়ের ছবি দেখতে পাই—যে পাহাড়টা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনাদিকাল থেকে। স্মরণাতীত কাল থেকে ওর চারদিকে সমুদ্রের ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে, আর সেই আঘাতে ওকে চুরমার করে দেবার চেষ্টা করছে—কিন্তু আজও সে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি ভাবি, হে আমার মন, তুমিও ছোট পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে মার খাও, কিন্তু মরে যেও না।

মাস কয়েক পরের ঘটনা বলছি। ক্লাইভ স্ট্রীটের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ পাঞ্জাবী ছোট সাহেব মিঃ সিং-এর সাথে দেখা। ইনিই সেই পাবলিক রিলেশান্স-এর চাকরিটার interview নিয়েছিলেন। সেই সুবেশ, সুপুরুষ যুবাকে আজ দেখলে চিনতে পারা যায় না। ময়লা প্যাণ্ট আর হাফ্‌সার্ট পরে মিঃ সিং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমি কাছে যেতেই, আমাকে হাত তুলে নমস্কার করলেন—নমস্তে! আমি ভাবলাম, গুড্‌ ডে বা গুড্‌ মর্নিং যখন নমস্তে হয়েছে তখন ব্যাপার গুরুতর সন্দেহ নেই। কুশলবার্তাদি জিজ্ঞেস করতেই মিঃ সিং তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

কোম্পানীর স্ট্রাইক যখন পুরোদমে চলছে, তখন একদিন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সিং-কে একটা গুরু-দায়িত্ব দিলেন। বিলাসপুর থেকে দুশো শ্রমিক আনা হয়েছে। ওর ওপর অর্ডার হল যেমন করেই হোক্‌ এই দুশো লোককে ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে যারা ফ্যাক্টরীর গেটের কাছে শুয়ে আছে, তাদের মাড়িয়ে যেতে হবে। মিঃ সিং গোড়ায় আপত্তি করলেন—কিন্তু বড়কর্তারা শুনলেন না। ওঁরা বললেন—ভয় নেই, সঙ্গে ত্রিশ জন ভোজপুরী দারোয়ান দিচ্ছি। টেলিফোনের কাছে স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার সাহেব বসে থাকবেন সর্বক্ষণ। প্রয়োজন হলে পুলিশের ব্যবস্থাও করা হবে। মিঃ সিং বললেন, I was between the Devil and the

Deep Sea. একদিকে চাকরি, আর একদিকে শ্রমিকদের ঘৃণার আগুন।

তারপরের ঘটনা হল,—গভীর নিশীথে মিঃ সিং দুশো বিলাসপুরী শ্রমিক নিয়ে ট্যাংরার ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, হট্টগোল আর মারপিট। একটা বোমা এসে মিঃ সিং-এর বাঁ হাতে লাগতেই উনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কাছেই পুলিশের আস্তানা ছিল। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় স্ট্রাইকের প্রথম দিন থেকেই পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করেছিল। হৈ-হল্লা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে পঞ্চাশ ষাট্ জনকে গ্রেপ্তার করে ফেল্‌ল। বলা বাহুল্য তার মধ্যে মিঃ সিংও অন্যতম।

ঘটনার বর্ণনা শেষ করে মিঃ সি হঠাৎ তার বাঁ হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন, আমার দুটো আঙ্গুল উড়ে গেছে। আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম। মিঃ সিং বললেন—এখনই দুঃখ প্রকাশ করবেন না—My cup of misery is not yet full. আমার আঙ্গুল উড়ে গেছে তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই, মিঃ ঘোষ। চাকরি রাখতে গিয়ে যে কাজ আমি করতে গিয়েছিলাম, তাতে করে, আঙ্গুল উড়ে যাওয়া কেন, আমার মৃত্যুও হতে পারত। এখন দেখছি, মৃত্যু হলেও ছিল ভাল। হয়তো বা কোম্পানী আমার পরিবারকে পাঁচ দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিত।

তারপরে মিঃ সিং যা বললেন, তা সত্যিই প্রায় অবিশ্বাস্য। সেদিন রাত্রিবেলা পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের নামে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের হল। মিঃ সিং হলেন প্রধান আসামী। শান্তিভঙ্গের জন্য তিনিই প্রধানতঃ দায়ী হলেন।

কোম্পানী যখন বুঝতে পারলে অবস্থা বেগতিক, তখন কোর্টে মামলা উঠতে না উঠতেই ইউনিয়নের নেতাদের ডেকে ধর্মঘট নিষ্পত্তি করে ফেল্‌ল। শ্রমিকদের প্রায় সব দাবীগুলিই আদায় হল—কিন্তু মিঃ সিং চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন। কারণ খুব

সোজা—শ্রমিকরা বললেন, ওরকম কর্মচারী থাকলে, তারা চাকরি করতে রাজী নন!

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে মিঃ সিং-এর চোখের পাতা আর্দ্র হয়ে উঠছে। তিনি বললেন—বিদায় দেবার সময় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সামান্য কিছু টাকা ছাড়া কোম্পানী আর কিছুই আমাকে দেয় নি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নাকি ইউনিয়নের কাছে পেশ করলেন যে সেদিনকার রাত্রির সমস্ত ঘটনার জন্য মিঃ সিংই দায়ী। তার এই ব্যবহারের জন্য কোম্পানী সত্যিই দুঃখ প্রকাশ করছে। দোষী অফিসারকে যখন বরখাস্ত করা হয়েছে, যেন কোম্পানীর সাথে শ্রমিকদের কোনও গোলমাল থাকতে পারে না।

শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মিঃ সিং যত অন্যায়ই করে থাকুন না কেন, সমস্ত কাজটার দায়িত্ব কোম্পানী পরিচালকদের—তাদেরই আদেশমত ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছিল। আমার মনে হল সাধারণ চোর ডাকাতদের মধ্যে যে ভদ্রতা ও আত্মীয়তাবোধ থাকে, ক্লাইভ স্ট্রীটের বড় বড় কোম্পানীর মালিকদের মধ্যে সে বোধটুকু পর্যন্ত নেই! তা তো হবেই! মনুষ্যত্ববোধ যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুটা মাত্র থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এরা ক্লাইভ স্ট্রীটের বাজারে অজ্ঞাত কতকগুলি সংখ্যা মাত্র—আস্তে আস্তে জীবনের সাধারণ মূল্যবোধগুলিকে মূলোচ্ছেদ করতে পারলেই এরা একদিন কেউকেটা হতে পারবে—হতে পারবে শেঠজী। এদের লালসার আগুনে বহু লোককে আজ পর্যন্ত আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পাবলিক্ রিলেশন অফিসার মিঃ সিং, তাদেরই একজন মাত্র।

চুপ করে দাঁড়িয়ে স্যাণ্ডেল দিয়ে পায়ের তলাকার মাটি ঘষ্‌ছিলাম। মিঃ সিং মৃদু কণ্ঠে বললেন—আপনার সঙ্গে কোন ট্রেড-ইউনিয়নের জানাশুনা আছে?

আমি বললাম, কেন?

মিঃ সিং বললেন, আমি একটু কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে চাই।

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, আপনি অনেক বেশী টাকা মাইনে পেতেন—ইউনিয়ন আপনার জন্যে লড়বে না। আপনাকে কোর্টে যেতে হবে।

এর মধ্যে মাস তিনেকের জন্যে একটু বাইরে গিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এক ভদ্রলোক সঙ্গে করে তাঁর একটা কাজ হাসিল করবার উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। যৎসামান্য পারিশ্রমিক-ও পেয়েছিলাম। তাই অনেকদিন কলকাতার হালচাল জানি না—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ নেই। উমার জন্যে মনটা কেমন-কেমন করছিল। অসিতের জন্যে দুর্ভাবনাটা একটু বেশী। প্রবাসে গিয়েও ওর কথা ভুলতে পারি নি। শীলা মজুমদারের ব্যাপারটা ওর জীবনে এমন একটা ওলট্-পালট্ এনে দিয়েছে যে ওর পক্ষে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে এখনও অনেক দেরি।

কলকাতায় ফিরে এসেই শুনলাম, অসিত বিয়ে করেছে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মাসখানেক আগেকার লেখা একখানা চিঠি হাতে দিল। পোস্ট কার্ড-এ দুটো লাইন লেখা— বুধবার আমার বিয়ে—তুমি উপস্থিত থাকবে। সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি—অসিত।

আমি ভাবলাম, সবই হয়তো ভাল হল। মহাকালের স্পর্শ একদিন অসিত আর শীলা দুজনকেই বিস্মৃতির আবরণ দিয়ে ঢেকে দেবে। Time is the best healer. কিন্তু তবুও মনে একটু খটকা লাগল। অসিত কি সুখী হয়েছে? আর শীলা? সে কি অসিতের ক্রোড়শায়িনী অন্য একজন স্ত্রীলোককে সহ্য করতে পারবে? তবু রক্ষে ও বিদেশে রয়েছে, নইলে একটা মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার হতো হয়তো। অসিতের নতুন জীবন দেখবার জন্যে মনটা খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। শীলার খবরও হয়তো পাওয়া যাবে ওর কাছ থেকে।

বিকেলবেলা পাঁচটা নাগাদ ক্লাইভ স্ট্রীটে গেলাম। ভাবলাম, অসিতের ওখানেই প্রথম যাব। হঠাৎ রাস্তায় ওয়াড্রোব কোম্পানীর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক অসিতের পাশেই

বসতেন। তিনি ছুটির পর আপিস-ফেরতা বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—

—শুনেছেন সব ?

—না তো—কিসের কথা বলছেন ?

—অসিতবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি ?

—আজ্ঞে না। প্রায় তিনমাস কলকাতায় ছিলাম না, আজকেই এসেছি। অসিতের আপিসেই যাচ্ছিলাম এখন।

ভদ্রলোক একটুক্ষণ দম নিলেন, কিছু বলবার আগেই আহা-আহা করে একটা হৃদয়বিদারক শব্দ করলেন, তারপর বললেন—আপনি তাহলে জানেন না যে আমাদের মিস্ মজুমদার বিলেতে স্যুইসাইড করেছেন ?

আমার তখন রাস্তার উপর বসে পড়বার অবস্থা। বললাম—মানে ?

—মানে যা বললাম, তাই। প্রায় মাসখানেক আগে মিস্ মজুমদার আত্মহত্যা করেছেন। আমরা সবাই মিলে মিস্ মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বিধবা মা আর ছোট ভাইকে সমবেদনা জানিয়ে এসেছি। সঙ্গে বড় সাহেবও ছিলেন।

তারপর ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, অসিতের বিয়ের খবর শীলা আগেই জানতে পেরেছিল। হয়তো বা আপিসেরই কেউ জানিয়ে থাকবে। ৩রা আগষ্ট অসিতের ফুলশয্যার রাত্রে শীলা লীড্‌স্ ইউনিভার্সিটি-র হস্টেল-এ নিজের ঘরে পটাসিয়াম সায়নাইড্ খেয়ে জীবনলীলা সাঙ্গ করেছে।

বেশ বুঝতে পারলাম, যখন কলকাতার এক মেঘমেদুর স্বপ্নভরা রাত্রিতে বেতসপত্রের মত কম্পমানা এক নারীর কাছে অসিত তার প্রেম নিবেদন করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে শীলা মজুমদার প্রেম নিবেদন করছিল মোহময় মৃত্যুর কাছে—যে-মৃত্যু তাকে এক দিনের জন্যে নয়, এক মাসের জন্যে নয়, এক বছরের জন্যে নয়, সারা জন্মের জন্যে বাসর শয্যায় আমন্ত্রণ করেছিল। সেই পীতাভ

জটাজুটধারী পুরুষকে প্রথম দেখাতেই কি শীলা ভালবাসতে পেরেছিল! জানি না, তবে মনে হয়, বার বার সেই বাসর শয্যায় শীলা অসিতকে খুঁজছিল আর ভাবছিল, আজ এখানে যদি অসিত থাকত?

শীলার মৃত্যুর পর হস্টেল-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়েব্‌স ওয়াড্রোব কোম্পানীর বড় সাহেবের কাছে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে নাকি জানিয়েছিলেন যে মৃত্যুবরণ করবার ঘণ্টা তিনেক আগে মিস্ মজুমদার হস্টেল-এর অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট-কে দিয়ে স্থানীয় ফ্লাওয়ার স্টল থেকে সবচেয়ে দামী আর সুন্দর ফুল আনিয়েছিল—ওর সবচেয়ে দামী পোশাকগুলি পরেছিল। ঘরের দরজা ছিল খোলা—ঘটনার পর সবাই যখন ওর ঘরে ঢুকল, তখন দেখল, সেই সপ্রতিভ, সদা হাস্যময়ী শীলা মজুমদার তখন তার বিছানার ওপর ঠিক ঘুমিয়ে আছে। 'You hardly come accross such a serene and poised death.'

ওয়াড্রোব কোম্পানীর ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি অসিতের আপিসে আর গেলাম না। মনের অবস্থা তখন এত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে কারুর সঙ্গেই সেদিন আর দেখা করতে পারলাম না। বেচারা অসিত! ওর কথা চিন্তা করতেই আমার হৃৎকম্প হতে লাগল। বাড়ি ফেরবার পথে আসতে আসতে ভাবতে লাগলাম, শীলার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? অসিত সেন? না, আমি তা মনে করি না। ওর কোনও দোষ নেই। শীলাকে নিজের মত করে না পেয়ে বিয়ে করা ছাড়া ওর গত্যন্তর ছিল না। তাহলে কে? শীলা নিজে? তাও নয়। শীলা অসিতকে সত্যিই ভালবাসত। সত্যিকারের দায়ী সেই সমাজ যে-সমাজ শীলার বুকে লালসার আগুন জ্বালিয়ে সহজ সরল পথ থেকে ওকে বিচ্যুত করেছিল—নিয়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক পথে। Careerism-এর মোহ ওর প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে হত্যা করেছিল। তাই একদিকে অসিতের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে

career-এর জন্য অদম্য ভালবাসা। অসিতের জন্য অনুভূতি মাত্র এক বছরের, আর career-এর জন্য অনুরাগ বহুকালের। প্রথম যখন অসিত ওকে বিয়ের কথা বলেছিল, তখন ও মনস্থির করতে পারে নি—কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখবে!। কিন্তু অসিতের বিয়ের খবরটা ওর মনকে পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে দিয়েছিল—সে-গ্লানি ও সহ্য করতে পারে নি!

যে-সমাজব্যবস্থায় লোক অকারণে বেকার হয়, সাধারণ সৎ-প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়, অস্বাভাবিক মানসিকতা জন্মে, শীলা মজুমদারের মত মেয়েরা আত্মহত্যা করে, সেই ব্যবস্থায় সব কিছুই হিসাবনিকাশের বাইরে। সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের স্থান নেই—আছে বিকৃত দর্শনের স্থান। ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে গত দুশো বছরে বহু দর্শন-শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে—যখন যে-অবস্থায় যেমন দর্শনের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি। তাতে করে কেউবা সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছেন, আবার কেউবা ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছেন। উপায় নেই—অনিশ্চয়তার মধ্যে মাত্র একটি থিওরি ধোপে টেঁকে—সেটা হচ্ছে ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং, ন চ বিদ্যা, ন চ পৌরুষং। ভাগ্যের উপর আস্থা না রেখে মানুষের এক পাও নড়বার উপায় নেই।

এই পরিবেশে যুদ্ধোত্তর কলকাতায় এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হল, যারা ভাগ্যচক্রের পথের নিশানা জানে। সত্যি তো, এরাই বেকারত্ব-অর্দ্ধাশন-অনশন লাঞ্ছিত সমাজের ত্রাতা।

শীলা মজুমদারের মৃত্যুর পর অসিতের মনের অবস্থা যা হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রক্ষা গাল্লা অ্যাসোসিয়েশনের চাকরিটা ওকে জুটিয়ে দিয়েছিলাম, নয়তো ও পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যা ঘটল, সেটা হচ্ছে এই যে, শীলার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা নব-বিবাহিতা পত্নী রমা দেবী সবই জানতে পারলেন। এক কথায় অসিতের জীবন দুর্বিসহ—ঘরে-বাইরে কোথাও শান্তি নেই। ওর সমস্ত সত্তার উপর

শীলার স্মৃতি এমন এক বেদনাদায়ক ছায়া ফেলল যে মানসিক শান্তির আশায় তখন ও গুরু খুঁজে বেড়াতে লেগে গেল। আর শুধু অসিত কেন, উমাশঙ্করও গুরুদেবের খোঁজে বেরিয়েছে—যিনি অমৃতের সন্ধান দিতে পারেন, যিনি পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত জীবন-ধারার থেকে ওকে তুলে কোনও শান্তিময় জগতে নিয়ে যেতে পারবেন। আমার অবস্থাটাও প্রায় তদ্রূপ হবার সম্ভাবনা ছিল—তবে ইতিহাসের ছাত্র বলে এবং ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীটের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্যে আমি আর ওপথে গেলাম না। কিন্তু ওরা যে ওপথে যাবেই, তা আমি জানতাম। ক্রমাগত অকৃত-কার্যতা মানুষকে এমন একটা বিষাক্ত পুঁতিগন্ধময় নরকে নিয়ে ফেলে, যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যারা কার্যকারণকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে, শুধু তারাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

একদিন দুপুরবেলা বাড়িতে বসে আছি, হঠাৎ অসিত এসে উপস্থিত।—চল, পৃথ্বীশ, তোমার সঙ্গে আজ এক মহাপুরুষের আলাপ করিয়ে দেব।

—আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন, অসিত?

—চলই না—দেখবে, তোমার মত নাস্তিক লোকও মাথা হেঁট করে থাকবে—

—আমি মাথা হেঁট করবার জন্যে অত ব্যাকুল হয়ে উঠি নি এখন—আমাকে রেহাই দাও ভাই।

অসিত শুনল না। আমাকে টেনে হিচড়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে নিয়ে গেল। ওর কাছে শুনলাম, এই মহাপুরুষ ব্যক্তিটির বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু দেখলে মনে হবে, চল্লিশের বেশী নয়। মহা পণ্ডিত ব্যক্তি—দর্শনশাস্ত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, বড় বড় লোকের সঙ্গে মোলাকাৎ করেছেন আর জ্ঞানের পাঞ্জা লড়েছেন এদেশের আর ওদেশের বহু জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে।

ইনি ব্যানার্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মিঃ রাখাল ব্যানার্জীর গুরুদেব। তাঁরই ক্লাইভ স্ট্রীটের একটা নতুন আপিস উদ্বোধন করতে আসছেন। সেই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

ব্যানার্জী কোম্পানীর আপিসে গিয়ে যখন পৌছলাম, তখন প্রায় তিনটে বাজে। বাইরের থেকেই দেখতে পেলাম প্রায় দু'শ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ট্র্যাফিক্ কণ্ট্রোল করবার জন্যে বিশেষ পুলিশের ব্যবস্থা হয়েছে। দু-তিনজন বড়কর্তা এসেছেন বলে, সার্জেণ্ট এবং উচ্চ পুলিশ কর্মচারীরাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। রাখাল ব্যানার্জীর নবনির্মিত আপিসে প্রবেশ করে দেখি, কলকাতার শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিরাও উপস্থিত রয়েছেন। শুনলাম, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, উকিল, ডাক্তারেরও অভাব নেই। আশ্চর্য! দেখি কিশোরীমল সুরজমল সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপর একটা ব্যাজ পরে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। হঠাৎ আমাকে একজন কেউ নাম ধরে ডাকতেই চেয়ে দেখি উমাশঙ্কর একটা চেয়ারে বসে আছে। বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, মারাঠী, সমস্ত জাতির লোকেরা এসেছেন। মনে হল, আমি, অসিত আর উমাই এ-সভায় অপাংক্তেয়। কিন্তু না, ঐ তো আমাদের দেবেনদাও রয়েছেন এক কোণে চুপটি করে বসে। অনেকদিন বাদে দেবেন-দার সঙ্গে আবার দেখা হল। বলিষ্ঠ যুবার মাথার চুলগুলি সব পেকে গেছে। একটা আদ্দির পাঞ্জাবীর পুরো গলাটা রিপু করে সেলাই করা। ঠিকই আছে, আমি ভাবলাম, অসিত-উমা-দেবেনদা জুটি অনিশ্চয়তার সমুদ্রে সাঁতরাতে সাঁতরাতে কূলের খোঁজে এসেছেন—কিন্তু কিশোরীমল সুরজমল, কোটিপতি লোহার ব্যবসায়ী রাখাল ব্যানার্জী আর বুধনদাস আগরওয়ালা, তিনটে খবরের কাগজের মালিক শ্রীচিদাম্বরম্, পাঁচটা বিলিতী কোম্পানীর এজেণ্ট রামভাই শান্তিভাই, হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সব এখানে কেন? এঁদের প্রয়োজনটা কিসের? এঁরা তো বহু-

কাল অনিশ্চয়তার রাস্তা ছেড়ে নিশ্চয়তার ঘাটে এসে রূপোর শেকল দিয়ে সোনার তরী বেঁধে ফেলেছেন। আরও একজনকে এখানে দেখতে পেলাম—মীনাদিকে। শ্রীচিদাম্বরম্ থেকে কিশোরী-মল পর্যন্ত সবাই মীনাদিকে চেনেন। চেহারা দেখে বয়েস মালুম হওয়া সম্ভব নয়—তবে দেখে মনে হল—তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়েস হবে মীনাদির। লম্বা সুঠাম দেহ—যৌবনের জোয়ার তখনও দেহের কূলে প্রাণ চাঞ্চল্যের ঢেউ তুল্ছে। মুখে রুজ লিপ্‌ষ্টিকের ছোপ রয়েছে। অন্য কোনদিন ওঁকে দেখি নি—আজ দেখলাম একখানা গেরুয়া রং-এর সিল্কের শাড়ি পরেছেন। যেখানে মহাপুরুষটি এসে বসবেন, ডায়াস-এর ঠিক সেইখানটিতে তিনি বসে আছেন। হাজার লোক এসে তাঁর কানে হাজার কথা বল্ছে। আর মীনাদি সবার সঙ্গে আদেশের সুরে কথা কইছেন। বলতে কি, মীনাদিই তখন সেখানে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু। মীনাদির মত আরও অনেক মেয়েরা সবাই এসেছেন। ছোটবেলায় দেখেছি সাধু-সন্ন্যাসী দেশে-গাঁয়ে এলে, মা, মাসীরা যেতেন আর হাত জোড় করে প্রকৃত ভক্তের মত মহাপুরুষের ভাষণ শুনতেন। কোনও কোনও সময়ে তাঁদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এখানে দেখলাম সব উলটো। নারী যাঁরা এসেছেন, তাঁদের বয়েস পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছরের উর্দ্ধে বড় একটা নেই—সাজগোজের দিক থেকে ফিল্মস্টারদের তাঁরা হার মানান। প্রায় সবাই ডায়াস-এর উপরেই বসেছেন। পুরুষদের মধ্যে যাঁরা কেবল অর্থের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ, তাঁরাই ডায়াস-এ জায়গা পেয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে একটা কলরব উঠ্‌ল—গুরুদেব এসে গেছেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে দেখলাম—একটা বিরাট হাওয়াই জাহাজের মত মোটর থেকে তিনি নামছেন। পরনে গেরুয়া রং-এর সিল্কের ধুতি—গলায় গোটাদশেক ফুলের মালা। সুপুরুষও বটে—যেমনি লম্বা তেমনি সুগঠিত দেহ—সত্যি দেখলে মনে হয় না চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের বেশী বয়েস হয়েছে।

পায়ে খড়ম—আঙুল দিয়ে চেপে ধরবার জায়গাটা সোনা দিয়ে তৈরী। সঙ্গে এক ভদ্রলোক একটা তানপুরা হাতে নিয়ে আসছেন। গুরুদেব যে-গাড়িতে এসেছেন, তার পেছনে অন্ততঃ দশখানা বড় বড় গাড়ি এসে থেমেছে।

গুরুদেব স্বামী অমৃতানন্দ হলঘরে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত সবাই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়লেন—এবং যাঁরা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁরা উবু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে লাগলেন। পায়ের ধুলোর এমন মূল্য আগে কখনও দেখি নি। মীনাদি এগিয়ে এসে স্বামিজীর হাত ধরলেন—তারপর আস্তে আস্তে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ডায়াস-এর ওপর। আমি অনেক বড় বড় দেশ-নেতাদের উপস্থিতিতে সভা-সমিতি দেখেছি—কিন্তু এমন অদ্ভুত শ্রদ্ধাবনত ভক্তবৃন্দ কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

স্বামী অমৃতানন্দ উপবেশন করলেন। একপাশে বসলেন মীনাদি আর একপাশে কোটিপতি লৌহব্যবসায়ী রাখাল ব্যানার্জী। অন্যান্য মুখ্য স্তাবকেরা বসলেন পেছনের দিকে—কিশোরীমল সুরজমলও তাঁদের ভেতরে অন্যতম। আমাকে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিশোরীমল হঠাৎ দৌড়ে ডায়াস থেকে নেমে এসেই বললেন—বাবুজী, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে—আসুন সামনের সীট-এ একটা জায়গা করে দিচ্ছি। আমার কোনও আপত্তি তিনি শুনলেন না—জোর করে ধরে নিয়ে ডায়াস-এর সামনে, গুরু-দেবের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

তারপরে সভার কাজ শুরু হল। স্বামী অমৃতানন্দ বক্তৃতা শুরু করলেন। চমৎকার বাচনভঙ্গী। বক্তৃতার শুরুতেই বললেন—রাখালের নূতন ব্যবসা উত্তরোত্তর উন্নত হবে, তা আমি জানতাম। আমি ওকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলাম—তার ওপরে ভিত্তি করেই ওর এই নতুন ব্যবসা। কর্মবীররাই ভগবানের আশীর্বাদ পেয়ে থাকেন। রাখালকে আমি জানি ও চিনি। ওর অর্থের প্রতি কোন লালসা নেই, ওর লালসা ধর্মের প্রতি। আর ধর্ম মানেই হচ্ছে কর্ম, কর্মহীন লোক ধর্মহীন।

উত্তেজনায় আমার মাথা ধরে গিয়েছিল। যে-সমাজে কর্মীকে ইচ্ছে করে অকর্মণ্য করে রাখা হয়, সে-সমাজে কর্মটাকে একটা পৃথক সত্তার চোখে দেখার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিই বা হতে পারে?

স্বামী অমৃতানন্দ বক্তৃতার শেষে তাঁর নতুন মঠের জন্যে টাকার আবেদন জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে চেক্ উড়ে এসে পড়তে লাগল—যেমন করে পতঙ্গরা অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুনে দেখি নি, বোধহয় আমি, উমা, অসিত আর দেবেনদা ছাড়া সবাই গুরুদেবের পায়ের কাছে একখানা করে চেক্ ফেলে দিয়েছিল। সভাশেষে শুনলাম, প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায় হয়েছে।

সভা সাঙ্গ হবার পরেও গুরুদেব ঘণ্টাখানেক থাকলেন—বিশিষ্ট শিষ্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য। গুরু-দেবের বয়স কত জানি না—তবে তিনি সবাইকে তুই বলে সম্বোধন করছিলেন। আমার কিন্তু গোড়ায়ই সন্দেহ হয়েছিল, স্বামিজীর বয়েস পঁয়তাল্লিশ-এর বেশী নয়। হঠাৎ তিনি বললেন—আমার বক্তৃতাটার একটা ইংরেজী অনুবাদ করে দে তো কেউ—চিকাগোর 'রিলিজিয়াস ফোরাম' কাগজে পাঠাতে হবে। জার্মান আর ইটালীয়ান অনুবাদটা বরং নবনী করে দেবেখন। নবনী চ্যাটার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত ভাষাবিদ্। তিনি স্বামিজীর পাশেই ছিলেন। এগিয়ে এসে স্বামিজীর পায়ের ধুলো নিলেন। এর অর্থ গুরুদেব তাঁকে যে গুরু দায়িত্ব দিলেন তার জন্য তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

কিশোরীমল সুরজমল আমাকে এসে ধরে পড়লেন—বাবুজী, স্বামিজীর বক্তৃতাটা একটু ইংরেজীতে লিখে দিন। আমি পড়লাম মহাবিপদে। বক্তৃতাটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম সত্য, কিন্তু বিষয়বস্তুর উপর কোনও শ্রদ্ধা নেই বলে, দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রায় সবগুলি কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। কিশোরীমলকে আমি কথাটা সোজাসুজি বলেই ফেললাম—ওসব বাজে জিনিস

আমি লিখতে পারব না কিশোরীবাবু, আপনি অন্য কাউকে বলুন। অসিত আর উমা এসে আমার হাত চেপে ধরল—লক্ষ্মী ভাই, একটু লিখে দাও না। আমাকে নিয়ে এই টানাহেঁচড়া দুজন লোক ডায়াস-এর উপর থেকে লক্ষ্য করছিলেন—একজন স্বামী অমৃতানন্দ নিজে, আর একজন হচ্ছেন মীনাদি। স্বামিজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই লিখে দে—তোকেই লিখতে হবে। তারপর ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, জান তো, তাঁর যে যত কাছে থাকে, সেই পারে তাঁর অনুজ্ঞাকে অবহেলা করতে। ওর মনে ভয় নেই—ও মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী। আমি আর কথা বাড়ালাম না। স্বামিজীর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়ার চেয়ে একটা কাগজ টেনে কয়েক লাইন লিখে দেওয়াটা বরং অনেক সহজ কাজ। লিখে দিলাম। স্বামিজী পড়লেন, তারপর ডায়াস থেকে নিচে নেমে এসে আমার পিঠ চাপ্ড়ে বললেন—এমন লেখা তো বহুদিন পড়ি নি রে! চল্ তুই আমার মঠে, আমার কাগজটা edit করবি। তারপর একটু আস্তে আস্তে বললেন—ভয় নেই, তোকে ঠকাবো না—মাইনে দেব—তবে গরিব মানুষ যা মাইনে দিতে পারে তাই। তোর কি তাতে হবে?

আমি বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়—অনেক মাইনে দিলেও নয়।

স্বামী অমৃতানন্দ আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখাল ব্যানার্জীর প্রাইভেট চেম্বার-এ নিয়ে গেলেন। সেখানে আর একজন শুধু প্রবেশাধিকার পেলেন—তিনি হচ্ছেন মীনাদি। আমরা তিনজন ঘরের ভেতরে সোফার উপরে গিয়ে বসলাম।—তুই এত উত্তেজিত হয়েছিস্ কেন বলতে পারিস্? স্বামিজী আমাকে বললেন।

—আমি নাস্তিক। আমি ধর্মের কাগজ edit করতে পারব না—আত্ম-প্রতারণা আমি পছন্দ করি না।

—সাবাস্ বেটা—সাবাস্, মীনাদির পিঠে একখানা হাত রেখে স্বামিজী বললেন, দেখেছ মীনা—বাঘের বাচ্চা কাকে বলে?

—তোর এ-উত্তেজনার কারণ কি? স্বামী অমৃতানন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্রায় সবাই অসৎ এবং অধার্মিক। শিষ্য দিয়ে যদি গুরুর বিচার হয়, তাহলে আপনিও লোক সুবিধের নন।

স্বামী অমৃতানন্দের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়বার উপক্রম। মীনাদি হঠাৎ হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন। আমি হাত ছাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বয়েস কত?

—তোর কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী নয়—

—তাহলে তাই হবে—

—কিন্তু আপনার শিষ্যরা সত্তর বলে চালাচ্ছে কেন শুনি—এই সব ধাপ্পার অর্থ কি?

স্বামিজী হো হো করে হেসে উঠলেন—তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—ও, এই তোর বক্তব্য? বয়েসের কি কোনও মাপ-যন্ত্র আছে রে? জানিস্ তো, পৃথিবীর থেকে কয়েক হাজার মাইল উর্দ্ধে উঠলে, সময় জিনিসটার রূপান্তর ঘটে যায়? পৃথিবীতে যা দশ বছর বলে জানিস্, সেখানে সেটা হয়তো পাঁচ মিনিট, বা পঞ্চাশ বছর। এ সবই হচ্ছে রিলেটিভ ব্যাপার। সাধুরা জগতিক আইনে চলে না। আমার বয়েস দুশো বছরও হতে পারে—বলেই তিনি আবার হাসতে শুরু করলেন।

—দেখুন, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন, আমি বললাম, আপনার শিষ্যেরা লোককে ধাপ্পা দিচ্ছে এবং আপনিও সেটা ভাল করেই জানেন। অতএব আপনিও ধাপ্পা দিচ্ছেন।

কথাটা শেষ করতে না করতেই মীনাদি এসে আমার হাত চেপে ধরলেন—ভাই, তুমি এমন করে কথা বলো না স্বামিজীর সঙ্গে—আমরা দুঃখ পাই।

—আমার স্বামিজীর সঙ্গে কথা বলবার কোনও প্রয়োজন নেই—উনিই তো প্রথম আরম্ভ করলেন।

অমৃতানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর যা অবস্থা তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। আমার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, রোববার দিন দুপুরে মীনার বাড়িতে আসিস্—তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। মীনা আমাকে খাবার নেমন্তন্ন করেছে। আর কেউ থাকবে না—তোর সঙ্গে অনেক কথা হবে। মীনাদিও সাদরে নেমন্তন্ন করলেন, বালিগঞ্জের বাড়ির ঠিকানা দিলেন। একশো বার অনুরোধ করলেন যাবার জন্যে। বললেন—তোমাকে তো ভাই ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না—চেনাজানাও নেই—আজই প্রথম দেখা—আশা করি আসবে।

আমি বললাম, যাব।

তারপর বেরিয়ে এলাম রাখাল ব্যানার্জীর ঘর থেকে। উমা আর অসিতের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অবস্থা বিপর্যয়ে ওদের মেরুদণ্ড এমন করে বেঁকে যাবে, কল্পনাও করতে পারি না। ভগবান বিশ্বাস করা এক কথা, আর ভগবানের সোল এজেন্সি দেওয়া কতকগুলি ধাপ্পাবাজের খপ্পরে পড়া আর এক কথা। অসিতের ঘাড়ে শীলা মজুমদারের ভূত, আর উমার কাঁধে শর্বরী-দেবীর ভূত—ওরা বোধহয় এসেছে ভূত ছাড়াতে। কিন্তু কিশোরী-মল, রাখাল ব্যানার্জী, চিদাম্বরম্ এরা ?

অসিতকে বললাম, এখানে এসেছিলে কেন ? তুমি কি ভাব, অমৃতানন্দ তাঁর বড় বড় শিষ্যদের ছেড়ে তোমাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন ? আর তিনি তোমাদের কিই বা করতে পারেন ? উমাকে বললাম—তোমার লজ্জা করে না ? নিজের বউ সামলাতে না পেরে গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছ ?

দুজনেই অধোবদন। কারুর মুখে শব্দ নেই। দুঃখ হল ওদের জন্যে। ওদের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে ওদের বাকী জীবনটা হয়তো ধর্মের গোলক ধাঁধায় ঘুরতে হবে। ঘুরুক ওরা—আমি কি করতে পারি ?

*　　*　　*

স্বামী অমৃতানন্দের সঙ্গে দেখা হবার দু'দিন পরে খবর পেলাম, উমাকে বাড়িওয়ালা অনাদায়ী বাড়িভাড়ার দায়ে গৃহচ্যুত করেছে। ছুটে গেলাম ওর এক মাস্‌তুতো ভাই-এর বাড়িতে খোঁজখবর নেবার জন্যে। শুনলাম, ওরা নাকি লাট্টুপাড়ার একটা ছোট্ট বাড়িতে উঠে এসেছে। অবিশ্যি শর্বরী দেবী আসেন নি—উমা একাই এসেছে। শর্বরী দেবী তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট বাবার লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে আছেন। নম্বরটা নিয়ে লাট্টুপাড়ায় উমার নতুন বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম, একটি ফার্নিচারও নেই—এমন কি খাট টেবিল পর্যন্তও নয়। বাড়িওয়ালা দেনার দায়ে ক্রোক করেছে সব কিছু। শুধু দেখলাম, উমা দুই আলমারী বই নিয়ে এসেছে। আমি শুধু ভাবলাম, হায়রে বই! তোমার কোনও মূল্যই নেই। যারা ডিগ্রীজারী করেছিল, তারা তোমার কোনও দামই দেয় নি! একখানা বই টেনে বার করলাম। Words-worth-এর কবিতা সঙ্কলন। বইটার অনেকগুলি পাতা এখনও জোড়া লাগানোই রয়েছে। বুঝতে পারলাম, যাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে উমা হয়তো বা হুণ্ডি কেটে বই কিনে দিয়েছিল, তিনি আর কখনও আলমারি থেকে সেগুলি বের করে দেখেন নি। যুদ্ধোত্তর ক্লাইভ স্ট্রীটের কৃষ্টিতে বই কেনবার রেওয়াজ আছে, কিন্তু পড়বার রেওয়াজ নেই! যে হাল ফ্যাশানের বাড়িতেই যান না কেন, বই পাবেন অনেক! অনেক মূল্যবান বই—কিন্তু তা পড়বার জন্যে কেনা হয় নি—লোককে দেখাবার জন্যে কেনা হয়েছে। ঘণ্টা দুই উমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে এসে পড়তেই হঠাৎ দেখি কিশোরীমল সুরজমল একটা গাড়িতে বসে আমায় ডাকছেন। এগিয়ে গেলাম।

—বাবুজী, আমার একটা দরখাস্ত ড্র্যাফ্‌ট করে দিতে হবে।

—কিসের দরখাস্ত ?

কিশোরীমল বললেন, গভর্নমেণ্টের একটা ফ্যাক্টরী এমনিতে পড়ে আছে—বরফের ফ্যাক্টরী—ওটা আমি কিনে নিতে চাই।

ওটার দাম প্রায় কুড়ি লাখ্ টাকা, তবে রিফিউজিদের চাকরি দেব বলে ওটা পাঁচলাখ্ টাকায় পাওয়া যেতে পারে।

—কি সব বলছেন কিশোরীবাবু? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ বাবুজী—সব গুরুজী কি কৃপা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এসে কিশোরীবাবু আমার কানে কানে বললেন—একজন বড় কর্তা আমাদের স্বামিজীর পয়লা নম্বরী শিষ্য—স্বামিজী আমাকে বলেছেন, কাজটা করে দেবেন। কথা শেষ হবার পর দু-হাত জোড় করে স্বামী অমৃতানন্দের উদ্দেশে তিনি প্রণাম জানালেন।

—ও বুঝেছি, আপনাদের স্বামিজীপ্রীতি তাহলে এইজন্যে?

কিশোরীমল হাসতে লাগলেন।—বাবুজী, আপনি এত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। স্বামিজীর কৃপায় কি না হতে পারে। দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতার সব পাণ্ডাদের সাথে ওঁর জানাশুনা। চাকরি চাই আপনার?—কত টাকা মাইনের চাকরি? হাজার টাকা? স্বামিজী টেলিফোনে ব্যবস্থা করে দেবেন। মীনাদিকে চাকরি কে করে দিয়েছে? সব স্বামিজীর কৃপা। আর তাছাড়া আমরা ব্যবসায়ী লোক—এখানে-ওখানে একটু-আধটু ফয়দার ধাঁধাঁয় সব সময়েই থাকতে হয়।

আমি বললাম, আচ্ছা, কিশোরীবাবু, রাখাল ব্যানার্জী স্বামিজীর এত প্রিয় শিষ্য কি করে হলেন?

—আরে মশাই, রাখালদাস, বুধনদাস, শ্রীচিদাম্বরম্, ওরা তো সবাই স্বামিজীর কৃপায় করে খাচ্ছেন। লোহা আর নিউজপ্রিন্ট-এর কোটা তো স্বামিজীই করে দিয়েছেন ওদের।—আর বলব কত? —স্বামিজীর কৃপায় বরফের কলটা নিতে পারি তো, আমিও তিন বছরে ক্রোড়পতি হয়ে যাব বাবুজী!

কিশোরীমল সুরজমল গাড়ি চেপে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, ধন্য স্বামী অমৃতানন্দ! তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না—কিন্তু স্বামিজী হবার দরকার ছিল কি

তোমার? একটা বড় কেউকেটা হলেই তো পারতে—নিদেন পক্ষে একজন পার্লামেণ্টের সদস্য! যাদের তুমি লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিচ্ছ, তারাই তো তোমাকে টাকার গুঁতোয় গদীতে বসিয়ে দিতে পারত? নিজের মনের মধ্যেই উত্তর খুঁজে পেলাম —অমৃতানন্দ হচ্ছেন ওদের সকলকার Friend, philosopher and guide! উনি নিজে কিছু চান না—তবে যাঁরা অনেক কিছু চান, তাঁদের উনি সৃষ্টি করেন। ঠিক হ্যায়।—রোববারের তো আর বেশী দেরি নেই।

রবিবার মীনাদির বাড়িতে যাবার কথা স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। শনিবার ক্লাইভ স্ট্রীটে খবর পেলাম, স্বামিজীর প্রধান শিষ্য রাখাল ব্যানার্জী লোহা ব্ল্যাকমার্কেট কববার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর বুধনদাস আগরওয়ালার নামে দশলাখ টাকা সেল্‌ট্যাক্স ফাঁকি দেবার অপরাধে পুলিশের হুলিয়া বেরিয়েছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। খবরটা শোনা অবধি মনটা অধীর হয়ে উঠেছিল স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। রাখাল ব্যানার্জী কেমন কর্মবীর, আর কেমন তার অর্থে লালসা নেই, সেইটে একবার অমৃতানন্দ মহারাজকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে অসিত সেনের সঙ্গে দেখা করে খবরগুলি দিলাম। ভাবলাম, অসিত হয়তো গুরুদেবের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করবে। কিন্তু আশ্চর্য। তার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। ও বলল, শিষ্য যদি গুরুর আদেশ না মেনে চলে, তাহলে গুরুর দোষ কি বল তো? আমি আর কথা বললাম না। বলবার সত্যিই আমার কিছু ছিল না। উমা আর অসিত নিজেদের এমন করে ভাগ্য আর ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, যে ওদের সমস্ত সত্তা তখন স্বামিজীমুখী—ঊর্দ্ধাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মত অমৃতানন্দ ওদের হৃদয়ে শিহরন মিশ্রিত আনন্দ

এনেছে—এনেছে অজ্ঞাতলোকের কোনও দুর্জ্ঞেয় বারতা। ওদের সঙ্গে কথা বলে কোনই লাভ হবে না।

রবিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ মীনাদির বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আরও একটু পরে যাওয়াই উচিত ছিল—কারণ স্বামিজীর বারোটার আগে আসবার কথা নয়। কিন্তু গত তিন চারদিনে মীনাদির সম্বন্ধে বাজারে যে-খবর সংগ্রহ করেছিলাম, তাতে করে এই অদ্ভুত নারীটির সম্বন্ধে আমার এক উদগ্র কৌতূহল জন্মে গিয়েছিল। এমনকি, অমৃতানন্দের চেয়েও মীনাদিকে আবিষ্কার করবার ইচ্ছেটাই আমার প্রবল হয়ে উঠ্‌ল।

দক্ষিণ কলকাতার যেকোনও আধুনিক মহল মীনাদির সঙ্গে পরিচিত। গানের জলসাই বলুন, ম্যাজিকের আসরই বলুন, কক্‌-টেইল পার্টিই বলুন, আর দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটিই বলুন—মীনাদি সব জায়গায় রয়েছেন। ব্ল্যাকমার্কেট করে ধরা পড়েছে কেউ তো মীনাদিকে পাকড়াও করলেই তার মুক্তি সুনিশ্চিত। হাসপাতালে সীট পাওয়া যাচ্ছে না তো ওঁকে ধরুন, সীট মিলবে; সিমেণ্ট-এর পারমিট পাচ্ছেন না তো মীনাদির শরণাপন্ন হোন্‌, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কেউ বলে মীনাদি অবিবাহিতা, কেউ বলে স্বামী আছে, তবে স্বামীর সঙ্গে থাকেন না—আবার কেউ বলে—একটা কেন মীনাদির স্বামী অনেকগুলো। শোনা যায় মীনাদি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক—আবার শোনা যায় ওঁর কিছুই নেই, বাইরের চটকটাই সব। যে-পাড়ায় মীনাদি থাকেন, সে-পাড়ায় ওঁর বদনামের অন্ত নেই।

বেলেল্লাপনায় ওঁর জুড়ি নাকি কলকাতায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দিন-রাত্রি বাড়িতে পুরুষ ছেলেদের ভীড়। বিকেল হ'তে না হ'তেই অসংখ্য গাড়ি বাড়ির সামনে আসে, আর তার থেকে

নেমে আসে পঁচিশ বছরের যুবা থেকে ছাপান্ন বছরের প্রৌঢ়। ওরা সব কেন আসে তা কেউ জানে না। মাঝে মাঝে দেখা যায়, মীনাদি একজন কারুর গাড়িতে চেপে চললেন। কোথায় যান, কে জানে—তবে কোনদিনই রাত্রি দশটার আগে বাড়ি ফেরেন না। অসিতের কাছে খবর পেলাম, মীনাদি একটা খুব বড় পাব্লিসিটি ফার্ম-এর Receptionist. প্রায় হাজার টাকা মাইনে পান। আর লেখাপড়া! কিশোরীমল সুরজমল একদিন বলছিলেন মীনাদি নাকি বিলেত থেকে পাস করে এসেছেন! না হলে অমন মেমসাহেবদের মত ইংরেজী বলতে পারেন?

আমি ভাবছিলাম, স্বামী অমৃতানন্দ ভগবানের mystry-কে capital করেছেন—দুরূহ ব্যাপার বটে—কিন্তু মীনাদি capital করেছেন পুরুষদের লোভাতুর মনকে—যে-মন সুযোগ পেলেই মার্কামারা মেয়েদের মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়! ইনি আরও mysterious—এঁর লোক ঠকানোর ক্ষমতা হাজার গুণ বেশী। একজন লোক ঠকায় কিছু না দেখিয়ে, আর একজন ঠকায় নিজেকে দেখিয়ে।

মীনাদির বাড়িতে ঢুকে দেখি বাইরের ঘরে জনা ছয়েক সাহেবী পোশাক পরিহিত সুবেশ ভদ্রলোক বসে আছেন। সবারই মুখে সিগারেট। ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট আমার একটা উপকার করেছিল—যেমন প্রখর করে দিয়েছিল চোখ দুটোকে, তেমনি সজাগ করে দিয়েছিল শ্রবণেন্দ্রিয়কে। মীনাদির বাড়িতে ঢুকেই প্রখর দৃষ্টিশক্তি দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম,—হাজার টাকা মাইনের receptionist কেন, পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিস্টার সাহেবদের বাড়িও অমন করে বড় একটা সাজানো থাকে না। ঠিক যেখানে যে-জিনিসটি থাকলে মানায়, সেইখানে সেই জিনিসটি রয়েছে। সিঁড়িতে উঠতেই দেয়ালের দু-ধারে যে-সব ছবি টাঙানো দেখলাম, সে-সব রাখবার ঔদ্ধত্য কলকাতায় অনেক বনেদী বড়লোকদেরও নেই। ড্রইং রুমটা দেখে মনে হলো যেন মানুষের হাতে গড়া

একটা ইন্দ্রপুরী। আমি যখন সেখানে ঢুকলাম, তখন রেডিওগ্রামে একটা ইংরেজী সংগীত পরিবেশিত হচ্ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া, তীব্র সেন্টের গন্ধ আর বিলিতী সঙ্গীতের মৃদু ছন্দ জায়গাটাকে অদ্ভুত মায়াময় করে তুলেছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমিই একমাত্র লোক, যার পরনে হাফ্‌সার্ট আর ধুতি। ঘরে ঢুকতেই এক প্রৌঢ় বাঙালী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কাকে চাইছেন?—মীনাদি আছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম। কথাটা জিজ্ঞেস করবার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপের মত অবস্থা হলো। বেশ বুঝতে পারলাম, আমার আগমনবার্তা সেই আমেজ-ভরা সকালের মধুচক্রে একটা অকথিত প্রতিবাদের ঢেউ জাগাল। ভদ্রলোক বললেন—অপেক্ষা করতে পারেন—মীনাদি ভেতরে ব্যস্ত আছেন। বলেই আবার তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। কান পেতে শুনছিলাম—আলাপটা হচ্ছে, গতকাল রাত্রির একটা cockt'il p.a ty সম্বন্ধে—আজ সকালেও যে Hangover চলছে, তার কথা। আমি চুপ করে এক কোণে একটা চেয়ারে বসে ড্রইংরুমটার চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। বহু বড় বড় লোকের বাড়িতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু অমন সুন্দর করে সাজানো ঘর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। ভাবছিলাম, আর যাই হোক, মীনাদির রুচিজ্ঞান অত্যন্ত উচ্চস্তরের। কিছুক্ষণ পরে একজন বয় ট্রে-তে করে চা নিয়ে এল। আমার কাছে আসতেই বললাম—মেমসাহেবকে বল, পৃথ্বীশবাবু আয়া। মিনিট তিনেক পরে মীনাদি দৌড়ে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। আজ অন্য পোশাক, অন্য চেহারা। আজকের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন মীনাদি অভিসারিকা—কোনও গোপন অভিসারের জন্যে তৈরী হচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি চীৎকার করে বললেন—এই যে, এসেছ? আমি কিন্তু ভাবতেই পারি নি তুমি আসবে—যা ছেলে বাবা!

আমি কথা বললাম না।

ওদিকে ছ'জন ভারতীয় সাহেব ছ'জোড়া চোখ দিয়ে আমাকে প্রায় ভস্ম করে ফেলবার উপক্রম করছেন। 'কে, এই লোফার, এই shabbily dressed একটা vagabond এখানে এল—আর এলও বা যদি, মীনাদির কথায় কেন অমন উৎকণ্ঠা! সব জিনিসের একটা লিমিট আছে তো?'

মীনাদি আমাকে হাত ধরে টেনে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে সেই কৃষ্টি-মুখর আবহাওয়াতে নিয়ে এলেন! তারপর আলাপ করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে এক এক করে—ব্যাটি মিত্র, ল্যাডি ঘোষ, ম্যাকি মুখার্জী প্রভৃতি। শুনলাম সবাই বড় বড় সাহেবী কোম্পানীতে ভাল ভাল চাকুরি করেন। আমার পরিচয় আর হল না। সত্যিই তো, পরিচয় দেবার মতন আমার আছে কি?

মীনাদি আমাকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে এক প্লেট খাবার নিয়ে এসে আমাকে খেতে দিলেন। এতগুলি লোকের মধ্যে আমি একা কিছু গলাধঃকরণ করব? কেমন যেন লাগছিল। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে ব্যাটি মিত্র বললেন—Carry on, we had just our breakfast. মীনাদি আমার পাশে বসলেন। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে প্লেটটা নিজে হাতে করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অদ্ভুত আন্তরিকতা দিয়ে মানুষকে কাছে টেনে আনবার কি সুন্দর প্রয়াস! এগারটা বাজতে সাহেবরা সবাই চলে গেলেন। তখন ড্রইংরুমে আমি একা বসে। সাড়ে এগারটা নাগাদ মীনাদি আবার এলেন।—স্বামিজীর আসবার সময় প্রায় হয়ে এল। একটু বস ভাই। মীনাদি বললেন।

আমি বললাম, এখানে যারা বসেছিলেন, এরা কারা?

—এরা আমাদের গ্রীন ক্লাবের সভ্য।

—ওরা এখানে এসে প্রায়ই আসর জমায় বলে মনে হয়?

—তা জমায়। আমি ওদের আসতে বলি না—ওরা এমনিতেই আসে।

—'তোমরা এস' বলে নেমন্তন্ন না করলেও, ওদের আসবার যে কোনও বারণ নেই, সেটা ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ?

—হবে হয়তো ? তবে ওদের মধ্যে দুজন এখানে রাত্তিরে ডিনার খায়।

—কেন, ওদের চালচুলো নেই বুঝি ?

—আছে, তবুও আমার এখানে খায়—

—আপনার বাড়ির রান্না বোধ হয় খুব ভাল হয় ?

—তা জানি না, তবে ওরা আমার এখানে খেয়ে তৃপ্তি পায়।

—ঘরের আসবাবপত্র আর সাজানোর কায়দা দেখে আপনার রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

—তা বলতে পারি না, তবে অনেকেই একথা বলে বটে।

—সিঁথিতে তো সিঁদুর দেখছি না—বিয়ে হয় নি নিশ্চয়ই !

মীনাদির মুখ শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত কালো হয়ে উঠল।—তোমার ওসব কথায় প্রয়োজন কি ?

—প্রয়োজন সত্যি আমার কিছু নেই, তবে ধর্মের মুখোসটা পরা আছে বলে একটু ভেতরে প্রবেশ করবার ইচ্ছে হয়।

মীনাদি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এখন যাই—তোমাকে আমি একদিন সব খুলে বলব—দেখে মনে হয় তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি।

স্বামিজী ঠিক বারটায় এলেন। আজকে তিনি একাই এসেছেন। সঙ্গে শুধু একজন শিষ্য।

মীনাদি অমৃতানন্দকে নিয়ে তাঁর শোবার ঘরে বসালেন। আমি চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে আছি। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যমশাই এসে আমাকে খবর দিলেন, স্বামিজী ডাকছেন। হঠাৎ পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই যে-দৃশ্যটা দেখলাম, তা দেখবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অমৃতানন্দ মীনাদির পিঠে হাত বুলোচ্ছেন, আর মীনাদি

চোখ বুজে আছেন। আমি ঢুকতেই মীনাদি একটু সরে বসলেন। স্বামিজী আমাকে অভূতপূর্ব সমাদর করে কাছে আহ্বান করলেন। আমি যেই কাছে গিয়ে বসলাম, মীনাদি উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

—তুই কিছু মনে করেছিস নাকি, মীনার পিঠে হাত বুলোচ্ছিলাম বলে?

অমৃতানন্দ অসাধারণ চতুর লোক। আমার মনের কথা আগেই বুঝতে পেরেছেন।

—মোটেই না, আমি বললাম, এইটেই একমাত্র স্বাভাবিক কাজ যা আপনি মানুষ হিসেবে করতে পারেন—গুরুদেব হিসেবে আর যা কিছু করছেন, সবই আত্মপ্রতারণা।

অমৃতানন্দ অর্দ্ধশায়িত অবস্থা থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসলেন।

—দেখ পৃথ্বীশ—সন্ন্যাস-জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সন্ন্যাসীরা ষড়রিপুকে জয় করে ফেলে। তুই সেটা বুঝতে পারিস না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তা জানি, যেমন করে আপনার প্রধান শিষ্যদ্বয় রাখাল ব্যানার্জী আর বুধনদাস আগরওয়ালা লালসা-বিহীন সাধনায় মগ্ন রয়েছেন। রাখালবাবু এখন আলিপুর জেল custody-তে, আর বুধনদাস বোধহয় দুর্গাপুরের জঙ্গলে গভীরতর সাধনায় মগ্ন রয়েছেন।

স্বামী অমৃতানন্দের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি খবরটা নিশ্চয়ই জানতেন। মুখ নীচু করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন—রাখাল আমাকে ডুবিয়েছে—স্টীল-এর কোটাটা আমিই ওকে বের করে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, ভাবনা কি আছে—মীনা দেবীকে এইবার কাজে লাগান। বড়কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন—রাখালবাবুকে খালাস করে নিয়ে আসবেনখন।

অমৃতানন্দ নীরবে অবস্থাটা মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলেন।

আমি বললাম, স্বামিজী, আপনি এসব ব্যবসা ছেড়ে দিন। আপনার শিক্ষা-দীক্ষা সব কি ভুলতে বসেছেন?—ভাল কথা, আপনার বয়সের ব্যাপারটা সত্যি এখনও ঠিক হল না? বলুন তো আপনার বয়েস কত?

অমৃতানন্দ ভাঙ্গা গলায় আস্তে করে বললেন, চুয়াল্লিশ বছর।

—তাহলে সত্তর বলে চালাচ্ছিলেন কোন লজ্জায়?

—আমি চালাই নি—ওরা চালিয়েছে।

—আর আপনি মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন, কেমন?

—পৃথ্বীশ, যে 'আমাকে' তুমি এত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছ, সে 'আমি'র সম্পূর্ণটাই ওদের সৃষ্টি।

তারপর অমৃতানন্দ আমাকে তাঁর জীবনের চুয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসটা বলতে শুরু করলেন—

—আমার বাবা খুব বড়লোক ছিলেন। রায়পুরে তাঁর প্রকাণ্ড বড় জমিদারী ছিল। আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Philosophy-তে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে বি, এ, পাস করে যেদিন রায়পুরে ফিরলাম, সেদিন আমার মাকে বাবা রিভলভার দিয়ে গুলী করে হত্যা করেন। মায়ের কোনও দোষ ছিল না। আজীমগড়ের বিধবা রানীর সাথে বাবার ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে মা মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন—তারই ফলে তাঁকে বাবার হাতে অপঘাতে মরতে হয়েছিল। রায়পুর স্টেশনে নেমেই খবরটা শুনতে পেলাম। বাড়ি যাবার আর ইচ্ছা হলো না—চলে গেলাম কলকাতায় মাসীর বাড়িতে। তারপর মাসীর টাকায় তিন মাসের মধ্যে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি-তে পড়তে গেলাম। কিন্তু মায়ের মৃত্যু আমাকে বিহ্বল করে ফেলেছিল। পিতার এই জঘন্য কার্যে প্রতিবাদ করার মত সাহস আমার ছিল না—আস্তে আস্তে কাপুরুষতা আমাকে বাস্তব জগৎ থেকে টেনে নিয়ে গেল আর এক জগতে যেখানে মানুষ সমস্ত বাস্তবতার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে—সেটা হচ্ছে spiritualism-এর জগৎ। সেই নতুন

জগতের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে রেখে আমি বিলেতে পড়াশুনো করতে লাগলাম। গেরুয়া বসন ধরলাম—নিরামিষ আহার শুরু করলাম—সমাজ ত্যাগ করলাম। বছর তিনেক বাদে Ph. D. ডিগ্রী পেয়ে যখন দেশে ফেরবার সময় হলো, তখন আমি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। আমার দেহ এবং মনের তদ্দিনে এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে যে রায়পুরের মুখোপাধ্যায় পরিবারের একমাত্র পুত্র দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কোনও চিহ্নই তখন আমার মধ্যে বেঁচে নেই। দেশে ফিরে বছর পাঁচেক ভারতের তীর্থে-তীর্থে পর্যটন করলাম। তারপর যখন আবার কলকাতায় ফিরে এলাম তখন মাসীমার মৃত্যু হয়েছে। সেখানেও আর স্থান হল না—যোগ দিলাম ভবতারণ মঠে। বিলেতের Ph. D. ডিগ্রীওয়ালা সন্ন্যাসীর দিকে-দিকে জয়জয়কার শুরু হল।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পেলাম—আমি শুধু সন্ন্যাসীই নই—আমি এক বিরাট শিষ্যপরিবেষ্টিত গুরুদেব। আমার মঠে সকালে বিকেলে হাজার হাজার লোকের ভীড়—কলকাতার সব বড় বড় ধনীরা আমার পায়ে পড়ে লুটোতে লাগল—জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল ব্যারিস্টাররা সবাই আমার মুখের একটা বাণীর জন্যে দিনের পর দিন ধরনা দিতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম, যারা আমার কাছে আসছিল, তার বেশীর ভাগ লোকেরই আগমন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বড়কর্তারা আমার কাছে আসেন কয়েকজন—তাদের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য সব রকম সুযোগ-সুবিধের চাবিকাঠি। রাখালদাস আর বুধনদাসরা আমাকে মাঝখানে রেখে অনেক সুযোগ সুবিধে নিতে লাগল—কিন্তু আমি তখন নিরুপায়—একবার যে-আত্মপ্রতারণার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে আর ফিরতে পারলাম না। আজও পারছি কোথায় ?

—মীনাদির সঙ্গে আপনার আলাপ হল কি করে ?

—মীনা আমার সঙ্গে ওদের দলে পড়ে দেখা করতে যায়—ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

—কেমন ভাল-লাগা ?

অমৃতানন্দ বিষম খেতে লাগলেন—বললেন, কেমন আর, যেমন ভাল লাগা উচিত।

আমি বললাম, নারীকে পুরুষের যেমন ভাল লাগে সেই ভালো লাগা তো ?

অমৃতানন্দ বললেন, দোহাই পৃথ্বীশ, অমন করে কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমাকে বার বার ফেলো না।

আমি বললাম, মীনা দেবীকে ক'বার 'মা' আর 'বোন' বলে ডেকেছেন ?

অমৃতানন্দ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, হাজার বার, লক্ষ বার বলেছি। তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন, আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না।—আমি স্বীকার করছি, আত্মপ্রতারণার দায়ে আমি অভিযুক্ত। কিন্তু কি জান, আঠার বছর ধরে ক্রমাগত আত্মপ্রতারণা করতে করতে আমার এমন একটা দ্বিতীয় মনের সৃষ্টি হয়েছে, যে-মন সত্যি আমার চাওয়া-পাওয়ার হিসাব দাখিল করতে পারে না। যা চাই, তা বলবার আমার সাহস নেই। আমি চাই না, চাই না, চাই না, বলতে বলতে প্রায় বিশ্বাস করতে বসেছি যে সত্যিই আমি কিছু চাই না।

—আপনি মীনা দেবীকে ভালবাসেন তাহলে ?

এইবার অমৃতানন্দের খোলসটা হঠাৎ খুলে পড়ল। সামনে এসে দাঁড়াল সুপুরুষ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়। চট্ করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর এসে হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে বললেন, পৃথ্বীশ, তুমি আমার বন্ধু, তোমার কাছে হার মানছি। মীনা যেন কিছু টের না পায়।

—কত টাকা মীনা দেবীকে আপনি দিয়েছেন আজ পর্যন্ত ?

—অনেক টাকা, দীপঙ্কর বললেন, মীনার বাড়িতে প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের বিলিতী ছবি রয়েছে, এ সবই আমার দেওয়া।

আমি বললাম, দেবার সময়ে কি বলে দিয়েছেন ?

দীপঙ্কর বললেন, মিথ্যে কথা বলে, বলেছি শিষ্যদের দান—ওকে দিলাম। আসলে বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে এনে দিয়েছি।

দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় চুপ করে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পৃথ্বীশ, আজ তুমি আমাকে অত্যন্ত নীচ এবং হীন মনে করলে তাই না ?

আমি বললাম, মোটেই না, আগেই বলেছি ধর্মের প্রতারণা ছাড়া আর সবটাই স্বাভাবিক। যদি মীনা দেবীকে ভালবেসে থাকেন, তো সত্যিই খুব ভাল কাজ করেছেন।

বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে মীনাদি গুরুদেবের খাবার জায়গা করে দিলেন। পাশে আমারও বসবার একটা জায়গা হল। খেয়ে দেয়ে যখন চলে আসব তখন অমৃতানন্দ বললেন, পৃথ্বীশ, আমার মঠে আসবে—তোমার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জানবার আছে, বোঝবার আছে।

মীনাদি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, পৃথ্বীশ, তোমার সঙ্গে অনেক কথা বাকি রইল, আর একদিন হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে চলতে চলতে বার বার সমাজের অবস্থাটা ভাবতে লাগলাম। ক্লাইভ স্ট্রীট যেমন করে কিশোরীমল সুরজমল, রাখাল ব্যানার্জী আর বুধনদাসকে সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনি করে সৃষ্টি করেছে স্বামী অমৃতানন্দকে। অমৃতানন্দকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সমাজের শিরোমণিরা আরও কিছুদিন বাঁচতে চায়।

অমৃতানন্দ মায়ের মৃত্যুতে বিবাগী হয়েছিলেন। হলেনই বা তিনি ভগবান আর আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, থাকলেনই বা তিনি মঠে মন্দিরে, তাহলেও তো সমাজের তিনি ক্ষতি করতেন না। একটা সুস্থ স্বাভাবিক সমাজে একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হ'য়ে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারতেন—আর চেয়েছিলেনও হয়তো তাই—কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের ধুরন্ধররা তাঁকে তাঁদের নিজেদের

কাজে লাগালেন, আর অমন পণ্ডিত একজন ভদ্রলোক তাঁদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। আরও অনেকে হয়তো অমনি করে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন—কিন্তু তাঁরা সোজাসুজিই আত্মবিক্রয় করেছেন। তাঁদের বুঝতে পারি—তাঁদের জানি, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অমৃতানন্দদের বুঝতে পারি না—ধর্মের গুহ্য ভাঁওতার একটা আবরণ পরিধান করে এঁরা যে শুধু নিজেদেরই প্রতারণা করছেন তাই নয়—প্রতারণা করছেন সমস্ত সমাজটাকে। যে-সমাজে theory of chance আর probability রাজত্ব করছে, সেখানে তাঁদের পক্ষে প্রতারণা করাটা খবই সহজ।

এরমধ্যে একদিন অসিত কেন এসে উপস্থিত হলো। ওকে গুরুদেবের ইতিহাসটা বললাম না—ইচ্ছে করেই বললাম না। প্রথম কথা দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন কারুর কাছে না বলতে। আর দ্বিতীয় কথা, ভূতে পাওয়া লোকদের কিছু বোঝানো মুশকিল। ব্যর্থতা অসিত আর উমাকে যেখানে নিয়ে এসেছিল, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। ঠিক করলাম, আস্তে আস্তে ওদেরকে সব বুঝিয়ে বলব।

আর তাছাড়াও অসিত আমার একটা চাকরির খবরও নিয়ে এসেছিল। উঃ কতকাল চাকরি করি না—ভাবলে অদ্ভুত লাগে। আমার মতন শারীরিক সুস্থ সবল একটা লোক বছরের পর বছর চাকরি পায় না—এ-ঘটনা সত্যি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। আমি দিনরাত্রি পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো পয়সা রোজগার করতে চাই, অথচ সেই কাজ আমার মেলে না—এ কি আশ্চর্য ঘটনা! সত্যি কথা বলতে কি, মাঝে মাঝে অসিতের কাছ থেকে দু-পাঁচ টাকা ধার করছিলাম। টিউশনির টাকা পুরোটাই মেজদাকে দিয়ে দিতে হচ্ছিল। অসিত চাকরির কথাটা বলল—

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী বলে একটা বড় Import Export-এর আপিস—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ দস্তিদার বলে এক ভদ্রলোক। একজন সেক্রেটারি চাইছেন—ছ'শ টাকা মাইনে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম, দস্তিদার যুদ্ধের সময়ে প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন—যুদ্ধশেষে ক্লাইভ স্ট্রীটে আপিস করেছেন—বড় আপিস, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালই। আমার মতামত জিজ্ঞেস করে অসিত বলল—তুমি কালই গিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করবে—ওদের এক্ষুনিই লোক চাই। পরের দিন ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেডিং কোম্পানীতে গিয়ে মিঃ দস্তিদারের সঙ্গে দেখা করতেই চাকরি হয়ে গেল। চেয়ারে বসে গেলাম। দিন দুই বাদে মিঃ দস্তিদার আমায় ডেকে বললেন, মিঃ ঘোষ, যদি পারেন তো জনা দুই ভাল স্টেনোগ্রাফার যোগাড় করুন—আমার আপিসে ভাল স্টেনো টেঁকে না, দেখুন তো চেষ্টা করে? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এক মাদ্রাজী স্টেনো রাখা হোল। ডিক্‌টেশন্ ভালই নেয়, ইংরেজীটাও মন্দ জানে না—মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। মিঃ দস্তিদার আমাকে ডেকে বললেন, নারায়ণকে পাঠিয়ে দিন, দেখি কেমন ডিক্‌টেশন নেয়।

মিঃ দস্তিদারের বিদ্যার পরিধি আমার জানা ছিল না, তবে চেহারা সাজগোজ দেখলে মনে হয়, হয়তো বা কমার্শিয়াল করেস্‌পনডেন্স জানেন ভালই। পরে অবিশ্যি আমার এ-ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। যাই হোক নারায়ণ প্যান্টের ভেতরে সার্টটা ভাল করে গুঁজে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে গেল, হয়তো বা বুক দুরুদুরু—পরীক্ষায় পাস হতে হবে, নতুন চাকরি। মিঃ দস্তিদার আমাকেও ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। তারপর শুরু হল তাঁর ইংরেজী ডিকটেশন। আজ আর তাঁর ডিকটেশন-এর ভাষা মনে নেই, তবে তিনি যা বললেন, তার কোন অর্থই হয় না—অর্থ অনর্থের প্রতি দৃকপাত না করে শুধুমাত্র কয়েকটি ইংরেজী

শব্দ একসঙ্গে বলে যাওয়া! আমি আর বসতে পারছিলাম না। বেচারা স্টেনো! যাই হোক ডিকটেশন টাইপ করে নারায়ণ যখন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে কাগজটা রাখল, তখন সাহেবের কি গর্জন। আমাকে বললেন, একে দিয়ে চলবে না মশাই, দেখুন কি সব লিখেছে!

আমি ভাবলাম, ফটোতে কি ছবির তারতম্য হয়? নারায়ণের দোষ কি? ও যা শুনেছে, তাই তো লিখবে—না আর কিছু বানিয়ে লিখবে!

নারায়ণের চাকরি হল না—আর ঠিক একই কারণে ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানীতে স্টেনোগ্রাফার আর নিয়োগ করাই হল না। শেষ কালে একজন টাইপিস্ট রাখা হল—যার দোষ ধরবার আর উপায়ই থাকল না।

যতই দিন যেতে লাগল, ততই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে নিয়ে আমি বিপদে পড়তে লাগলাম। ভদ্রলোক এমনি মন্দ নন—তবে বিপদ হচ্ছে কারণে অকারণে ভুল ইংরেজী বলে এবং লিখে আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলছিলেন। তিনি কোম্পানীর মালিক—আমাদের মত দু-চারজনকে মাইনে করে রেখেছেন চিঠিপত্র লিখবার জন্য, বাইরের লোকদের সঙ্গে কথা-বার্তা কইবার জন্যে—অথচ কি যে তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল। সব সময়ে সবার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলবেন। ওঁর কাছে প্রায়ই নানা ধরনের লোক আসেন—তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত লোকও আছেন। একদিন তিনি এক ভদ্রলোককে বললেন—You are suffering from inferior complexion। বলাবাহুল্য, ওঁর বলবার ইচ্ছে ছিল, inferiority complex. সে-ভদ্রলোক চুপ করে থাকলেন—কিন্তু আমি ভাবলাম, এতে কোম্পানীর prestige থাকে কি করে!

ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানীর ভেতরকার অবস্থাটার পরিচয় পেলাম কিছুদিনের মধ্যেই; যখন ব্যালান্স শীটটা অডিটরদের ঘর

থেকে বেরিয়ে এল। অনেক ঘষে, মেজে, প্রলেপ দিয়েও কোম্পানীর চর্মরোগ ঢেকে রাখা গেল না—এবং বোঝা গেল সে-রোগ বহুদিনের। কোম্পানীর মূলধন দু-লাখ আর ঋণ আড়াই লাখ। স্টক্ ইন্ হ্যাণ্ড-এর মূল্য অনেক ফাঁপিয়ে ফুলিয়েও কিছু করা গেল না! কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রথম দু-বছর হাজার পঞ্চাশেক করে লাভ হয়েছিল—সেই ব্যালান্স শীট দুটোই মিঃ দস্তিদারের ক্যাপিটাল। আমাকে তো রোজ দু-তিনবার করে শুনতে হয়ই—ওঁর পরিচিত প্রায় সকলকেই একবার তাঁর কোম্পানীর পূর্বগৌরবের কথা শুনতে হয়। পূর্বগৌরবের কাহিনী না বললে হয়তো বর্তমানের কার্যকলাপগুলিকে ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না—তা ছাড়াও, অতীতের দোহাই দিয়ে হয়তো বা যুৎসই মক্কেলদের কাছ থেকে দশ বিশ হাজার ধারও পাওয়া যেতে পারে। ইম্‌পোর্ট ব্যবসা অনেক কমে গেছে—গভর্নমেণ্ট ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স ভয়ানক ভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। ওতে আর লাভ খুব বেশী নেই! এক্সপোর্ট করতে গেলে মাল কেনবার টাকা চাই—তাও নেই! স্থানীয় কেনাবেচা করে কোনওরকম করে কোম্পানীর খরচা চলছে। কিন্তু আশা ছলনাময়ী! আপিসটি স্বয়ং ছলনাময়ীর তদারকে—তাই ক্লাইভ স্ট্রীটের রোগ দস্তিদারকেও পর্যুদস্ত করে এনেছে। ছোটখাট আকারে হয়তো বা কিছু করলে তিনি টাল সামলাতে পারতেন। কিন্তু তাঁরও সেই বড় হবার উদগ্র কামনা। ভাল মোটর চাই—পাঁচশো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট চাই—তিনটে চাকর চাই—মেয়ের বিয়েতে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করা চাই। তাই আমিও দিন গুনছিলাম। ভাবছিলাম এভাবে আমাকে ছশো টাকা মাইনে আর কদিনই বা দেওয়া চলবে!

মিঃ দস্তিদার যুদ্ধোত্তর ক্লাইভ স্ট্রীটের typical বাঙালী ব্যবসায়ী—তাই তাঁর নাভিশ্বাস উঠেছে! হঠাৎ বড়লোক হবার ফিকির খুঁজতে গিয়ে কোম্পানীর অবস্থা টলটলায়মান!

সেদিন বিকেলবেলায় অসিত সেনের আপিসে বসে আছি, হঠাৎ

মীনাদির কাছ থেকে ওর কাছে একটা টেলিফোন এল—গুরুভাইবোনদের টেলিফোন নম্বর একের অন্যের জানা থাকে—নিজেদের মধ্যে একটা সখ্যতাও থাকে। মীনাদি আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে বললেন। বহুদিন ওঁর সঙ্গে দেখা নেই—অমৃতানন্দেরও খোঁজ রাখি নি। আপিসের চাকরি করে সময় পাই না—পরে শুনলাম অমৃতানন্দ আর মীনাদি দুজনেই আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—আমার ঠিকানা জানা নেই—তাই কোনও পাত্তা করতে পারছিলেন না।

তাই এক শনিবার সন্ধ্যায় মীনাদির বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। গিয়ে দেখি, বাড়ি প্রায় খালি—গ্রীন ক্লাব-এর সভ্যরা অনুপস্থিত। মীনাদি দরজা খুলে দিলেন। সুন্দর হাল্কা ছাই রং-এর একখানা শাড়ি পরে আছেন—খোঁপায় বকুল ফুলের মালা জড়ানো এক সত্যিকারের ছলনাময়ীর রূপ। আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। খোঁজ-খবর বিনিময়ের পর হঠাৎ মীনাদি বললেন—সেদিন তুমি নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে যা-তা ভেবেছ না?

আমি বুঝলাম—সেইদিনকার পিঠে হাত বুলানোর ব্যাপারটার কথা উনি বলছেন।

আমি বললাম, আমার ভাববার কি আছে বলুন তো? শুধু অমৃতানন্দ কেন আরও অনেকের সাথেই তো আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে বলে মনে হয়!

মীনাদি চোখ নীচে নামালেন—এঁরও অমৃতানন্দের মত দুর্বলতা—আমার চোখের দিকে চাইতে পারছিলেন না।

—কিন্তু জানো পৃথ্বীশ, আমার দেহে কোনও sensation নেই—কোনও উত্তাপ নেই—শুধু মাত্র দৃষ্টিকটুতা ছাড়া আমার আর কোনও অনুভূতি বেঁচে নেই।

আমি বললাম, তা তো হবেই—বহুলোকের স্পর্শে আপনার স্পর্শকাতরতা নষ্ট হয়ে গেছে।

মীনাদি চিৎকার করে উঠলেন, তুমি কি বলতে চাও?

—আমি ঠিকই বলছি মীনাদি—আপনি দৈহিক সৌন্দর্যের hypnotism দিয়ে সবাইকে exploit করেছেন। যারা দেহকে পুরোপুরি বাজার পণ্য করে ফেলেছে তাদের বরং ক্ষমা করা যায়, কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করা মুশকিল; আপনি সবাইকে একসঙ্গে ধাপ্পা দিচ্ছেন। যারা কিছু পাবার আশায় আপনাকে অনেক কিছু দিয়ে যাচ্ছে আপনি তাদের নিয়মিতভাবে কিছু না দিয়ে প্রতারণা করে যাচ্ছেন—আপনি একজন উচ্চস্তরের প্রতারক।

মীনাদি বললেন, তুমি যা খুশী তাই ভাবো—কিন্তু যা বলেছি তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়। আমার দেহ-মন কোনটাই আর বেঁচে নেই—কিন্তু একদিন সবই ছিল। তুমি আমার সব কথাটা শুনে তারপর যা খুশী তাই ভেবো।

তারপর মীনাদির মুখে শুনলাম—মফঃস্বল শহরের এক উকিলের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছিল। দুটি ছেলে আছে। স্বামী আজ প্রায় সাত বছর হল রাঁচী মেণ্টাল হসপিটাল-এ আছেন। বিয়ে হবার বছর পাঁচেক পরে মীনাদি জানতে পেরেছিলেন যে মানসিক অসুস্থতা হৃদয়রঞ্জন সেনশর্মাদের বংশগত ব্যাধি। হৃদয়রঞ্জন ওকালতি করে প্রচুর পসার জমিয়েছিলেন এবং শহরে তাঁর নাম-ডাকও ছিল যথেষ্ট। কথা বলতে বলতে মীনাদি উঠে গিয়ে স্বামীর একখানা ফোটো নিয়ে এলেন। বিয়ের এক বছর পরে তোলা ছবি। সত্যিই হৃদয়রঞ্জন সুপুরুষ—প্রতিভার দীপ্তি চোখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। মীনাদির সাথে সত্যিই ওঁকে মানায়। হৃদয়রঞ্জন কবিও ছিলেন। সযত্নে রক্ষিত বহুদিনের পুরনো কতকগুলি মাসিক পত্রিকা আলমারি থেকে টেনে বের করে এনে মীনাদি তাঁর স্বামীর লেখা কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন। প্রতিভাবান স্বামীর গর্বে গর্বিতা স্ত্রীর মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। স্বামী হাসপাতালে যাবার পরই ওঁর জীবনের সংগ্রাম শুরু হল। বাচ্চা দুটো নিতান্তই ছোট—ইণ্টারকাষ্ট বিয়ে হয়েছিল বলে, হৃদয়রঞ্জন বা মীনাদি কারুরই পরিবার থেকে কোনও সাহায্য

এল না। যা কিছু সামান্য সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাই নিয়ে মীনাদি তাঁর এক দিদির কাছে কলকাতায় চলে এলেন। নিতান্ত ছোট বোনকে ফেলে দেওয়া যায় না, তাই বোধ হয় দিদি ওঁকে স্থান দিলেন। মীনাদি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তিনি টাইপরাইটিং আর স্টেনোগ্রাফীটা আয়ত্ত করে ফেললেন। তারপর শুরু হল চাকরির বাজারে তাঁর অভিযান। চব্বিশ পঁচিশ বছরের পরমাসুন্দরী যুবতীর পক্ষে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি পাওয়া ক্লাইভ স্ট্রীটে মোটেও শক্ত ব্যাপার নয়। চাকরিতে ঢুকেই মীনাদি বুঝতে পারলেন, স্টেনোগ্রাফারের দুশো টাকা মাইনে দিয়ে হৃদয়রঞ্জনের হাসপাতালের মাসিক দু'শো ষাট টাকা আর নিজের ও দুটি বাচ্চার খরচ চালানো সম্ভব নয়। তখন থেকেই তাঁর শুরু হল ক্লাবে ক্লাবে ঘোরবার পালা—যেখানে ক্লাইভ স্ট্রীটের বড়-সাহেবরা যায়—আর যায় দেশী Executive-রা।

মীনাদি বললেন—আমি বুঝতে পারলাম, সন্ধ্যের পরে ক্লাব-চর্চা না করলে ভাল চাকরি জোটাবার আর কোনও উপায়ই নেই। মফঃস্বল শহরের উকিলের স্ত্রী—ঘর ছেড়ে ক্লাবে যাওয়ার ডিসিশন নিতে গিয়ে নিজের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে সেকথা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আর তা ছাড়াও ওসব জায়গায় ভদ্রমেয়েদের পক্ষে যাওয়ার রিস্কটাও আমি জানতাম। আমার সহকর্মী মিস্ সোরা আমাকে ভাল করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। বুঝলাম সবই, কিন্তু উপায় কি বল তো? হৃদয়রঞ্জনকে চিকিৎসার টাকা পাঠাতে হলে আমাকে অন্ততঃপক্ষে মাসে পাঁচশো টাকা রোজগার করতেই হবে—পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি আজকালকার বাজারে কেউ হাত ধরে নিয়ে বসিয়ে না দিলে হয় না। আর তাছাড়া জান তো, আমি ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়াশুনা করি নি। ইংরেজীটা জানতাম ভালই—হৃদয়-রঞ্জন নিজে আমাকে ইংরেজী শিখিয়েছে। ও ইংরেজীতে বি, এ, অনার্স-এ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। তা হোলই বা! ইংরেজী কথা

ভাল করে না শিখতে পারলে ক্লাবে পার্টিতে গিয়ে মেলামেশা করা যায় না। মিস্ সোরার কাছে ইংরেজী বলা শিখতে লাগলাম। আজ আমি যা বল্‌তে কইতে পারি, এর পেছনে প্রায় সাত আট বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে।

তারপর শুনলাম, মীনাদি বহু চেষ্টা করে পাব্লিসিটি ফার্ম-এর Receptionist-এর চাকরিটা পেলেন। ফার্ম-এর চেয়ারম্যান খুশী হয়ে ওঁকে চাকরিটা দিয়েছিলেন। তার বিনিময়ে আজও মাঝে মাঝে সেই অশক্ত পঁয়ষট্টী বছরের বৃদ্ধের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করতে হয়।

আমি বললাম, রক্ষে চেয়ারম্যান ভদ্রলোক যুবক নন?

মীনাদি বললেন, ভুল বলছ পৃথ্বীশ, যুবকদের যেমন আশা, আকাঙ্খা, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য আছে, তেমনি আছে লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয়—কিন্তু বৃদ্ধদের সে সব বালাই নেই। অশক্ত অসমর্থ ক্লীবদের বিকৃতির রূপ বড় ভয়াবহ। আমি জানি, সেদিন সকালে কয়েকজন ভদ্রলোককে আমার ড্রইংরুমে হইহল্লা করতে দেখে তুমি আমাব সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবেছ। কিন্তু আসল কথাটা কি জানো? আমার চাকরিটাই হচ্ছে এই।

আমি বললাম, তার মানে?

—তার মানে হচ্ছে—ব্যাটি মিত্তিবরা সবাই আমাব কোম্পানীর বড় বড় ক্লায়েণ্টদের পাব্লিসিটি অফিসার। ওদের দয়ার উপর কোম্পানীর ব্যবসা নির্ভর করে। ওদের সন্তুষ্ট রাখাই আমার কাজ। আর তারই জন্যে কোম্পানী আমাকে মাসে হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছে।

—আপনি বলছেন কি? আমি বললাম, এ দেখছি সোজাসুজি···

—প্রায় তাই·········মীনাদি বললেন, তবে ওঁরা সব ভদ্রলোক এবং কিছু ভীরু প্রকৃতির বলে, আমার পক্ষে একটা লিমিট রেখে চলা সম্ভব হয়।

মীনাদি এইবার চা আনতে গেলেন। আমি ক্লাইভ স্ট্রীটের ব্যবসা ধরবার ফাঁদের কথা ভাবতে লাগলাম। কত অজস্র হীন ও

কুৎসিত পথে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। বেচারা হৃদয়রঞ্জনের মফঃস্বল শহরের ম্যাট্রিক পাস বউ—মেজে ঘষে আজ সে একজন নিয়মিত Cocktail party expert-এ পরিণত হয়েছে! সাবাস ক্লাইভ স্ট্রীট!

একটু বাদেই মীনাদি চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে আনলেন তাঁর দুটি ছেলের ফোটো। Receptionist-এর চাকরি পাবার পর তিনি ছেলে দুটিকে হাজারীবাগে এক মিশনারী ইস্কুলের হস্টেলে রেখে দিয়েছেন। দেখলাম ছোট হৃদয়রঞ্জনের দুটি মুখ যেন একটি কাগজে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মীনাদি বললেন, মাঝে মাঝে ভাবি, হৃদয়রঞ্জন আর ভাল না হল! ভাল হয়ে এলে মাত্র একদিন আমার জীবনযাত্রা দেখ্‌লে—আবার তাকে রাঁচী যেতে হবে—তাই যেমন আছে তেমনিই থাক্।

আমি বললাম, কিন্তু মীনাদি এই রকম একটা চাকরি করা আপনার পক্ষে ঠিক নয়। নিজেকে আপনি যত বাঁচিয়েই রাখুন না কেন, লোকচক্ষুতে আপনার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে ভেবে দেখেছেন কি?

—আমার কোনও আপত্তি নেই পৃথ্বীশ, তুমি তোমার ম্যাট্রিক পাস স্টেনোটাইপিস্ট মীনাদিকে একটা চারশো টাকা মাইনের চাকরি ঠিক করে দাও—আর না হলে হৃদয়রঞ্জনের চিকিৎসা আর আমার ছেলে দুটোর মানুষ হবার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দাও—আমি আজই চাকরি ছেড়ে দেবো—শুধু তাই নয়, আমি কোনও ভদ্রলোকদের বাড়িতে রান্না করে, বাসন মেজে নিজের ভরণ-পোষণ করতে রাজী আছি।

আমি চুপ করলাম। যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের অসুখ হলে চিকিৎসা হয় না, পয়সার অভাবে শিশুদের লেখাপড়া হয় না—সে-সমাজে নারী তার দেহসৌষ্ঠব বেচবে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান সস্তায় বিলিয়ে দেবে, এতে আশ্চর্য হবার কিই বা আছে? কিন্তু আর ক বছর?—ক বছর মীনাদির দেহসৌষ্ঠব

থাকবে? এর মধ্যেই বয়সের ছাপ চোখে মুখে পড়েছে। রুজ লিপষ্টিকের আতিশয্যে সব সময়ে ধরা যায় না, কিন্তু মহাকাল গোপনে ও নীরবে তার কাজ করে যাচ্ছে। দু-চার বছর বাদে মীনাদি যখন যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে পড়বেন, তখন তাঁর বাড়িতে আর ভীড় হবে না—পাবলিসিটি কোম্পানীর কাছ থেকে চিঠি আসবে—your services are no longer required. তখন হৃদয়রঞ্জন আর তাঁর দুটি কিশোর পুত্র ধীরে ধীরে জীর্ণতা আর শীর্ণতার অভিশাপে জর্জরিত হবে। আর মীনাদি! হয়তো বা অমৃতানন্দের আশ্রমে চন্দন ঘষবেন।

পেলো না কেউ কিছু—মীনাদি হৃদয়রঞ্জনকে পেলো না, অমৃতানন্দ মীনাদিকে পেলো না, অসিত শীলাকে পেলো না; এই না পাওয়ার বিরাট অট্টহাস্য ক্লাইভ স্ট্রীটের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত করে রেখেছে।

ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানীতে যাই আসি, মাস কাবারে মাইনে পাই—কিন্তু আর কত দিন? অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের কাছে শুনলাম, মিঃ দস্তিদার খুব উচ্চশ্রেণীর একজন ম্যানিপুলেটর, বহু কায়দা কানুন করে তিনি কোম্পানীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন! এখন যারা ম্যানেজিং ডাইরেকটরের কাছে আসে যায়, তাদের বেশীর ভাগই পাওনাদার। সবাই শুনেছে কোম্পানীর অবস্থা খারাপ—টাকাটা এখন পেলে হয়! মিঃ দস্তিদার তাদের tackle করতে পারেন। কেউ টাকা চাইবার আগেই, নিজের দৈন্যের কথা যত না জানান, তার চাইতে বেশী জানান কে তাকে কতটা ফাঁকি দিয়েছে! কি করে তিনি বউয়ের গয়না বন্ধক দিয়ে কোম্পানীকে চালিয়ে যাচ্ছেন! এর সাথে দু-এক ফোটা চোখের জল ম্যাজিকের মত কাজ করে। আমি বুঝতে পারি, এ-অভিনয় মিঃ দস্তিদারকে বাঁচবার জন্যে করতে হয়—যেমন করে অভিনয় করতে হয় মীনাদিকে ব্যাটি মিত্তিরদের সঙ্গে।

ক্লাইভ স্ট্রীটে প্রায় সবাই ভাল অভিনেতা—যাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে, তাদের অভিনয় সর্বজনগ্রাহ্য—তাদের বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই—আর যাদের টাকা নেই তারা চোর, জোচ্চোর, চারশ বিশ বলে আখ্যা পায়—কিন্তু অভিনেতা সবাই।

একদিন মিঃ দস্তিদার আমাকে ডেকে বললেন, মিঃ ঘোষ, আসাম থেকে বিশ কেস ওষুধপত্র এসেছে। আপনি কাল সকালে গুদোমে গিয়ে শিশি বোতলগুলিকে ভেঙ্গেচুরে ফেলবার ব্যবস্থা করবেন। দুজন বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আমি মিঃ দস্তিদারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। তারপর অ্যাকাউণ্ট্যান্টের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—আরে মশাই কিছুই আসে নি আসাম থেকে—এসেছে কতকগুলি খালি শিশি বোতল আর তার সঙ্গে বিশ বাইশ হাজার টাকার একটা ইনভয়েস। এখন শিশি বোতলগুলোকে গুঁড়িয়ে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কাছে বড় একটা ক্লেম করা হবে।

আমাকে নীরব দেখে তিনি বললেন, হ্যাঁ গো মশাই হ্যাঁ—যা বলছি, সবই সত্যি। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার ক্লেম পাস করে অর্দ্ধেক টাকা পাবে, আর অর্দ্ধেক পাবে কোম্পানী। ও করেও বছরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা আয় হয়।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম ছ শ টাকা মাইনের চাকরির মায়া আজই পরিত্যাগ করতে হবে। আমি সোজাসুজি মিঃ দস্তিদারের কাছে গিয়ে বললাম, আমার পক্ষে শিশি বোতল ভাঙ্গা সম্ভব নয়। মিঃ দস্তিদার অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন—তারপর বললেন, তার মানে? পারবেন না মানে?

আমি বললাম, মানে হচ্ছে সোজা, খুবই সোজা—জোচ্চুরির কারবারে আমি নেই।

দস্তিদার চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে চলে এসে কানে কানে বললেন, আপনাকে হাজার খানেক টাকা এমনিতেই দিয়ে দেবো।

আমি বললাম—সব টাকা দিয়ে দিলেও নয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তখন তর্জন গর্জন আর আস্ফালন করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—এই জন্যেই আমি শিক্ষিত লোক রাখতে চাই নি—I hate education.

আমি দস্তিদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই একখানা কাগজ টেনে resignation letter লিখে ফেললাম। আর সেখানা অ্যাকাউন্ট্যান্টের হাতে দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম।

দিন দুই যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন মিঃ দস্তিদারের আপিস থেকে বাড়িতে এক বেয়ারা এসে উপস্থিত।—সাহেব আপকো সেলাম দিয়া।, —ব্যাপার কি রামচরণ সিং, আমি জিজ্ঞেস করলাম। রামচরণ শুধু বলল—কোর্টের লোক এসে কোম্পানী তালাবন্ধ করে গেছে। দস্তিদারের বিপদের কথা না শুনলে যেতাম না—কিন্তু তখন না গিয়ে আর উপায় নেই। বেলা একটা নাগাদ ইণ্টারন্যাশনাল কোম্পানীর আপিসে গিয়ে দেখি—কর্মচারীরা সব গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢুকে দেখি কোর্টের চাপরাশ পরা লোকরা সব আলমারিগুলোতে সীল লাগাচ্ছে। মিঃ ঘোষ উন্মাদের মত হল ঘরটাতে পায়চারী করছেন। আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। তারপর শুনলাম, তিনি আয়রণ স্ক্র্যাপ-এর ব্যবসা করতে গিয়ে মনিপুরে একটা ডাম্প কিনেছিলেন হাজার পঁচিশেক টাকা দিয়ে। কলকাতার একটা বড় কোম্পানীকে মালগুলো সব বেচে দিয়েছিলেন হাজার চল্লিশ টাকায়। মালগুলি যখন ষ্টীমারে করে কলকাতায় এসে পৌঁছল, তখন দেখা গেল মাল যা পাওয়া গেছে, তার দাম দশ হাজার টাকার বেশী হবে না! যে ফার্ম মাল কিনেছে, তাঁরা ত্রিশ হাজার টাকার দায়ে ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানীর নামে মামলা দায়ের করে কোর্ট থেকে Attachment before judgment নিয়ে এসে সব মালপত্র সীল করে দিচ্ছে। উপায় কিছু নেই—হয় ত্রিশ হাজার টাকা অগ্রিম জমা দাও, না হয়, মালপত্র আটক

করতে দাও। আমি কোর্টের কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম, অ্যাটাচ্‌মেণ্ট এনেছে কিশোরীমল সুরজমলের একটা ফার্ম। মিঃ দস্তিদার শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তাঁর যা কিছু ছিল, সবই এই কোম্পানীতে লাগিয়েছিলেন। কাল থেকে কি হবে? নিউ আলীপুরের পাঁচশো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট—Humber Hawk গাড়ি—চাকর-বাকর, বয়, বেয়ারা এগুলোর সব কি হবে? বৃদ্ধ দস্তিদারের জন্যে বেদনা অনুভব করতে লাগলাম। যাই বলি না কেন, তিনি কর্মী লোক! লেখাপড়া না জেনেও কঠোর পরিশ্রম করে নিজের জন্যে ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা জায়গা করে নিয়েছিলেন—আজ কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাঁর অবস্থা হবে কি? কি ভাবে তাঁর সংসার প্রতিপালিত হবে?

উপায় কিছু নেই—একবার ভাবলাম, কিশোরীমল সুরজমলকে ব্যক্তিগতভাবে একটু অনুরোধ জানাই। কিন্তু তখনই আবার ভাবলাম, ওতে কোনই লাভ হবে না। ব্যবসার জগতে মায়া দয়া, অনুভূতি বলে কোনও জিনিস নেই। কিশোরীমল অনেকদিন আমাকে বলেছে—ব্যবসা মে বাপ্‌কো ভি ছোড়না নেহি। সব কিছু ভেবে চিন্তে চুপ করে থাকাই সমীচীন বোধ করলাম। আর তা ছাড়া মিঃ দস্তিদার ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীটের বিষ নজরে পড়েছেন। অজগর সাপের মত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উনি ছলনার প্রেত গহ্বরে ঢুকতে যাচ্ছেন—ওঁকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বেলা পাঁচটা নাগাদ আমি মিঃ দস্তিদারকে সঙ্গে করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। তিনি সারাক্ষণ কাঁদতে লাগলেন—এ অনেকটা পুত্রশোকের মত। বার বছর ধরে যেখানে রোজ এসেছেন, বসেছেন আর জীবিকা নির্বাহের শত সহস্র কৌশল আয়ত্ব করেছেন, সেখানে কাল থেকে আর আসা হবে না—এটা ভয়ানক বেদনা-দায়ক ব্যাপার সন্দেহ নেই। আজ আর মোটরখানাও নেই। সেটাও এসে গেছে কিশোরীমলের গ্যারেজে। শুনেছিলাম ওর তেরখানা মোটর আছে—দস্তিদারের টা নিয়ে তাহ'লে চোদ্দখানা হোল।

মিঃ দস্তিদারকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভাবতে লাগলাম—মিঃ দস্তিদার এখন কি করবেন? দু-বছর বাদে বিগত-যৌবনা মীনাদিই বা কি করবেন? গাল্লা অ্যাসোসিয়েশনের চাকরিটা হঠাৎ চলে গেলে অসিত সেনের অবস্থা কি হবে? দেবেনদার ভবিষ্যৎ কি? কলকাতার লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকরা আশার আলো দেখবে কবে? আর আমার জীবনেও কি ক্লাইভ স্ট্রীট পরিক্রমার শেষ নেই? এর উত্তর কে দেবে?

ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরেই দেখি উড়িষ্যার এক পাহাড়তলী থেকে উমাশঙ্করের এক চিঠি এসে হাজির। চিঠিখানা বার কয়েক পড়ে ফেললাম। মনে হলো এত ভাল চিঠি বুঝি অনেকদিন কারুর কাছ থেকে পাই নি। তা ছাড়া চিঠিখানার মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব যেন খানিকটা খুঁজে পেলাম। উমা লিখেছে—

বন্ধুবরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আগেই উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। নূতন জায়গায় এসে এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে সময় করে উঠতে পারি নি।

তুমি জানতে চেয়েছ, আমাদের ভবিষ্যৎ কি! এ-প্রশ্নের জবাব কোনও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমাকে এই কথাই বলতে পারি, জীবন মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশী সত্য। মৃত্যু জীবনকে পরাস্ত করবার জন্যে কোটী কোটী বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে—সেই যেদিন প্রথম protoplasm থেকে জীবনের সঞ্চার হয়েছিল, সেই দিন থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু জীবনের কাছে হার মেনেছে। আমরাও ক্লাইভ স্ট্রীটকে একদিন হার মানাব। —ছলনাময়ীর ছলনাকে বিদীর্ণ করে মৃত্যুগুহাগুলি একদিন নব সূর্যালোকের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—সে-আলো আমাদের প্রাণসত্তাকে ফুলে ফলে ভরে দেবে। যে জীবনধারা লক্ষ

কোটী বছর ধরে প্রাণ থেকে প্রাণে, গান থেকে গানে, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয় শুধু কাপুরুষদের, ভণ্ডদের আর মিথ্যাবাদীদের। কিন্তু যারা মানুষের মত বাঁচতে চায়, তাদের মৃত্যু নেই, তারা অমর, অপরাজিত, অজেয়। নিরুৎসাহ হয়ে ভেঙ্গে পড়বার কোনও কারণ নেই। আশা করি ভাল আছ।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি—

উমা